প্রকাশক
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রথম বাংলা সংস্করণ
শ্রাবণ ১৩৬৭, আগস্ট ১৯৬০

মুদ্রক
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলকাতা-১৩

ডক্টর রিচার্ড ফ্রিডেনথাল-এর সহযোগিতায় প্রকাশিত।

শ্রীনবেন্দ্রনাথ সিংহ

প্রীতিভাজনেষু

॥ অনুবাদকের নিবেদন ॥

ইতালি দেশে একটা কথা প্রবাদবাক্যের মতো বহুপ্রচলিত। কথাটা হচ্ছে : অনুবাদকরা বিশ্বাসঘাতক। উক্তিটি অর্থসম্ভারে সমৃদ্ধ। অনুবাদকর্মের যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে একাধিক সুচিন্তিত মন্তব্যের মধ্যে যেটা প্রবলতম তার মর্মার্থ হ'ল শিল্পীর কল্পনাপদ্ধতিকে মৌল অর্থে ভাষান্তরিত করা অসম্ভব। তাঁর ভাবচিন্তার মূর্ত প্রতিরূপের বাহ্যিক শিল্পকৌশল হয়তো বা অনুবাদ মাধ্যমে অপর ভাষায় দেহলাভ করতে পারে, কিন্তু তাঁর বিবিধ অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণপ্রসূত অন্তঃপ্রকৃতিকে অনুবাদ করা সাধ্যাতীত। কবিতা-অনুবাদ সম্পর্কে ঈদৃশ মত অনস্বীকার্য। ভাষান্তরিত গদ্য সম্পর্কে প্রাগুক্ত যুক্তি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত নয়। তার কারণ, শিল্পীর গদ্যাশ্রিত প্রত্যয়গুলির অনুবাদোপযোগী পরিভাষা খুঁজে পাওয়া যায়।

সেই হেতু অনুবাদকের দায়িত্ব মূল লেখকের প্রায় সমপর্যায়ের। এমনকি, বহু ক্ষেত্রে অধিকতর। সফল অনুবাদকর্ম 'মাছি-মারা-কেরানী'র সক্ষমতার কীর্তি-দলিল নয় নব অবয়বপ্রাপ্ত অনুবাদকের সৃজনশিল্প। এমত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণের জন্য দৃষ্টান্তের অভাব ঘটা অনুচিত। বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই উক্তরূপ 'অনুবাদকর্মের অতিকায় তালিকা দৃষ্টে স্তম্ভিত হ'তে হয়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ খণ্ডিত বাংলার সাহিত্য-জগৎটির সঙ্গে বহির্বিশ্বের আদান-প্রদানের পথটি নিদারুণ অবহেলা হেতু নিরতিশয় সংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত।

পথটির পরিসর বৃদ্ধির ও প্রগতিসাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে কোন কোন প্রকাশক যে তৎপর হ'য়ে উঠেছেন তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আদান-প্রদানের পথটা যদি অব্যাহত থাকে তা হ'লে বাংলা সাহিত্যের যাঁরা হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁরাও কৃতজ্ঞ থাকবেন।

দীপক চৌধুরী

অদৃশ্য শিল্প

ড্রেসডেন শহরের ঠিক পরের জংশনে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আমাদের কামরায় এসে প্রবেশ করলেন। আমাদের দিকে চেয়ে বেশ মিষ্টিভাবে হাসলেন একটু। আমাকে লক্ষ্য ক'রে এমনভাবে মাথা নাড়লেন যেন আমাকে তিনি চেনেন। আমি হকচকিয়ে গেলুম ব'লে তিনি তাঁর নিজের নামোল্লেখ করলেন। হ্যাঁ, সত্যিই তো তাঁকে আমি চিনি। একসময়ে বার্লিনে শিল্পকলা-সম্বন্ধীয় জিনিস-পত্র বিক্রি করতেন তিনি। আর্ট-ডিলার ছিলেন। চারুকলার একজন রসজ্ঞ বিচারক ব'লেও তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল খুব। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে আমি প্রায়ই তাঁর দোকান থেকে অটোগ্রাফ এবং দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি কিনে নিয়ে যেতুম। আমার উল্টোদিকে বসতেন তিনি। খানিকক্ষণ পর্যন্ত আজেবাজে কথা নিয়ে আলোচনা চলত। তারপর আলোচনার বিষয়বস্তু যেত বদলে। এই সবে তিনি দেশ পরিভ্রমণ ক'রে ফিরে এলেন। কি উদ্দেশ্যে তিনি পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন সেই সম্বন্ধে আলোচনা তুলতেন ভদ্রলোকটি। সাঁইত্রিশ বছর ধ'রে শিল্পবস্তুর ফিরি ক'রে ঘুরছেন অভিজ্ঞতার অন্ত নেই। কিন্তু এবারকার অভিজ্ঞতা সত্যিই অদ্ভুত।

গৌরচন্দ্রিকা যথেষ্টই হ'ল। আমি এবার গল্পটা তাঁর নিজের ভাষাতেই ব্যক্ত করছি। নইলে কথোপকথনের প্যাঁচের মধ্যে প'ড়ে খেই হারিয়ে ফেলতে পারি।

•

—তুমি নিশ্চয়ই জানো [তিনি বলতে আরম্ভ করলেন] মুদ্রাস্ফীতির সময় থেকে আমার ব্যবসার কি অবস্থা হয়েছিল। টাকার মূল্য বাষ্পের মতো চতুর্দিকে উবে যেতে লাগল। যুদ্ধের সময় কারবার ক'রে যারা প্রচুর পয়সা কামিয়েছিল তারা সব ঝুঁকে পড়ল পুরনো শিল্পীদের ছবির ওপর (যেমন—ম্যাডোনা ইত্যাদি)। প্রাচীন যুগের কারুকার্যময় বস্ত্রাদি এবং প্রথম-প্রকাশিত পুস্তকাদি সংগ্রহের জন্যও উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠল তারা। ওদের চাহিদা মেটানো সহজ কাজ নয়। আমার শখ এবং রুচি অনুযায়ী সবচেয়ে ভালো ভালো জিনিসগুলি নিজের বাড়িতে রেখে দিয়েছিলুম। সেগুলোও বুঝি টেনে-হিঁচড়ে

ঘর খালি ক'রে বার ক'রে নিয়ে যেতে চায় তারা। ধ'রে রাখবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয়েছে। তাদের যদি সুযোগসুবিধে দিতুম তাহ'লে আমার শার্টের কাফ-লিঙ্ক্স্ আর টেবিল-ল্যাম্পটাও কিনে নিয়ে যেত বোধহয়। বেচবার মতো 'মাল' যোগাড় করা ক্রমশই কঠিন হ'য়ে উঠতে লাগল। শিল্পদ্রব্যের বদলে 'মাল' কথাটা ব্যবহার করলুম ব'লে তুমি হয়তো রাগ করতে পারো। কি করব, মাপ চাই তাহ'লে। এইসব নতুন ধরনের খদ্দেরদের কাছ থেকে খারাপ বুলি শিখেছি। সঙ্গদোষ।

একান্ত বিষয়ী ব্যক্তি একটি দামী কোট কিংবা শিল্পী গুয়ারসিনোর আঁকা একটা সামান্য নকশা সংগ্রহ করতে পারলে ভক্তিগদগদ চিত্তে এত বেশি গৌরবান্বিত হ'য়ে ওঠে যেন মাত্র কয়েক শো টাকার বিনিময়ে একটা মহা-মূল্যবান ব্যাঙ্ক-নোটের দেহান্তরিত আত্মাটি সে কিনে ফেলেছে। বহুদিনের অভ্যাসের ফলে আমার অবস্থাও ঠিক সেইরকমই হ'ত। প্রাচীন যুগের ভেনিসের ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত একটা বই আমার হাতে এলে, আমিও ঠিক বিষয়ী লোকদের মতো পাওয়ার গর্বে স্ফীত হ'য়ে উঠতুম।

নষ্ট করবার মতো ঐসব খদ্দেরদের হাতে এত বেশি টাকা ছিল যে, তাদের লোভ সংবরণ করাবার কোনো উপায় খুঁজে বার করা অসম্ভব হ'য়ে উঠল। আমার দোকানের চারদিকটা ভালো ক'রে দেখলুম সেদিন। মনে হ'ল, সত্যিকারের মূল্যবান জিনিস আর বিশেষ কিছুই নেই। জানলা-দরজা সব বন্ধ ক'রে দিলেও ক্ষতি নেই। শিল্পসম্ভারের এই সুন্দর ব্যবসাটি আমি পেয়েছিলাম পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। কিন্তু এখন দেখলুম, আজেবাজে জঞ্জাল ছাড়া দোকানে আর কিছুই নেই। উনিশ শো চোদ্দ সালের আগে ফেরিওয়ালারাও ঠেলাগাড়িতে ক'রে এমন জিনিস বিক্রি করতে লজ্জা বোধ করত।

এইরকম একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে প'ড়ে গিয়ে একদিন পুরনো আমলের খাতাপত্রগুলো দেখতে লাগলুম, আগেকার সব খদ্দেরদের ঠিকানাগুলো খুঁজে বার করব ব'লে। সুদিনের কেনা জিনিস হয়তো এখন তাঁরা বেচে ফেলতেও পারেন। দুঃসময়ের কথা কেউ বলতে পারে না। পুরনো খদ্দেরদের তালিকাটির সঙ্গে শবদেহ-সমাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রের সাদৃশ্য আছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলুম, যাঁরা সৌভাগ্যের দিনে এই দোকান

থেকে শিল্পদ্রব্য ক্রয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই মৃত। এবং যাঁরা অভাবগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছেন তাঁরা হয়তো মূল্যবান সংগ্রহগুলো বেচে ফেলতে চাইবেন। যাই হোক, খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একদিন একগোছা চিঠি আমার হাতে এল। জীবিতদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন পত্রলেখকটি। অবিশ্যি তখনও যদি বেঁচে থাকেন, তবেই। তাঁর বয়েস এত বেশি হয়েছিল যে, তাঁকে আমি ভুলেই গিয়েছিলুম। মনেই বা রাখব কি ক'রে—উনিশ শো চোদ্দ সালের মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে তিনি আমার দোকানে জিনিস কিনতে আসেননি। সত্যিই খুবই প্রাচীন যুগের মানুষ ছিলেন ভদ্রলোকটি। প্রথম চিঠিগুলো অর্ধশতাব্দীরও আগে লেখা। আমার ঠাকুরদা তখন ব্যবসার প্রধান পরিচালক ছিলেন। এই কারবারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রায় সাঁইত্রিশ বছর হ'ল। অথচ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল ব'লে মনেও পড়ে না।

সব দেখেশুনে যা বুঝতে পারলুম তাতে মনে হয় তিনি একজন সেকেলে ধরনের খামখেয়ালী মানুষ ছিলেন। জার্মানির ছোট ছোট শহরে আজকালও সেইরকমের দু-একজন মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর হাতের লেখা ঝরঝরে যেন তামার পাতের ওপর খোদাই করা। প্রত্যেকটা অর্ডারের তলায় লাল কালি দিয়ে লাইন টানা। প্রতিটি জিনিসের দাম লিখে দিতেন তাও দু'রকমভাবে। সংখ্যা দিয়ে তো লিখতেনই, তার পাশে আবার কথায় লিখে প্রকাশ করতেন। ভুল হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। চিঠি লিখতেন ছেঁড়া কাগজের টুকরোয়। খামগুলি ছিল যেন-তেন প্রকারে তৈরি করা বিভিন্ন আকারের। এইসব থেকে সন্দেহ হ'ত তিনি অভাবগ্রস্ত মানুষ। স্বাক্ষরের তলায় সব সময়েই উপাধি আর খেতাবগুলো লিখতেন : 'ফরেস্ট-রেঞ্জার এবং অর্থ নৈতিক উপদেষ্টা, অবসরপ্রাপ্ত ; লেফটেনেণ্ট, অবসরপ্রাপ্ত ; প্রথম শ্রেণীর আয়রন-ক্রস দ্বারা সম্মানিত'। আঠারো শো সত্তর খ্রীস্টাব্দের যুদ্ধে যখন তিনি যোগদান করেছিলেন তখন তাঁর বয়েস প্রায় আশি বছরের কাছাকাছিই হবে।

খামখেয়ালী ধরনের লোক ছিলেন বটে, কিন্তু বুদ্ধি তাঁর তীক্ষ্ণ ছিল। জ্ঞানের পুঁজিও কম নয়। খোদাই-করা কাজ আর ছবির সংগ্রহ দেখে মনে হ'ত লোকটির রুচিবোধ আছে। প্রথম দিকে তিনি খুব কম টাকারই

অভাব দিয়েছিলেন। কিন্তু সতর্কভাবে অভাবগুলি পরখ করতে গিয়ে তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পেলুম। যখন দু-একটি রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে একগাদা অতি-সুন্দর জার্মান উড্‌কাট কেনা যেত, তখন এই গেঁয়ো মানুষটি খোদাই-করা কাজের একটি সংগ্রহ কিনে ফেলেছিলেন। যুদ্ধকালীন ধনী কারবারীদের বহুবিজ্ঞাপিত সংগ্রহের চেয়ে তাঁরটা ছিল অনেক বেশি মূল্যবান। দীর্ঘদিন ধ'রে শুধু যেসব জিনিস তিনি অল্প মূল্যে আমাদের দোকান থেকে খরিদ করেছিলেন তার দাম আজ বহুগুণ বেশি। তা ছাড়া অন্যান্য দোকান থেকেও যে তিনি অত শস্তায় আরও ভালো ভালো জিনিস কিনে রাখেননি, তাই বা বলি কি ক'রে। কালক্রমে এই সুন্দর সংগ্রহটি কি হস্তান্তরিত হ'যে গিয়েছে ? তাই বা কি ক'রে হয়। শিল্পবস্তুর কেনাবেচার বাজারের সঙ্গে আমার গভীর সংযোগ। অন্তত তার শেষ খরিদের দিনটি পর্যন্ত আমার কিছুই অজানা ছিল না। তাই ভাবলুম, আমি টের পেলুম না, অথচ সবই বেহাত হ'যে গেল, তেমন ঘটনা ঘটা অসম্ভব। তিনি যদি মারা গিয়ে থাকেন, তাহ'লে সম্ভবত তাঁর ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারটি উত্তরাধিকারীদের হস্তগত হয়েছে।

ব্যাপারটা এত কৌতূহলোদ্দীপক মনে হল যে, পরের দিনই, অর্থাৎ গতকাল বিকেলবেলা আমি তাঁর সন্ধানে রওনা হ'যে গেলুম। স্যাক্সনি প্রদেশের লোকালয়-বহির্ভূত এক নিভৃত অংশে এই শহরটি।

ছোট্ট রেল-স্টেশনের বাইরের রাস্তা ধ'রে আমি হাঁটতে লাগলাম। এটাই ঐ শহরের বড় রাস্তা। দু'পাশের ভাঙাচোরা বাড়িগুলো দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলুম না যে, এমন জায়গায় যারা বাস করে তাদের মধ্যে কেউ রেমব্রাণ্টের পুরো এচিং, ড্যুরেরের অসংখ্য উডকাট আর মান্তেনিয়ার জীবনব্যাপী শিল্পকর্মের সমগ্র সংগ্রহের মালিক হ'তে পারে। যাই হোক, পোস্ট-অফিসে গেলাম খোঁজ করতে। তাঁর নামোল্লেখ ক'রে বললুম যে, একসময়ে তিনি ফরেস্ট-রেঞ্জার আর অর্থনৈতিক কাউনসিলারও ছিলেন। শুনে আমি আশ্চর্য হ'যে গেলুম যে, তিনি এখনো বেঁচে আছেন। কি ক'রে বাড়িটা খুঁজে বার করতে হবে তাও এঁরা ব'লে দিলেন। স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে, পথ চলছি আর সেই সঙ্গে বুক আমার ধুকপুক করছে।

দুপুরের অনেক আগে গিয়েই পৌঁছলাম।

শিল্পবিচারে যিনি এতবড একজন সমঝদার, তিনি সেই ভাঙাচোরা একটা বাড়ির দোতলায় থাকেন। একতলাটা একজন দরজীর দখলে। দোতলায় উঠে বাঁ দিকে দেখলুম ওখানকার পোস্ট-অফিসের মাস্টারমশায়ের নাম লেখা রয়েছে। ডান দিকের সাদা ফলকের ওপর সেই ভদ্রলোকটির নাম। উঃ, শেষ পর্যন্ত তাঁকে আমি খুঁজে পেলুম! ঘণ্টা টিপবার সঙ্গে সঙ্গে একজন বৃদ্ধা এসে দরজা খুললেন। বৃদ্ধার মাথাভর্তি পাকা চুলের রাশি। তার ওপরে কালো রঙের লেসের টুপি। আমার নাম-লেখা কার্ডখানা তাঁর হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে, কর্তামশাই বাড়ি আছেন কিনা। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মহিলাটি একবার আমাকে দেখলেন। দেখলেন কার্ডখানাও, তারপর আবার তিনি দৃষ্টি ফেললেন আমার ওপর। রাজধানীর কেউ যে এমন একটা পাণ্ডববর্জিত ছোট্ট শহরে দেখা করতে আসতে পারে সে-কথা ভেবে তিনি বোধহয় উদ্বেগ অনুভব করলেন। যাই হোক, গলার স্বর যথাসাধ্য মোলায়েম ক'রে তিনি আমায় মিনিট-খানেক অপেক্ষা করতে ব'লে দরজার ফাঁক দিয়ে অন্তর্হিতা হ'য়ে গেলেন। প্রথমে শুনলুম ফিসফিস ক'রে কথা বলছেন। তারপর উচ্চ এবং আন্তরিকতাপূর্ণ একটি পুরুষকণ্ঠের কথা কানে এল আমার. "কি বললে? মিস্টার রাকনেল? বার্লিনের সেই সুপ্রসিদ্ধ শিল্প-ব্যবসায়ী? নিশ্চয়ই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।" তক্ষুনি সেই বৃদ্ধা ফিরে এলেন আবার, এবং ভেতরে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন।

এলোমেলোভাবে ছড়ানো কতকগুলো শস্তা দামের আসবাবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। মানুষটি বুড়ো হয়েছেন বটে, কিন্তু হাসিখুশি। নাকের তলায় বুনো গোঁফ—সামরিক ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ। দু'হাত বাড়িয়ে আমায় তিনি অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর হাবভাবে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা ছিল না, অথচ আচরণের মধ্যে অনমনীয় কাঠিন্য লক্ষ্য করলুম আমি। এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন না ব'লে আমি বাধ্য হ'য়েই তার কাছে হেঁটে গিয়ে করমর্দন করলাম। আমি স্বীকার করছি, একটু বিরক্তই হলাম। তারপর আমার নজরে পড়ল যে, করমর্দনের জন্যে তিনি হাত পর্যন্ত তুললেন না। যেন আমার হাতটা আগে আসবে ব'লে অপেক্ষা করছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত এই অস্বাভাবিক ব্যবহারের কারণটা চোখে পড়ল আমার। ভদ্রলোকটি অন্ধ।

ছেলেবেলা থেকেই অন্ধলোকদের সামনে আমি অস্বস্তি বোধ করি। কেমন একটা লজ্জা আর হতাশায় মন আমার ছেয়ে যায়—যখনই দেখি একটি পরিপূর্ণ প্রাণচঞ্চল মানুষ কোনো একটা ইন্দ্রিয়হানির অক্ষমতায় কষ্ট পাচ্ছে। আমার তখন মনে হয়, আমি বুঝি অন্যায়ভাবে সুবিধা ভোগ ক'রে যাচ্ছি। এই ভদ্রলোকটির সাদা ভুরুর তলায় দৃষ্টিহীন অচেতন চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে অনুরূপ অনুভূতি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। এই অস্বস্তিকর মানসিক যন্ত্রণা থেকে অচিরেই উদ্ধার করলেন তিনি। আনন্দের আতিশয্যে হাসতে হাসতে ব'লে উঠলেন, "সত্যিই কি স্মরণীয় দিন আজ। বার্লিনের একজন সুবিখ্যাত মানুষ আমার এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। দৈবঘটনা বললেও হয়। তোমার মতো একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী যখন মরিয়া হ'য়ে ছুটে আসে, তখন এই গেঁয়ো লোকদের একটু সতর্ক থাকতে হয়। কি বলো? আমাদের এই অঞ্চলে একটি প্রবাদ আছে 'আশেপাশে যদি জিপ্‌সীদের ঘুরে বেড়াতে ছাখো, তাহ'লে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে নিজেদের পকেট সামলাও।' তোমার এই অযাচিত আগমনের কারণটা আমি আন্দাজ করতে পারি। আমি খবর পেয়েছি যে, কারবার আজকাল ভালো চলছে না। খদ্দের নেই, থাকলেও সংখ্যায় খুব কম। তাই ব্যবসায়ীরা তাদের পুরনো খদ্দেরদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমারও বোধহয় শূন্যহাতে ফিরে যেতে হবে। আমাদের মতো পেনসন-প্রাপ্ত লোকেরা ভেবে খুবই আনন্দ পায় যে, খিদে মেটাবার জন্যে ভাঁড়ারে অন্তত শুকনো রুটি পাওয়া যাবে। সমস্ত জীবন ধ'রে আমি শিল্পবস্তু কিনে বেড়িয়েছি। এখন আমার পুরো সন্ন্যাস। কেনবার দিন অতীত।"

ভুলটা তাঁর শুধরে দিয়ে তাড়াতাড়ি বললুম আমি যে, কোনো কিছু বিক্রির উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসিনি। কাছেই অন্য একটা জায়গায় কাজ ছিল। তাই ভাবলুম, এত বড় একজন স্বনামধন্য শিল্প-সংগ্রাহকের সঙ্গে দেখা না ক'রে গেলে অন্যায় হবে। তা ছাড়া তিনি একজন পুরনো খদ্দেরও বটে। কথাটা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। ঘরের মাঝখানে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন—প্রথমে মুখটা তার আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, তারপর গোটা অস্তিত্বটাই আত্ম-গর্বে ভরপুর হ'য়ে গেল। ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। বোধহয় ভাবলেন, ঐ

দিকেই কোথাও তাঁর স্ত্রী ঘোরাফেরা করছেন। তাঁর দিকে চেয়ে এমনভাবে মাথা নাড়লেন যেন তিনি বলতে চান—"ওগো, ভদ্রলোকটির কথা শুনলে ?" এবার তিনি সামরিক কর্মচারীদের চরিত্রোচিত কাঠখোট্টা ভাবভঙ্গী বর্জন ক'রে অত্যন্ত মিষ্টি এবং স্নেহসিক্ত সুরে বলতে লাগলেন, "সত্যিই, তোমার ব্যবহারে মুগ্ধ না হ'য়ে পারা যায় না। কিন্তু আমার মতো একজন বুড়োহাবড়া লোকের সঙ্গে শুধু সাক্ষাৎ পরিচয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে যদি এসে থাকো তাহ'লে আমি দুঃখিত বোধ করব। সে যাই হোক, তোমার দেখবার মতো জিনিস আছে এখানে। বার্লিন কিংবা ভিয়েনার অ্যালবারটিনায়, এমনকি লুভ্‌র্-এও এমন জিনিস দেখতে পাবে না। (ওঃ, প্যারিসের মাথায় যেন ভগবানের অভিশাপ নামে!) একটি রুচিসম্পন্ন লোক পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় যেসব অমূল্য শিল্পসম্পদ সংগ্রহ ক'রে রেখেছে তা তো আর রাস্তায় ঘাটে পাওয়া যায় না। লিজ্‌বেথ, দয়া ক'রে কাবার্ডের চাবিটা একবার দাও তো!"

এর পর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। এতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী সানন্দচিত্তে আলোচনাটা শুনছিলেন। চাবির কথাটা শুনে তিনি সহসা চমকে উঠলেন। আমার দিকে হাত তুলে মাথা নাড়তে লাগলেন। কি যে তিনি বলতে চাইছেন বুঝতে পারলাম না। হেঁয়ালির মতো মনে হ'ল। স্বামীর দিকে এগিয়ে এসে ঘাড়ে তার হাত রাখলেন, তারপর বললেন, "ফ্রান্‌জ, তুমি নিশ্চয়ই ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছ, অন্য কোথাও তাঁর কাজ আছে কিনা। আর এখন তো প্রায় খাওয়ার সময় হ'য়ে গিয়েছে।" আমার দিকে চেয়ে মহিলাটি পুনরায় বলতে লাগলেন, "সত্যিই আমি দুঃখিত, অতিথিকে আপ্যায়ন করবার মতো যথেষ্ট খাবার নেই ঘরে। তুমি তো নিশ্চয়ই হোটেলে খেতে যাবে। তারপর এসো, আমাদের সঙ্গে ব'সে এক পেয়ালা কফি খাবে। তখন আমার মেয়ে আনা মারিয়াও ফিরে আসবে। পোর্টফোলিওর অভ্যন্তরে কি কি আছে সে সম্বন্ধে আমার চেয়ে আমার মেয়েই ভালো জানে।"

আরও একবার বৃদ্ধাটি আমার দিকে করুণভাবে দৃষ্টি দিলেন। পরিষ্কার বোঝা গেল, তিনি চাইছেন না যে, তক্ষুনি আমি পোর্টফোলিও থেকে সংগ্রহের তালিকাটি পরীক্ষা ক'রে দেখি। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে আমি

বললুম যে, সত্যি কথা বলতে কি, গোল্ডেন স্ট্যাগ্ হোটেলে আমারও খাওয়ার নেমন্তন্ন আছে। তারপর তিনটে নাগাদ ফিরে আসব। তাতে আমি খুশিই হব। তখন হাতেও অনেক সময় থাকবে, মিস্টার ক্রনফেল্ড যা যা দেখাতে চান সবই আমি দেখব। ছ'টার আগে বাড়ি ফেরবার আমার দরকার নেই।

বাচ্চা ছেলেদের হাত থেকে খেলনা নিয়ে গেলে যেমনভাবে তারা রেগে ওঠে, আমাদের এই বৃদ্ধ ওস্তাদটিও ঠিক তেমনিভাবে রেগে উঠলেন। অসন্তুষ্টির সুরে বলতে লাগলেন, "জানি, বার্লিনের বিশিষ্ট লোক তোমরা, তোমাদের হাতে সময় খুব কম। তবুও আমার মনে হয়, কয়েক ঘণ্টা সময় এখানে কাটিয়ে যেতে পারলে তোমার ভালোই হবে। তোমায় শুধু দু তিনটে প্রিণ্ট্ আমি দেখাতে চাইনে, তোমায় দেখাব সাতাশটা পোর্টফোলিওর পুরো তালিকা-সূচী। এক এক জন শিল্পীর জন্যে এক একটি পোর্টফোলিও— তালিকার সংখ্যাধিক্যে যেন পোর্টফোলিও ফেটে পড়ছে। যাই হোক, তুমি যদি ঠিক ঠিক তিনটের সময় আসতে পারো তাহলে বোধহয় ছটার মধ্যে আমরা সব কটা তালিকা প'ড়ে ফেলতে পারব।"

বাইরের দরজা পর্যন্ত বৃদ্ধা আমায় এগিয়ে দিতে এলেন। হল্-ঘরটা পার হ'য়ে এসে অত্যন্ত নিচু গলায় বললেন, "তোমার ফেরবার আগে আনা মারিয়া যদি তোমার সঙ্গে হোটেলে গিয়ে দেখা করে তাতে তোমার আপত্তি আছে কি? এইটেই ভালো ব্যবস্থা হবে। এর অনেকগুলো কারণ আছে। কিন্তু এক্ষুনি তো কারণগুলো তোমায় বলা চলবে না।"

"আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি তাতে খুশিই হব। সত্যিই আমি একা-একাই খাচ্ছি। আপনাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'য়ে গেলে সে যেন সোজা আমার ওখানেই চ'লে আসে।"

এক ঘণ্টা পরে ডাইনিং-রুম থেকে বেরিয়ে আমি যখন হোটেলের বসবার ঘরে এসে ঢুকলাম, আনা মারিয়া তখন এসে উপস্থিত হ'ল। দেখলুম, অবিবাহিতা প্রবীণা স্ত্রীলোক, রোগা আর সংশয়ী ধরনের—কাপড়চোপড়ে সাদাসিধে। আমাকে দেখে যেন হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইল। সহজ এবং স্বাভাবিক ক'রে তোলবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টাও করলুম। এমনও তাকে

বললুম যে, তার পিতার যদি ধৈর্যচ্যুতি ঘ'টে থাকে তাহ'লে এক্ষুনি আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'তে রাজী আছি, যদিও তিনটে তখনও বাজেনি। মেয়েটি লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠল। আরও বেশি হতবুদ্ধি হ'য়ে গেল। তারপর কোনোরকমে ভাঙা-ভাঙা কথায় অনুরোধ করলে যে, রওনা হওয়ার আগে কয়েকটা কথা সে বলতে চায়। স্বীকৃতি জানিয়ে বললুম, 'আপনি তাহ'লে বসুন। কোনো সাহায্যের দরকার হ'লে বলবেন, আমি করব।"

কি ক'রে যে আলোচনা শুরু করবে বুঝতে পারছিল না। হাত এবং ঠোঁট ওর কাঁপছিল। শেষ পর্যন্ত একটু সুস্থির হ'য়ে বলতে আরম্ভ করল, "আমার মা এখানে পাঠিয়েছেন আমাকে। আপনার কাছ থেকে একটু অনুগ্রহ চাই আমরা। আপনি এখান থেকেই সোজা ফিরে চ'লে যান। বাবা আপনাকে তার সংগ্রহটি দেখাতে চাইবেন। কি বলব দেখুন, সংগ্রহ যা করেছিলেন বিশেষ কিছু আর নেই তার।"

হাঁপাতে লাগল মেয়েটি। প্রায় ফুঁপিয়ে কাঁদার মতো অবস্থা। তারপর এক নিশ্বাসে ব'লে চলল, "দেখুন, কোনো কথাই গোপন করতে চাইনে আমি আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কি সাংঘাতিক কষ্টেই না দিন কাটছে আমাদের। মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই বাবার দৃষ্টিশক্তি একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেল। আগে থেকেই চোখে কম দেখছিলেন। হয়তো অত্যধিক উত্তেজনার জন্যেই এমনটা ঘটল। যদিও তার তখন সত্তর বছর বয়েস, তবুও তিনি যুদ্ধে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। আঠারো শো সত্তর খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের কথা হয়তো বা তার মন থেকে মুছে যায়নি। বুঝতেই পারছেন, এবারকার যুদ্ধে যোগ দেওয়ার যোগ্যতা তার ছিল না। তারপর আমাদের সেনাবাহিনীর অগ্রগতি যখন বন্ধ হ'য়ে গেল, বাবা তখন আঘাত পেলেন খুব। ডাক্তারের ধারণা, এই আঘাতই তার দৃষ্টিহানির কারণ। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, তার অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব বলিষ্ঠ ও কর্মচঞ্চল। উনিশ শো চোদ্দ সালেও দীর্ঘ পথ হাঁটতে পারতেন তিনি—শিকার করতেও পারতেন। দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ার পরে তার আনন্দের একমাত্র উৎস হ'য়ে দাঁড়াল এই সংগ্রহগুলি। প্রত্যেকদিন এগুলোর দিকে চেয়ে থাকেন তিনি। শুধু চেয়ে থাকেন, দেখতে পান না। প্রতিদিন বিকেলবেলা পোর্টফোলিও সব টেবিলের ওপর রেখে প্রিন্ট্ গুলো এক এক ক'রে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করেন। বহু বছরের পরিচিত

প্রিণ্ট্, একটাও এলোমেলো হয় না। অন্য কিছুতেই তাঁব আব আসক্তি নেই, আনন্দও নেই। অতীতের সেই নিলামেব বিববণী সব পডতে বলেন আমায। পড়িও। যখনই বেশি দামেব জিনিসগুলিব কথা উল্লেখ কবি তখনই স্ফূর্তি বাড়ে তাঁব।

"এই অবস্থা যে কত ভযাবহ সে-কথা এবাব শুনুন। মুদ্রাস্ফীতিব ব্যাপাব বাবা এখনো টেব পাননি। আমবা যে নিঃস্ব হ'যে গেছি, তাঁব পেনশনেব টাকা দিযে যে একদিনেবও খাবাব কেনা যায না তাও তিনি জানেন না। তা ছাড়া আবও লোকেব ভবণপোষণেব ভাব নিতে হযেছে আমাদেব। আমাব এক ভগ্নীপতি ভাদু নেব যুদ্ধে মাবা গিযেছেন। তাঁব চাবটি সন্তানের দাযিত্ব আমাদেরই হাতে। এই আর্থিক কষ্টেব কথা বাবাব কাছে গোপন বাখতে হয়েছে। যতদূব সম্ভব খবচ আমরা কমিযে ফেলেছি, তবুও দু বেলাব অন্ন জোটানো অসম্ভব হ যে ওঠে। কিছু কিছু জিনিস আমবা বিক্রি কবতে আবম্ভ কবলাম। বাবাব যেসব প্রিয সংগ্রহ ছিল তাতে হাত দিলাম না, শুধু খু টিনাটি জিনিসগুলো উধাও হ তে লাগল। অবিশ্যি বেচবাব মতো তেমন কিছু ছিলও না ওতে। কাবণ, কষ্টেসৃষ্টে পযসা যোগাড ক'বে বাবা তো উড্‌কাট, তামাব পাতেব ওপব খোদাই-কবা কাজ আব ঐ ধবনেবই ছোটখাটো জিনিস কিনে বেখেছিলেন। বাতিক আব কি। শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন দাঁড়াল, সংগ্রহগুলো তাঁব বিক্রি ক'বে দেব, না তিনি উপোস ক'বে মববেন? তাব অনুমতিব জন্যে অপেক্ষা কবলাম না আমরা। কি-ই বা লাভ হ'ত তাতে? তাব তো ধাবণাই ছিল না যে, অতিবিক্ত মূল্য দিযেও খাবাব যোগাড কবতে কষ্ট হচ্ছে। তিনি শোনেননি যে, যুদ্ধে জার্মানিব পরাজয় ঘটেছে। এবং অ্যাল্‌সেস-লোবেনেব ওপব যে জার্মানিব আব অধিকার নেই এই খববটাও তাঁব জানা ছিল না। এই ধবনেব খবর কখনও আমবা তাঁকে প'ড়ে শোনাই না।

"প্রথমে বেচলুম বেমব্রাণ্টেব একটা অতি মূল্যবান এচিং—নক্‌শা। খুব ভালো দামই পাওয়া গিযেছিল, কয়েক হাজাব টাকা। আমবা ভেবেছিলাম এই টাকায আমাদের অনেকদিন চলবে। তুমি তো জানো উনিশ শো বাইশ-তেইশ সালে টাকাব দাম কিবকম ক'মে গিয়েছিল। আমাদের যা সমূহ দরকাব ছিল সব কেনাকাটায় পবে বাকি টাকা ব্যাঙ্কে বেখে দিলাম।

দু'মাসের মধ্যেই সব ফুরিয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকটা এন্‌গ্রেভিং বেচে দিতে হ'ল। মুদ্রাস্ফীতির সবচেয়ে খারাপ সময় তখন। দোকানদার পুরো দাম দিতে দেরি করতে লাগল। যখন দিল তখন টাকার মূল্য এত ক'মে গেল যে, আসলে নির্ধারিত দামের শতাংশের এক অংশ মাত্র পেলুম। ভাবছেন, নিলামওয়ালাদের কাছে যাইনি কেন ? তাদের কাছেও গিয়েছিলাম। সেখানেও ঠকলুম আমরা, যদিও লক্ষ লক্ষ টাকা দাম উঠল। হাতে টাকা আসবার পর দেখলাম, হাজার টাকার নোটও সব রাস্তার ছেঁড়া কাগজের শামিল। সামান্য একটু খাদ্যের সংস্থান করতে গিয়ে বাবার সংগ্রহগুলোকে চতুর্দিকে বেচে দিতে হ'ল।

"এই কারণেই মা আজ আপনাকে দেখে এত বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। পোর্টফোলিওগুলি আপনার সামনে খুলতে গেলেই আমাদের চালাকি সব ধরা পড়ত। প্রিণ্ট্‌গুলি বেচার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকা জায়গাগুলিতে একই সাইজের মোটা কার্‌ট্রিজ কাগজ জুড়ে দিলাম। বাবা ধরতে পারলেন না। আঙুল দিয়ে টিপে টিপে প্রত্যেকটি প্রিণ্ট্‌ তিনি দেখেন, সেই সঙ্গে গুনেও ফেলেন। তাতেই চোখে দেখার মতো আনন্দ পান বাবা। রসিক লোকদের ছাড়া অন্য কারো সামনে পোর্টফোলিওগুলো বার করেন না তিনি। ছবিগুলিকে এত বেশি ভালবাসেন যে, তিনি যদি জানতে পারেন এগুলি সব বিক্রি হ'য়ে গেছে তাহ'লে ভগ্নহৃদয়ে মারা যাবেন তিনি। শেষ যাঁকে ছবিগুলি দেখাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন ড্রেসডেন শহরের কিউরেটার। বহু বছর আগেই তিনি মারা গিয়েছেন।"

মহিলাটির গলা কাঁপতে লাগল এবার। পুনরায় বলতে লাগল, "আপনাকে অনুরোধ করছি, এই মিথ্যে স্বপ্নটা ভেঙে দেবেন না তাঁর। বিশ্বাস যদি হারিয়ে ফেলেন তিনি—তাহ'লে বাবা আর বাঁচবেন না। হয়তো আমরা অন্যায় করেছি, কিন্তু আমাদের আর উপায় ছিল না। পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকাগুলি কি বাবার ঐ পুরনো ছবির চেয়ে বেশি মূল্যবান নয় ? প্রত্যেকটা ছবির সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতেন তিনি, যেন ছবিগুলি তাঁর বন্ধু ! এরাই তো তাঁর সুখ এবং শান্তির উৎস ছিল। দৃষ্টি হারাবার পর আজ বোধ-হয় এই প্রথম তাঁর চরম আনন্দের সুবর্ণ-সুযোগ এল। একজন বিশেষজ্ঞের সামনে তাঁর এই সংগৃহীত সম্পদগুলি তুলে ধরবার জন্যে কত দীর্ঘদিন ধ'রেই

না তিনি অপেক্ষা করছিলেন ! অতএব আমাদের এই ছলনাটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আপনি যদি একটু সাহায্য করেন···”

আমার এই গদ্যময় পুনরাবৃত্তি দিয়ে তোমায় আমি ঠিক বোঝাতে পারব না যে, তার এই অনুরোধের ভাষা কি করুণ আর বেদনাময় হ'য়ে উঠেছিল। আমার এই ব্যবসায়ী-জীবনে অনেক কিছু দেখলাম—নোংরা কারবার দেখেছি, মুদ্রাস্ফীতির জন্যে বহু লোককে পথে দাঁড়াতেও দেখেছি। একটুকরো রুটির জন্যে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অস্থাবর সম্পত্তি বেচে ফেলতেও দেখলুম—আর দেখলুম একেবারে নিষ্ক্রিয়ের মতো। কিন্তু তাতেও হৃদয় আমার প্রস্তরে পরিণত হয়নি। সেইজন্যেই এই কাহিনীটা গভীরভাবে স্পর্শ করল আমায়। তোমাকে বলা আবশ্যক যে, ওঁদের ঐ ছলনার অংশ নিতে প্রতিশ্রুত হলুম।

একসঙ্গেই আমরা বাড়ি পর্যন্ত এলুম। আসবার পথে শুনে দুঃখ বোধ করলাম যে, এই সরল এবং অজ্ঞ মহিলা দুজন কত অল্প দামেই না প্রিণ্ট্ গুলি সব বেচে ফেলেছেন ! এর মধ্যে অনেকগুলি ছিল খুবই দামী, কয়েকটার তো জুড়ি মেলাই অসম্ভব। স্থির করলুম, যেমনভাবে পারি এঁদের সাহায্য করব আমি।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠবার সময় শুনতে পেলাম, স্ফূর্তির স্বরে বৃদ্ধটি বলছেন—“এসো ! এসো !” অন্ধ মানুষের শ্রবণশক্তি বোধহয় তীক্ষ্ণ হয়। তাই আমার পায়ের আওয়াজ চিনতে পারলেন তিনি। আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষাও করছিলেন।

দরজা খুলে দিয়ে মৃদুভাবে হাসতে হাসতে বৃদ্ধা মহিলাটি বললেন, “দুপুরের খাওয়ার পর ফ্রান্জ্ একটু দিবানিদ্রা দেয়। কিন্তু আজকে ঘুময়নি, বোধহয় উত্তেজনা খুব বেশি।” মেয়ের দিকে চেয়ে তিনি বুঝে নিলেন, কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই। পোর্টফোলিওর গাদা টেবিলের ওপরেই ছিল। অন্ধ মানুষটি তৎক্ষণাৎ আমার হাতে ধ'রে বসিয়ে দিলেন চেয়ারে। দিয়ে বলতে লাগলেন, “এসো, সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই, আরম্ভ করা যাক। অনেক কিছু দেখার আছে, সময় পেয়ে উঠবে না। প্রথম পোর্টফোলিওতে সব ডুয়েরের ছবি। তাঁর শিল্পকর্মের প্রায় পুরোটা। এক একটা দেখবে আর মনে হবে, একটার চেয়ে অন্যটা ভালো। শিল্পকর্মের মহৎ নিদর্শন। তুমি নিজেই

বিচার ক'রে ছাখো।" পোর্টফোলিওটা খুলে তিনিই বললেন, "বাইবেলের শেষ পুস্তকের অবলম্বী যেসব ছবি আছে তা থেকে শুরু করা যাক।"

যেমন ক'রে মানুষ পলকা কিংবা দামী জিনিস নাড়াচাড়া করে তেমনি-ভাবে অত্যন্ত দরদের সঙ্গে সেই কাবৃট্রিজ কাগজের চিহ্নহীন সাদা পাতাটা আমার চোখ আর তাঁর নিজের চোখের মাঝখানে তুলে ধরলেন তিনি। তার স্থিরদৃষ্টিতে এমন একটা গভীর আগ্রহ ফুটে উঠল যে, বিশ্বাস করতে পারলুম না, তিনি অন্ধ। যদিও জানি অসম্ভব, তবুও তাঁর কুঞ্চিত ভুরুর ভঙ্গী থেকে মনে হ'ল তিনি বুঝি দেখতে পেলেন।

"এর চেয়ে ভালো প্রিণ্ট্ কি তুমি কখনো দেখেছ? কি সূক্ষ্ম এর মুদ্রণ। খুঁটিনাটি রেখাগুলিও স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। ড্রেসডেনের যাদুঘরে রক্ষিত একটা কপির সঙ্গে আমারটা মিলিয়ে দেখেছিলাম। সেটাও ভালো, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার গায়ে দেখলুম আঁশের মতো দাগ পড়েছে অনেক। তা ছাড়া আমার কাছে তো পুরো সংগ্রহটাই আছে।"

পাতাটার পেছন দিকটা এবার ঘুরিয়ে ধরলেন তিনি। এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে আঙুল তুললেন যে, ইচ্ছে ছিল না, তবুও ঝুঁকে দাঁড়িয়ে অলিখিত শিলালিপি পড়তে লাগলুম যেন।

বৃদ্ধটি আবার বলতে লাগলেন, "চেয়ে ছাখো, এতে নাগ্‌লের, বেমি আর এনদাই-এর সংগ্রহের সীলমোহর রয়েছে। এইসব অতিপ্রসিদ্ধ পূর্বসূরীরা কখনো কল্পনাও করতে পারেননি যে, তাঁদের সারা জীবনের সঞ্চিত সম্পদ সব এমন একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে প'ড়ে থাকবে।"

ঐ চিহ্নহীন সাদা পাতাটি সম্বন্ধে তার এত উচ্চ প্রশংসা শুনে সত্যিই কম্পিত হ'য়ে উঠলাম। যখন তিনি আঙুল দিয়ে অদৃশ্য সীলমোহরের স্থানটি নির্দেশ করছিলেন তখন আমার হাড়ে পর্যন্ত সুড়সুড়ি দিয়ে উঠল। যেসব মৃত পূর্বগামীদের নাম করলেন তিনি, তারা যেন সহসা কবর থেকে বেরিয়ে এলেন। জিব আমার আড়ষ্ট হ'য়ে গেল। মহিলা দুটির বেদনাময় মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই নিজেকে সামলে নিলুম আমি। তারপর আবার অভিনয় শুরু ক'রে দিলাম। খুব একটা হৃদ্যতার ভাব দেখিয়ে ব'লে উঠলাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনার এই সংগ্রহটির জুড়ি পাওয়া অসম্ভব।"

জয়ের আনন্দে ফুলে-ফেঁপে উঠে বৃদ্ধটি বলতে লাগলেন, "এটা তো কিছুই

না। এই দুটো প্রিণ্ট্ তুমি ছাখো—'মেলন্‌কোলিযা' আব 'প্যাসন'। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শেষেবটি অদ্বিতীয। মনে হয যেন সেদিনেব মুদ্রণ! তোমাব বার্লিনেব শিল্প-ব্যবসাযীরা আব পাবলিক-গ্যালারিব বড কর্তারা যদি দেখেন তাহ'লে ঈর্ষায জ্বলেপুড়ে মববেন।"

—বর্ণনা দীর্ঘ হ'যে যাচ্ছে, একঘেযেমিব ক্লান্তি আসছে তোমাব। যাহ হোক, তন্ন তন্ন ক'বে পোর্টফোলিওগুলি দেখাতে লাগলেন তিনি—প্রায ঘণ্টা দুই-এব জয়গান। ব'সে-ব'সে শ' তিনেক সাদা পাতা দেখা আব সমযমতো প্রশংসায পঞ্চমুখ হ'যে ওঠা, সে এক ভীতিকব ব্যাপাব হ'যে দাঁডাল। অবিশ্যি, অন্ধ মানুষটি তাতে আনন্দে আত্মহাবা হযে উঠলেন। এবং তাঁব সবল বিশ্বাসেব প্রাবল্যে আমিও যেন শেষ পযন্ত বিশ্বাস কবতে লাগলুম।

বিপদে যে পডিনি তা নয। তিনি আমায বেম্‌ব্রাণ্টেব 'অ্যান্‌টিওপ' ছবিব প্রিণ্ট্ দেখাচ্ছিলেন। খুবই দামী ছবি, এবং সেটা যে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি হ'যে গেছে তাতেও সন্দেহ নেই। প্রিণ্টেব ওপব হাত বুলোতে বুলোতে হঠাৎ তাব মনে সন্দেহ জাগল। কযেকটা পবিচিত খাজ তাব হাতে ঠেকল না। মুখেব ওপব বিষাদেব ছাযা পডল, ঠোট দুটো কেঁপেও উঠল একটু। তিনি জিজ্ঞাসা কবলেন, "নিশ্চযই এটা 'অ্যান্‌টিওপ'? আমি ছাড়া অন্য কেউ তো উডকাট আব এচিং গুলিতে হাত দেয না। তবে কি ক'রে প্রিণ্ট্‌গুলো অদলবদল হ'যে গেল?"

সাদা কাগজগুলো তাব হাত থেকে তাডাতাডি নিযে নিলুম। সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা শুরু ক'বে দিলুম। সন্দেহটা ক্রমে ক্রমে মন থেকে তাঁব মুছে যেতে লাগল। যত বেশি প্রশংসা কবছি তত বেশি তার সন্তুষ্টি বাডছে। মেযে আব স্ত্রীব দিকে চেযে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন তিনি, "এই ছাখো, সত্যিকাবেব জহুবী। তোমবা তো বলতে, বাজে জিনিস কিনে-কিনে টাকা নষ্ট কবছি আমি। সমস্ত জীবন ধ'বে সবরকম সাংসাবিক সুখ-সুবিধা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছি। বই কিনিনি, ভ্রমণ কবতে বেবোইনি, থিয়েটাব দেখা বন্ধ কবেছি, কোনোবকম নেশা পর্যন্ত স্পর্শ করিনি। যে ক'টা টাকা বাঁচাতে পেবেছি তাই দিযে এই শিল্প-সংগ্রহটা কিনেছি। তোমবা ভাবতে, কি তুচ্ছই না এসব কাজ। এখন ছাখো, মিস্টার রাক্‌নেব প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, আমি ভুল করিনি। আমার মৃত্যুব পবে ড্রেসডেন শহরেব

যে-কোনো ধনীলোকের মতো তোমরাও ধনী হবে। তখন তোমরা আমার এই 'বাতিক'-এর কথা স্মরণ ক'রে আত্মতুষ্টি লাভ করবে। কিন্তু আমি যতদিন জীবিত থাকব ততদিন এই সংগ্রহগুলির একটাও খোয়া যাবে না। আমার মৃত্যুর পরে ইনি কিংবা অন্য কোনো শিল্প-ব্যবসায়ী আসবেন। এগুলি বেচবার সময় সাহায্যও করবেন। বেচতে তোমাদের হবেই। কেননা আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পেনশনটাও বন্ধ হ'য়ে যাবে।"

কথা বলছেন আর সযত্নে স্নেহভরে ফাঁকা পোর্টফোলিওটির গায়ে হাত বুলচ্ছেন। দৃশ্যটা সত্যিই কি ভয়ঙ্কর আর মর্মস্পর্শী হ'য়ে উঠল। বহু বছরের মধ্যে, এমনকি, উনিশ শো চোদ্দ সাল থেকেই একজন জার্মানের মুখের ওপর এমন একটা চরম সুখের ছবি ফুটে উঠতে দেখিনি। তার স্ত্রী আর মেয়ে সজল চোখে বৃদ্ধটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। দুঃখ পাচ্ছেন, আবার সেইসঙ্গে চাপা আনন্দের আভাস। এ যেন সেই দু হাজার বছর আগেকার মেয়ে দুটির মতো—ভীতা, অথচ আনন্দে আত্মহারা হয়ে দেখছে কবরের পাথর সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, যীশুখ্রীস্টের পুণ্যময় শবদেহটি তাতে নেই।

আমার মুখ থেকে এত প্রশংসার কথা শুনেও বৃদ্ধটির যেন তৃষ্ণা মিটল না। আমার কথা শুনছেন আর পোর্টফোলিও থেকে আরও প্রিণ্ট্ বার ক'রে আমায় দেখাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তিনি। কার্ট্রিজ কাগজের সাদা পাতাগুলি গুছিয়ে রেখে, দিলেন পোর্টফোলিওতে। আমি নিশ্চিন্ত বোধ করলাম।

এবার কফি খাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। বৃদ্ধটি ভেঙে পড়লেন না, বরং পুনর্যৌবন লাভ করলেন যেন। কি ক'রে হঠাৎ হঠাৎ এইসব মূল্যবান সংগ্রহগুলি পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি, সেই সম্বন্ধে কতরকমের গল্প বলতে লাগলেন। বলতে-বলতে আবার তিনি পোর্টফোলিও খুলতে যাচ্ছিলেন। আমরা সবাই তখন জোর দিয়েই বললুম যে, আর দেরি করলে ট্রেন পাব না। তিনি বিরক্ত বোধ করলেন।

যাই হোক, তিনি আর আমায় বাধা দিলেন না। এবং আমরা উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। তাঁর কণ্ঠস্বর নরম হ'য়ে এল। আমার হাত ধ'রে তিনি আদর করতে লাগলেন। অন্ধ মানুষের স্পর্শানুভূতির গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করলুম আমি।

ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে বৃদ্ধটি বললেন, "তুমি এসেছ ব'লে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। তোমার মতো বিশেষজ্ঞকে এগুলি দেখিয়ে আমি কি তৃপ্তিই না পেলুম। তুমি রসিক, তাই তুমি এর রস আস্বাদন করতে পারলে। একজন অন্ধলোকের কাছে আসা তোমার নিরর্থক হবে না। আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতার ঋণ আমি শোধ করতে চাই। আমার উইলের ক্রোড়পত্রে লেখা থাকবে যে, তোমরাই আমার সংগ্রহগুলি নিলাম করবে। তোমাদের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ নেই।"

একগাদা অন্তঃসারশূন্য কাগজের পোর্টফোলিওর ওপর স্নেহাতুর হাতখানা ফেলে রাখলেন তিনি। বললেন, "কথা দিয়ে যাও, সংগ্রহগুলির জন্যে একটা সুন্দর ক্যাটালগ তৈরি করবে তুমি? এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর স্মৃতিস্তম্ভ আমি কল্পনাই করতে পারিনে।"

তাঁর স্ত্রী আর মেয়ের দিকে চেয়ে দেখলাম আমি। অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করছিলেন তারা। ভয়ে মরছেন, মৃদু কম্পনধ্বনিও যদি তার কানে গিয়ে পৌঁছয়। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কথা দিয়ে আসতে হ'ল তাকে, যদিও জানি এমন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা অসম্ভব। কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি আমায় আলিঙ্গন করলেন।

মা আর মেয়ে দুজনেই আমার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দরজা পর্যন্ত এলেন। কথা বলছিলেন না, চোখ দিয়ে শুধু জল গড়িয়ে পড়ছিল। আমার অবস্থাও প্রায় তদনুরূপ। আমি শিল্প ব্যবসায়ী, দাঁও মারবার উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছিলাম সেখানে। তা তো হ'লই না। বরং আমি যেন তাঁদের সৌভাগ্যের বরণডালা হাতে নিয়ে উপস্থিত হলুম। একটি বুড়ো লোককে সুখী করবার জন্যে চালাকির অংশ নিতে দিব্যি দিয়ে বসলাম। এই মিথ্যাচারের জন্যে লজ্জা বোধ করলুম বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও খুশি হলুম আমি। একটা দীর্ঘদিনের একটানা দুঃখজনক অন্ধকারময় পরিবেশের মধ্যে স্ফূর্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারলুম তো।

পথে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আবার। জানালা খোলার আওয়াজ এল কানে। আমার নাম ধ'রে কে যেন ডাকলেনও। অন্ধ মানুষটি চোখে দেখতে না পেলে কি হবে, অনুমানে বুঝতে পারলেন আমি কোন্ দিক

দিয়ে বেরুব। দৃষ্টিহীন চোখ তাঁর এদিক-ওদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল আমায়। জানালার ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর স্ত্রী আর মেয়ে তাঁকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে ফেললেন। ভয় পেলেন, কি জানি প'ড়ে যান যদি! একটা রুমাল উড়িয়ে তিনি চিৎকার ক'রে বললেন, "তোমার যাত্রা শুভ হোক, মিস্টার বাক্‌নের!"

একটা বাচ্চা ছেলের মতো গলার স্বর তাঁর ছড়িয়ে পড়ল আকাশের শূন্যতায়। এমন একটি উৎফুল্ল মুখের ছবি সারা জীবনেও ভোলবার নয়। ড্রেসডেনের রাস্তায় যেসব নিদারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখ আমি দেখেছি, তাদের সঙ্গে এর কোনো তুলনাই হয় না। একটা মিথ্যে কল্পনার জাল আমি বুনে এলুম—তা হোক, দুর্বিষহ জীবনের বোঝা খানিকটা হালকা হবে তাতে। বোধহয় গ্যেটেই যেন বলেছিলেন : "শিল্প-সংগ্রাহকদের মতো সুখী আর কেউ নয়।"

গভর্নেস

মেয়ে দুটি তাদেব নিজেদেব ঘবেই ছিল। আর কেউ ছিল না সেখানে। আলো সব নিবে গিয়েছে। চতুর্দিকটাই অন্ধকার। শুধু ওদেব বিছানাব দিক থেকে একটা ক্ষীণ আলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। এত ধীবে ধীরে ওবা নিশ্বাস ফেলছিল যেন মনে হয় ওবা বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে।

বছব বাবো বয়েসেব মেয়েটি ফিসফিস স্বরে বলল, "এই শোন্—"

"কি, বল্ ?" জিজ্ঞাসা কবল অন্য বোনটি। বয়েসে এক বছবেব বড এ।

"তুই জেগে আছিস দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। তোকে একটা কথা বলব।"

বড বোনটি কথা বলল না বটে, কিন্তু বিছানা থেকে নডাচডাব আওয়াজ উঠল। তখন সে উঠে বসেছে। ক্ষীণ আলোয চোখ দুটো তার জ্বলছে আর অপেক্ষা কবছে কতক্ষণে কথাটা সে শুনতে পাবে।

"শোন্, আমি যা বলতে চাই। কিন্তু আগে বল্ তো, মিস মানের মধ্যে অদ্ভুত কিছু দেখেছিস কি না ?"

একটু চুপ ক'বে থেকে বড বোনটি বলল, "হ্যাঁ, দেখেছি বটে, তবে সেটা যে কি ঠিক বুঝতে পাবছি না। আগেব মতো মেজাজটা তাঁর কডা নয়। দু'দিন তো লেখাপডাব কাজে হাত দিইনি, অথচ তিনি আমায় বকেননি। জানি না কি যে তাঁব হযেছে। মনে হয, আমাদেব নিয়ে তিনি আব মাথা ঘামাচ্ছেন না। একা-একা ব'সে থাকেন। আমাদেব সঙ্গে খেলাধুলোয় যোগ দেন না পযন্ত।"

"আমাব মনে হয় মিস মানেব মনে শান্তি নেই। অবিশ্যি আমাদেব তিনি তা বুঝতে দেন না। এখন তো দেখছি পিযানো বাজানোও ছেড়ে দিয়েছেন।"

মুহূর্তের বিরতিব পবে বড বোনটি আবার বলল, "তুই বলছিলি, কি যেন একটা কথা বলবি ?"

"বলব। কিন্তু ভাই কাউকে যেন কথাটা ফাঁস ক'বে দিসনি। মা কিংবা তোর বন্ধু ন্টীও যেন ঘুণাক্ষরে একটি কথাও না জানতে পারে।"

একটু রাগের সুরে বড় বোনটি বলল, "তা কেন জানতে পারবে রে? এবার ব'লে ফেল।"

"আচ্ছা বলছি। বিছানার কাছে এসে হঠাৎ আমার মনে পড়ল যে, মিস মানের কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়ে আসিনি। আবার জুতো পরবার ঝামেলা আর নিলুম না। তাঁকে অবাক ক'রে দেয়ার উদ্দেশ্যে পা টিপে টিপে তার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। একরত্তি আওয়াজ না ক'রে দরজাটা খুলে ফেললুম। এক মুহূর্তের জন্যে ভাবলুম, তিনি বুঝি ঘরের মধ্যে নেই। আলো জ্বলছিল, তবুও তাকে আমি দেখতে পেলাম না। সত্যিই বলছি ভাই চমকে উঠেছিলুম—হঠাৎ শুনতে পেলুম কে যেন কাঁদছে। তারপর দেখি, বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে জামাকাপড় প'রে তিনি বিছানায় শুয়ে রয়েছেন। এমন সাংঘাতিকভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন তিনি যে, আমার বিশ্রী লাগল। তিনি আমায় দেখতে পাননি। আবার আমি দরজাটা খুব আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিয়ে ওখান থেকে স'রে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম মুহূর্তখানিক। কারণ, আমি সত্যিই হাঁটতে পারছিলাম না। দরজার ফাঁক দিয়ে তখনও তাঁর কান্নার সুর আমার কানে আসছিল। একটু পরেই ফিরে এলাম।"

মিনিটখানিক পর্যন্ত দু'জনের একজনও আর কথা বলল না। তারপর বড় বোনটি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'লে উঠল, "আহা বেচারী মিস মান!" তারপর আবার একটু বিরতি।

ছোট বোনটি পুনরায় আলোচনা চালু করল, "কি জন্যে যে তিনি কাঁদছিলেন, ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি। গত ক'দিনের মধ্যে তো ঝগড়াঝাঁটিও হয়নি। আগের মতো মা-ও তো কাজের দোষ ধ'রে তাঁকে জ্বালাতন করেন না। আমরাও কোনো উৎপাত করিনি। তবে তিনি কাঁদছিলেন কেন?"

"আমার মনে হয় কারণটা আমি জানি।" বলল বড় বোনটি।

"তাহ'লে শিগগির বল—বল না ভাই।"

"আমার বিশ্বাস তিনি প্রেমে পড়েছেন।"

"প্রেমে পড়েছেন?" ছোট বোনটি বিছানায় উঠে বসল, "প্রেমে পড়েছেন? কার প্রেমে?"

"তুই কি নজর করিসনি কিছুই?"

"অটোর কথা বলছিস?"

"নিশ্চয়ই। অটোও তাঁর প্রেমে পড়েছে। সে তো আমাদের বাড়িতে বাস করছে তিন বছর হ'য়ে গেল। কোনো দিনও সে আমাদের সঙ্গে বেড়াতে আসত না। শুধু এই তিন মাস আগে থেকে অটো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসে। একটা দিনও বাদ দেয় না। অথচ যতক্ষণ পর্যন্ত না মিস মান আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের যেন দেখতেও পায় না। এখন তো সে চারদিকে ব্যস্তবাগীশের মতো ঘুরঘুর ক'রে ঘুরে বেড়ায়। মিস মান আমাদের যেখানেই বেড়াতে নিয়ে যান, সেখানেই পার্ক কিংবা বাগানের কোনো-না-কোনো জায়গায় অটোর সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়। নিশ্চয়ই তুই লক্ষ্য করেছিস?"

"নিশ্চয় আমি লক্ষ্য করেছি।" জবাব দিল ছোট বোন, "কিন্তু আমি ভেবেছিলাম—" কথাটা শেষ করল না সে।

"আমিও প্রথমে এ নিয়ে হৈচৈ করবার মতো কিছু একটা ভাবিনি। তারপর কয়েকদিন বাদে আমি ভাবলুম—আর ঠিকই ভাবলুম যে, আমাদের সঙ্গে হঠাৎ-হঠাৎ দেখা হওয়াটা ওর একটা ছুতো।"

অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ ক'রে রইল ওরা। উল্টেপাল্টে ব্যাপারটা সব ভাবতে লাগল। ছোট বোনই প্রথমে আবার বলতে শুরু করল, "বেশ, তাই-ই যদি হবে তাহ'লে তিনি কাঁদলেন কেন? অটো মিস মানকে পছন্দ করে খুব। আমি তো সব সময়েই ভেবেছি, প্রেমে পড়া কি মজার ব্যাপার।"

"আমিও তাই ভেবেছি—' স্বপ্নাবিষ্টভাবে বড় বোন বলল, "কিন্তু কাঁদলেন কেন বুঝতে পারছি না।" তন্দ্রালুভাবে সে আবারও ব'লে উঠল, "আহা বেচারী মিস মান।"

সেই রাত্রে ওদের মধ্যে আর কোনো কথা হ'ল না।

পরের দিন সকালবেলা এই ব্যাপার নিয়ে একটা কথাও উল্লেখ করল না বটে, কিন্তু ওরা দু'জনেই বুঝতে পারল যে, ওদের মনপ্রাণ সব এই চিন্তার মধ্যেই ডুবে রয়েছে। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নয়, তবু যখনই গভর্নেসের দিকে চোখ পড়ছে তখনই অনিচ্ছা সত্ত্বেও এদের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় হচ্ছে। খাবার সময় খুড়তুতো ভাই অটোকে গ্রাহ্যই করল না এরা। এমন ভাব দেখাল

যেন ওকে ওবা চেনেই না। একটি কথাও বলল না অটোব সঙ্গে। কিন্তু লুকিযে লুকিযে ওকে গভীবভাবে পযবেক্ষণ কবতে লাগল।· মিস মান আব অটোব মধ্যে গোপনে ভাববিনিময হচ্ছে কিনা ধববাব জন্যে চেষ্টাও কবতে লাগল ওবা। এতে যে খুব একটা স্ফূর্তি আছে তা নয। কাবণ, হেঁয়ালিব বহস্য ছাডা এব মধ্যে যে অন্য কিছু থাকতে পাবে তেমন কথা ওবা ভাবতে পাবেনি। সন্ধেব সময একজন অন্যজনকে জিজ্ঞেস কবল, আব কবল এমন ভঙ্গিতে যেন ব্যাপাবটায কোনো কৌতূহলই নেই, "হ্যাঁ বে, আজ নতুন কিছু তুই দেখলি?"

"না।" অতি সংক্ষেপে জবাব দিল অন্য বোনটি।

বিষযটি নিযে আলোচনা কবতে ওবা সত্যি সত্যি ভয পাচ্ছিল। এইভাবেই আবও কযেকটা দিন কেটে গেল। যা কিছু দেখছে, দুটি মেযেই নিঃশব্দে মনেব খাতায টুকে বাখছে সব। অস্বস্তিব সীমা নেই, তবুও ভাবছে, এই বুঝি কি একটা অত্যাশ্চয গুপ্ত বহস্য আবিষ্কাব কবে ফেলল বুঝি।

শেষ পযন্ত একদিন খাবাব সময ছোট মেযেটি লক্ষ্য করল যে, তাদেব গভনেস অটোকে কি যেন একটা ইশাবা কবলেন। আব এমনভাবে কবলেন যে, অন্য কেউ যেন দেখতে না পায। মাথা নেডে সায জানাল অটো। উত্তেজনায অস্থিব হযে উঠল সে। টেবিলেব তলায বড বোনেব পাযে তক্ষুনি পা দিযে খোঁচা মাবল। বড বোন তখন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চেযে বইল ওব দিকে। ছোটটিব চোখে অর্থপূর্ণ ভাষা। খাওযা শেষ কববাব জন্যে ছটফট কবতে লাগল ওবা। শেষ হওযাব পবে মিস মান ওদেব বললেন, "তোমবা স্কুলঘবে গিযে যা হয কিছু কবো। আমাব বড্ড মাথা ধবেছে। আধ ঘণ্টা শুযে থাকব আমি।"

স্কুলঘবে পৌঁছেই ছোট মেযেটি বলে উঠল, "দেখিস, অটো এখন মিস মানেব ঘবে গিযে ঢুকবে।"

'তা তো ঠিকই। সেইজন্যেই তো উনি আমাদেব এখানে পাঠিযে দিলেন।"

"ঘবেব বাইবে থেকে ওঁদেব কথাবার্তা আমবা শুনব।"

"কিন্তু কেউ যদি এসে পডে "

"কে আসবে?"

"মা।"

ছোট মেয়েটি বলল, "তাহ'লে কিন্তু ভারী বিশ্রী ব্যাপার হবে।"

"শোন—আমি গিয়ে দাঁড়াই বাইরে। কেউ যদি এসে পড়ে তাহ'লে ঐ সরু বারান্দা থেকে ইশারা করিস তুই।"

অসন্তোষভরে ঠোঁট বাঁকিয়ে ছোট বোনটি বলল, "তুই যদি সব কথা আমায় না বলিস ?"

"ভয় করিস নে, স-ব বলব।"

"গা ছুঁয়ে দিব্বি কর।"

"গা ছুয়ে দিব্বি করছি। কাউকে যদি আসতে দেখিস তাহ'লে কাশির শব্দ করবি।"

ওরা ঐ সরু বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। উত্তেজনায় ভেঙে পড়ছিল যেন। কি যে ঘটবে এখনো বোঝা যাচ্ছে না। এমন সময় পায়ের আওয়াজ পেল ওরা। কে যেন আসছে। অন্ধকার স্কুলঘরে গিয়ে লুকিয়ে রইল। হ্যা, ঠিক—অটো আসছে। মিস মানের ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল সে। বড় বোন ছুটে গিয়ে তার পূর্বনির্ধারিত জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। দরজায় চাবি লাগাবার ফুটোর কাছে কান পেতে কথাবার্তা সব শুনতে লাগল। ভয়ে সে নিশ্বাস ফেলতে পারছে না। ছোটটি ঈর্ষান্বিতভাবে চেয়ে চেয়ে দেখছে। কি ভীষণ কৌতূহল তার। সেও পা টিপে টিপে চলে এল দরজার কাছে। কিন্তু বড় বোন ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। রেগে গিয়েছে সে। ইশারা ক'রে বলল বারান্দায় গিয়ে পাহারা দেবার জন্যে। কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ছোট মেয়েটির কাছে মনে হ'ল, সে যেন অনন্তকাল ধ'রে অপেক্ষা করছে। আর সে ধৈর্য ধরতে পারছে না। অস্থিরভাবে ঘোরাফেরা করছে, যেন ওর পায়ের তলায় জলন্ত অঙ্গার। চোখ ফেটে জল আসতে চায়—দিদি একাই যে সব শুনে ফেলছে। অনেকক্ষণ পর একটা আওয়াজ শুনে সে চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কেশে উঠল একবার। দুজনেই তখন পালিয়ে গেল স্কুলঘরে। হাঁপাচ্ছিল ওরা। একটু পরে ছোট মেয়েটা বলল, "এবার বল আমায় সব।'

মনে হ'ল, বড়টি হকচকিয়ে গেছে। যেন নিজের কাছেই নিজে বলল, "কি যে ব্যাপার বুঝতে পারলুম না।'

"কি বললি ?"

"ভীষণ অস্বাভাবিক কাণ্ড।"

"বল্—বল্ না ভাই কি ?"

বেশ কষ্ট ক'রেই বড বোন বলতে লাগল, "আমি যা ভেবেছিলুম তা নয়। সত্যিই বিস্ময়কব। আমার মনে হয় ঘরে ঢুকেই অটো মিস মানকে জডিয়ে ধবতে চাইল এবং চুমু খেতেও চেষ্টা কবল। কাবণ, মিস মান বললেন, 'এখন নয, সাংঘাতিক একটা কথা আছে, আগে শুনে নাও।' আমি ভাই কিছু দেখতে পাইনি। দবজাব ফুটোয চাবি লাগানো ছিল। কিন্তু প্রত্যেকটা কথাই শুনেছি। অটো জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে ?' এই বকম স্ববে ওকে আমি কোনোদিনও কথা বলতে শুনিনি। তুই তো জানিস কি রকম জোবে জোবে আব ধৃষ্টেব মতো কথা কয সে। কিন্তু এখন ওব গলাব স্বব শুনে মনে হ'ল, ভয পেযেছে। মিস মান নিশ্চযই বুঝতে পেবেছেন যে, অটো তাঁব সঙ্গে দমবাজি করছে। কাবণ তিনি বললেন, 'যা হযেছে তা তো তুমি সবই জানো।' সে বলল, 'কিচ্ছু জানি না।' বিষণ্ণ স্ববে তিনি তখন বললেন, 'আমাব কাছ থেকে তুমি কেন দূরে দূবে থাকো ? একটা সপ্তাহ তো তুমি আমাব সঙ্গ একবকম কথাই বলোনি। সুযোগ পেলেই এডিযে চলো আমায। বোনেদেব পযন্ত ত্যাগ করেছ। পার্কেও আমাদের সঙ্গে দেখা কবতে আসো না তুমি। আমাকে কি ভালবাসো না আব ? এর কাবণ তুমি নিশ্চযই জানো।' এব জবাবে অটো কিছুই বলতে পাবলে না। মুহূর্তেব জন্যে চুপ ক'বে বইল, তাবপব সে বলল, 'তুমি নিশ্চযই জানো আমার পবীক্ষা কত কাছে এগিযে এসেছে। আমাব হাতে সময খুবই কম, লেখাপডা নিযে ব্যস্ত। উপায কি বলো ?' মিস মান কাঁদতে কাঁদতে ধীবে ধীরে বললেন, 'অটো, সত্যি কথা বলো। আমি এমন কি কবেছি যাব জন্যে তুমি এবকম ব্যবহার কবছ ? তোমাব কাছে তো আমি কিছুই দাবি কবিনি। সব কথা খুলে ব'লে ফেলাই ভালো। তোমার ভাবভঙ্গি দেখে পরিষ্কার বুঝতে পাবছি, তুমি সবই জানো সেই ব্যাপাব সম্বন্ধে '

এই পর্যন্ত ব'লে মেযেটি কাঁপতে লাগল, কথাটা শেষ করতে পারল না। ছোট বোন সামনে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কোন্ ব্যাপার সম্বন্ধে ?"

" 'আমাদেব বাচ্চাব সম্বন্ধে।' "

"ওদেব বাচ্চা।" ছোট বোনটি যেন ভেঙে পড়ল, "বাচ্চা। অসম্ভব।"

"সত্যিই মিস মান তাই বললেন।"

"তুই বোধহয ঠিক শুনিসনি।"

"ঠিকই শুনেছি। ভুল হবে কি ক'বে, অবাক হ'য়ে অটো দ্বিতীযবাব বলল, 'আমাদেব বাচ্চা।' খানিকক্ষণ পবে মিস মান জিজ্ঞাসা কবলেন, 'আমরা এখন কি কবব ?' তারপব

"তাবপব কি ?"

"তুই কেশে উঠলি আমি পালিযে এলুম।"

ছোট মেযেটি হতবুদ্ধিব মতো চুপ ক'রে বইল একটু, তাবপব বলল, "কিন্তু মিস মানেব তো বাচ্চা থাকতে পাবে না। আব যদি থাকবেই তাহ'লে সে কোথায আছে ?"

"তোব মতো আমিও যে বুঝতে পাবছি না।"

"বোধহয বাড়িতে বেখে এসেছেন তিনি। এটা তো জানা কথা যে, মা কখনো তাঁব বাচ্চাটিকে এখানে নিযে আসতে দেবেন না। সেইজন্যই তিনি এত অসুখী।"

"বাজে বকিসনে, অটোকে তিনি তখন চিনতেন না।"

অসহায বোধ কবতে লাগল ওবা। ছোট মেযেটি আবাব কথা আবম্ভ কবল, "বাচ্চা ? না, অসম্ভব। তাঁব বাচ্চা হবে কি ক'বে ? তিনি তো বিয়ে কবেননি। শুধু বিযে-কবা লোকদেবই বাচ্চা হয।"

"কে জানে, হযতো তিনিও বিবাহিতা।"

"বোকাব মতো বকবক কবিসনে। অটোব সঙ্গে তাব বিযে হ'ল কবে ?"

'তাহ'লে তো মুশকিলেই পড়া গেল।"

উভযে উভযের দিকে হাঁ ক'বে চেযে বইল। ওদেব মধ্যে একজন সহানুভূতির সুবে মন্তব্যও কবল, "আহা, বেচাবী মিস মান।"

এই দুঃখসূচক কথাটা ওবা বাববাব প্রকাশ কবছিল। যেন একমাত্র এইটেই ওদেব সমবেদনাব ভাষা। একটু বাদেই আবার ওদেব কৌতূহলের আগুন জ্ব'লে উঠল, "তুই কি বলিস, বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে ?"

"আমি কি ক'রে বলব রে ?"

"তাঁকে যদি কায়দা ক'রে জিজ্ঞাসা করি ?"

"সর্বনাশ ! চুপ কর।"

"কেন চুপ করব ? তিনি আমাদের কত ভালবাসেন।"

"কোনো লাভ হবে না জিজ্ঞাসা ক'রে। এসব কথা আমাদের সঙ্গে ওঁরা আলোচনা করবেন না। দেখিসনি, ওঁদের আলোচনার মাঝখানে আমরা গিয়ে যদি উপস্থিত হই, তক্ষুনি ওঁরা কথা বন্ধ ক'রে অন্য সব আজেবাজে বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু ক'রে দেন ? আমরা যেন কিচ্ছুই বুঝি না—ছোট্ট বাচ্চা ! আমার তো তেরো বছর বয়েস হ'ল। বোকা সাজবার জন্যে ওঁদের জিজ্ঞেস ক'রে লাভ কি ?"

"কিন্তু আমি যে ভাই জানতে চাই।"

"হ্যাঁ, আমারও তো জানবার ইচ্ছা প্রবল।"

"সবচেয়ে খারাপ লাগছে অটোর ভণ্ডামি দেখে। যেন এ সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। ন্যাকা আর কি ! নিজের বাচ্চা থাকলে জানতে পারেই, যেমন সবাই তার বাপ মাকে জানে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি সে শুধু ধাপ্পা মেরে সময় নিচ্ছে।"

"কিন্তু এমন গুরুতর ব্যাপারে ধাপ্পা মারা উচিত নয়। আমাদের সঙ্গে ফাজলেমি করবার জন্যে যদি মারত তাহ'লে না হয় বুঝতুম।"

এই সময় মিস মান এসে উপস্থিত হ'লেন। কথা বন্ধ ক'রে ওরা যেন লেখাপড়ার মধ্যে ডুবে গেল তক্ষুনি। কিন্তু ওরা ঠিক ধ'রে ফেলল, তার চোখের পাতা দুটো রক্তিমাভ, গলার স্বরও ভেজা। চুপ ক'রে ব'সে রইল ওরা। এ এক নতুন ধরনের ভক্তি এল ওদের মনে। ভাবতে লাগল, "মিস মানের একটা বাচ্চা আছে। সেইজন্যেই তিনি দুঃখ পাচ্ছেন এত।"

কথাটা ভাবতে ভাবতে ওদের মুখের ওপরেও কষ্টের ছায়া পড়ল। টের পেল না ওরা।

পরের দিন রাত্রিবেলা খাবার সময় একটা চাঞ্চল্যকর খবর শুনল ওরা। অটো চ'লে যাচ্ছে। সে তার কাকাকে নাকি বলেছে যে, পরীক্ষার আগে তাকে ভীষণভাবে লেখাপড়া করতে হবে। এখানে ওর লেখাপড়ায় ব্যাঘাত

ঘটছে খুব। সে একটা বাসাবাড়িতে উঠে যাচ্ছে। মাস দুই থাকবে সেখানে।

উত্তেজনায় মেয়ে দুটি যেন টগবগ ক'রে ফুটছিল। ওরা ঠিক বুঝতে পেরেছে যে, অটোর চ'লে যাওয়ার সঙ্গে আগের দিনের কথাবার্তার সম্পর্ক রয়েছে। ওরা ভাবল, ভীরুর মতো পালিয়ে যাচ্ছে অটো। ওদের কাছে সে যখন বিদায় নিতে এল তখন ওরা ইচ্ছে ক'রেই রূঢ় ব্যবহার করল এবং তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে রাখল। মিস মানের সঙ্গে অটোর বিদায়-দৃশ্যটাও দেখল ওরা। তিনি খুব ঠাণ্ডা মেজাজে করমর্দন করলেন বটে, কিন্তু ব্যথার ভাবে ঠোঁট দুটো তাঁর মৃদুভাবে ন'ড়ে উঠল।

এর পর থেকে মেয়ে দুটিকে দেখলে আর চেনা যায় না—ভীষণভাবে বদলে গেল। মুখে হাসি নেই, আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেয় না। বিষাদের ভারে চোখ দুটিও ভারাক্রান্ত। অস্থিরভাবে ঘুরঘুর ক'রে এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। বড়দের ওপরে আর বিশ্বাস নেই—তাঁদের সহজ কথার মধ্যেও এরা অসাধু উদ্দেশ্যের সন্ধান পায়। সব সময়েই পর্যবেক্ষণের প্রহরা—যেন ছায়ার মতো গড়িয়ে প'ড়ে ভেজানো দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায়; গোপন কথা শোনবার জন্যে প্রতীক্ষায় চঞ্চল। রহস্যের জাল ছিন্ন করবার জন্যে সদা উদ্‌গ্রীব। অন্তত জালের ফাঁক দিয়েও যদি সত্য ঘটনার একটুখানি দেখা যেত! কোথায় যেন অন্তর্হিত হ'য়ে গেল শিশু-মনের সরল বিশ্বাস আর সন্তুষ্টির নিবিড়তা। তা ছাড়া ওরা সর্বদাই ভাবছে, এই বুঝি নতুন রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে। অসতর্ক হ'লেই দেখবার সুযোগটা হারিয়ে ফেলবে ওরা। ছলনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে মেয়ে দুটিও ছলনার আশ্রয় নিতে লাগল। যখনই বাবা কিংবা মা কাছে আসছেন তখনই ওরা এমন ভান করছে যেন খেলাধুলো নিয়ে মত্ত হ'য়ে আছে। গুরুজনদের বিরোধিতা করতে গিয়ে একে অপরের কাছে আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠল। অসহায়তা ও অনভিজ্ঞতার প্রাবল্যে মেয়ে দুটি প্রায়ই অনুরাগচঞ্চল হ'য়ে ওঠে—উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। কখনো-কখনো বা অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। সংগত কোনো কারণ ছিল না, তবুও ওদের জীবন দুটো জড়িয়ে পড়ল একটা সংকটের আবর্তে।

ওরা মনে মনে স্থির করল যে, মিস মানকে আর কষ্ট দেবে না। কারণ তিনি নিজেই তো অসুস্থ। দু'জনেই ওরা অত্যধিক পরিশ্রমী হ'য়ে উঠল।

লেখাপড়ায় একে অপরকে সাহায্যও করতে লাগল। শান্ত এবং আচার-ব্যবহারেও ভদ্র হ'যে উঠল। মিস মান কিছু বলবার আগেই ওরা সব অনুমানে বুঝে নেবার চেষ্টার ত্রুটি রাখল না। কিন্তু তিনি তো এসব পরিবর্তন কিছু নজর করছেন না। এই কারণেই ওরা মনে মনে আঘাত পেল সবচেয়ে বেশি। সত্যিই, তিনি আর আগের মতন নেই। এদের কথা শুনে এমনভাবে চমকে ওঠেন তিনি, যেন হঠাৎ ঘুম ভাঙল তাঁর। মনে হয়, সুদূরের পথ থেকে দৃষ্টি তাঁর ফিরে এল বুঝি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি আনমনা হ'যে ব'সে থাকেন। মেয়েরা তখন পা টিপে টিপে চলাফেরা করে। তাঁকে কোনোরকমেই বিরক্ত করতে চায় না। কারণ, এরা তো ভেবে নিয়েছে, অনুপস্থিত বাচ্চাটির জন্যে মিস মানের মন পুড়ছে খুব। আগের চেয়ে অনেক বেশি তাঁর ভদ্র ব্যবহার। মিস মানের প্রতি ভালবাসার আর অন্ত নেই। যেন তাঁর মতো এরাও নারীত্বের নবচেতনায় উন্মুখ হ'যে উঠেছে। আগের কথা মনে পড়ল এদের। মেজাজ তার হাসিখুশি ছিল বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে একটু আধটু উদ্ধত স্বভাবের প্রমাণ পাওয়া যেত। এখন তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'যে থাকেন। বিবেচনাবুদ্ধিও তাঁর খুব। মেয়েরা ভাবল, এই পরিবর্তনের মূলে তাঁর গোপন দুঃখ ছাড়া আর কিছু নেই। তারা ওঁকে সত্যি সত্যি কাঁদতে দেখেনি বটে, কিন্তু চোখ দুটি তাঁর প্রায় সময়েই লাল হ'যে থাকে। সুতরাং এটা তো সাদা সত্যি কথা যে, মিস মান তাঁর নিজের দুঃখ কাউকে জানতে দিতে চান না, নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখছেন তিনি। তাঁকে কোনোরকমভাবে সাহায্য করতে পারছে না ব'লে মেয়ে দুটিরও আর কষ্টের সীমা নেই।

একদিন গৃহশিক্ষিকার কাণ্ড দেখে ছোট মেয়েটির সাহস বেড়ে গেল। চোখের জল মোছবার জন্যে তিনি জানালার ধারে স'রে গিয়েছিলেন। সে তাঁর হাত ধ'রে ফেলে বলল, "মিস মান আপনার খুব কষ্ট জানি। আমরা কি কোনো দোষ করেছি?"

মেয়েটির চুলে হাত বুলতে বুলতে স্নেহের স্বরে জবাব দিলেন তিনি, "না ভাই, তোমাদের একটুও দোষ নেই।" মেয়েটির কপালে চুমু খেলেন মিস মান।

এমনি ক'রে মেয়ে দুটি দিনের পর দিন সব-কিছুর ওপর সতর্ক দৃষ্টি ফেলে রাখল। একদিন একটি মেয়ে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ঢুকে পড়ল বসবার

ঘরে। বাবা আর মা তখন বসে বসে কথা বলছিলেন। ওকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে ফেললেন। কিন্তু দু-চারটে কথা যা সে শুনে ফেলেছিল তাতেই সে চিন্তিত হ'য়ে উঠল। মা বলছিলেন, "হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমারও চোখে পড়েছে। তাকে আমি জিজ্ঞেস করব।"

মাথায় টুপিটা প'রে ফেলল সে, তারপর দিদির কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল "কি নিয়ে এত হৈচৈ হচ্ছে বলতে পারিস?"

রাতে খাবার টেবিলে ব'সে ওরা লক্ষ্য করল, বাবা এবং মা দু'জনেই কি সাংঘাতিকভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গৃহশিক্ষিকাকে দেখছেন। দেখবার পরে তাঁরা নিজেদের মধ্যে আবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময়ও করছেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার পরে মিস মানকে মা বললেন, "তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। আমার ঘরে এক্ষুনি একবার আসবে কি?"

উত্তেজনায় মেয়ে দুটি কাঁপতে লাগল। কি জানি একটা ব্যাপার ঘটবে। লুকিয়ে লুকিয়ে অপরের কথা শোনার অভ্যাস তো ওদের এখন স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। এটাকে আর অপরাধ ব'লে ভাবে না ওরা। কি যে ওদের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে সেটাকে খুঁজে বার করবার উপায় চিন্তায় শুধু ওরা মগ্ন হ'য়ে আছে। মায়ের ঘরে মিস মান যক্ষুনি গিয়ে ঢুকলেন তক্ষুনি ওরাও এসে দাঁড়িয়ে পড়ল দরজার বাইরে।

কান পেতে ওরা শুনতে লাগল। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কথাবার্তার একটা ক্ষীণ আওয়াজ শুধু ভেসে আসছে। তবে কি শেষ পর্যন্ত আসল রহস্যের কিছুই জানা যাবে না? এই সময় হঠাৎ যেন মায়ের কথা স্পষ্ট শুনতে পেল ওরা। ক্রোধের স্বরে মা বলছিলেন, "তুমি কি ভেবেছ যে আমরা এত বেশি অন্ধ যে তোমার অবস্থাটা আমরা দেখতে পাব না? এই থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, গৃহশিক্ষিকার কর্তব্য সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা। ভাবতেও ভয় পাই যে তোমার হাতে মেয়েদের শিক্ষার ভার দিয়েছিলুম আমি। আমার আর সন্দেহ নেই যে, অত্যন্ত নির্লজ্জভাবেই তুমি তোমার কর্তব্যে অবহেলা করেছ।"

মনে হ'ল, এই অভিযোগের বিরুদ্ধে গৃহশিক্ষিকা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন। পারলেন না। উপরন্তু এমন নিচু স্বরে তিনি কথা বলতে লাগলেন যে, বাইরে থেকে কিছুই শুনতে পাওয়া গেল না।

মা বললেন, "শুধু কথা আর কথা! অসচ্চরিত্রাদের ছুতোর কোনো অভাব নেই। তোমার মতো স্ত্রীলোকই পারে পরিণামের কথা না ভেবে রাম-শ্যাম-যদুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে। ভগবান এর বিচার করবেন। তোমার মতো একটি বেহায়া মেয়ের গৃহশিক্ষিকার কাজ করা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কিন্তু তুমি কি এই ভেবে নিশ্চিন্ত হচ্ছ যে, এখানে তোমায় আমি আবারও বাস করতে দেব?"

বাইরে দাঁড়িয়ে দু'জনেই ভয়ে কাঁপতে লাগল। ওরা পুরোপুরিভাবে কিছুই বুঝতে পারল না বটে, কিন্তু এটুকু ওরা বুঝল যে, মায়ের কণ্ঠস্বরে আর একবিন্দু শিষ্টতা নেই—সবটাই ভয়ঙ্কর। মায়ের প্রশ্নের জবাবে মিস মান শুধু চোখের জল ফেলতে লাগলেন। তার কান্না শুনে নিজেদের চোখও বুঝি ভিজে এল। এবার মা ক্রোধোন্মত্ত হ'য়ে বলতে লাগলেন "নাকিকান্না ছাড়া আর তোমার করবার আছে কি! তোমার চোখের জল আমায় বিচলিত করতে পারবে না। তোমার মতো মেয়ের প্রতি আমার একবিন্দু সহানুভূতি নেই। তোমার ভবিষ্যতের কথা ভাবা আমার কাজ নয়। তুমি নিশ্চয়ই জানো কোথায় গেলে সাহায্য পেতে পারো। অবিশ্যি এও তোমার ব্যাপার, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাইনে। মোদ্দা কথা, এখানে তুমি আর একটা দিনও থাকতে পারবে না।"

এবারও শুধু চোখের জল ফেলা ছাড়া মিস মান অন্য কোনো জবাব দিলেন না। কাউকে এমনভাবে কোনোদিনও কাঁদতে দেখেনি ওরা। মেয়ে দুটি অনুভব করল যে এমন মর্মভেদী কান্না যিনি কাঁদতে পারেন তিনি বোধ হয় কখনো দোষ করতে পারেন না। কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত নিঃশব্দে অপেক্ষা ক'রে রইলেন মা। তারপর কঠিন স্বরে তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, "আমার আর কিছু বলবার নেই। আজকে দুপুরবেলার মধ্যেই জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও তোমার। কাল সকালে আমার কাছে এসে মাইনে নিয়ে যেও। এখন তুমি যেতে পারো।"

নিজেদের ঘরে পালিয়ে এল মেয়েরা। ব্যাপারটা কি? হঠাৎ এমন ঝড় উঠল কেন? এই বোধহয় প্রথম, ওদের মনের আয়নায় আসল সত্যের আঁচ লাগল। বাবা-মার বিরুদ্ধে ওদের বিদ্রোহী মনোভাবের প্রথম প্রকাশ এই।

বড় বোনটি বলল, "সত্যিই মায়ের ব্যবহার কি জঘন্য।"

মার বিরুদ্ধালোচনায় ভয় পেয়ে ছোটটি তোতলাতে লাগল, "কিন্তু… কিন্তু…মিস মান·যে কি করেছেন আমরা তো তা জানি না।"

"আমি জানি তিনি কোনো অন্যায় কাজ করতে পারেন না। অসম্ভব। আমাদের মতো ঘনিষ্ঠভাবে মা তাঁকে চিনতে পারেননি।"

"কি করুণভাবেই না তিনি কাঁদছিলেন! ভারী খারাপ লাগছিল আমার।"

"হ্যাঁ, সত্যিই ভয়াবহ। কিন্তু মা যেভাবে খেঁকিয়ে উঠলেন তাঁর দিকে, তাতে আমার যেন গায়ে জ্বর এসে গিয়েছিল।" বলতে বলতে চোখে জল এসে পড়ল ওর। রাগের ভারে মেঝেতে পা ঘষতে লাগল।

ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকলেন মিস মান। মাথার ওপর দিয়ে যেন তাঁর প্রবল একটা ঝড় ব'য়ে গিয়েছে। তিনি মেয়েদের উদ্দেশ ক'রে বললেন, "অ্যাখো, আজ বিকেলে আমার অনেক কাজ আছে। আশা করি তোমরা দুষ্টুমি করবে না? সন্ধেবেলাটা আমরা একসঙ্গে ব'সে গল্প করব।" ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মেয়ে দুটির বিপন্ন চোখের দিকে চেয়েও দেখলেন না একবার।

"দেখলি, চোখ দুটো কি ভীষণ লাল হ'য়ে উঠেছে? আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না মা কি ক'রে এত নিষ্ঠুর ব্যবহার করলেন।"

"আহা, বেচারী মিস মান!"

আবারও এই বিলাপের ভাষা চোখের জলে ভিজে উঠল। এমন সময় মা এসে জানতে চাইলেন, তাঁর সঙ্গে ওরা বেড়াতে বেরুবে কিনা।

"না মা, আজ আমরা বেড়াতে যাব না।"

প্রকৃতপক্ষে, মাকে ওঁরা ভয়ই পেত। মিস মানকে যে তিনি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন তেমন খবরটা কি ওদের দেওয়া উচিত ছিল না? দেননি ব'লে মায়ের ওপর রেগেও গেল খুব। একা-একা থাকতেই এখন ভালো লাগছে ওদের। খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মতো ঘরের মধ্যে ছটফট করছে। নৈঃশব্দ্য আর ছলনাপূর্ণ পরিবেশের চাপে দম আটকে আসছে। মিস মানের কাছে গিয়ে কি সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায় না, ব্যাপারটা কি? তাঁকে গিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, মা ভীষণ অন্যায় করেছেন। আমরা চাই, আপনি থাকুন। কিন্তু তাঁকে কষ্ট দিতেও মন চাইছিল না ওদের। তা

ছাড়া এ সম্বন্ধে কথা বলতে যাওয়াও তো লজ্জাব ব্যাপার। কারণ, ওরা যা শুনেছে তা কি সব আড়ি পেতে শোনেনি? বিকেলবেলাটা যেন আব কাটতে চায না। মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলছে। আবাব কখনো-কখনো আড়ি পেতে শোনা কথাগুলি নিজেদের মনে উল্টেপাল্টেও দেখছে। মনে পড়ছে মায়েব সেই ক্রোধোন্মত্ত নিষ্ঠুব কথা সব। মিস মানেব হতাশা-পূর্ণ কান্নাব আওয়াজও তো ভোলবাব নয।

সন্ধেবেলা তিনি এলেন ওদেব সঙ্গে দেখা কবতে। গল্প কবলেন না—শুধু বিদায নেবাব জন্যেই যেন এলেন। ঘব থেকে যখন বেবিযে যাচ্ছিলেন তিনি, তখন ওবা ব্যাকুল হ'যে উঠল খোলাখুলিভাবে কথা বলবাব জন্যে—নৈঃশব্দ্যেব ভাবী পাথরটা উল্টে ফেলবাব জন্যেও কি আকাঙ্ক্ষা ওদেব প্রবল হ'যে ওঠেনি? উঠেছিল। কিন্তু পাবল না। একটা কথাও মুখ দিযে বেবিযে এল না ওদেব। মেযে দুটিব রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষাব টানে যেন মিস মান দবজাব ওপাশে গিযেও ঘুবে দাঁড়ালেন। ওবা দেখল, হৃদযাবেগের উত্তাপে চোখ দুটো তাব জ্বলজ্বল কবছে। দু'জনকেই জড়িযে ধ'বে আদব কবলেন তিনি। চোখ ভেঙে জল গড়িযে পড়তে লাগল ওদের। আবাব ওদেব মুখে চুমু খেলেন মিস মান, তাবপব দ্রুত পাযে ওখান থেকে অন্তর্হিত হ'যে গেলেন। মেযেদেব আব বুঝতে বাকি বইল না যে, এটাই তাঁব বিদাযপর্বেব শেষ সম্ভাষণ।

ফুঁপিযে ফুঁপিযে কাঁদতে কাঁদতে একটি মেযে বলল, "তাঁব সঙ্গে আমাদের আব দেখা হবে না।"

"হ্যাঁ। কাল আমবা স্কুল থেকে ফিবে এসে দেখব, তিনি চ'লে গেছেন।"

"বোধহয় একদিন না একদিন দেখা হবেই। তখন তিনি তাঁব বাচ্চাটাকে দেখাবেন নিশ্চয়ই।"

"সত্যি, কি ভালোই না ছিলেন"

"আহা, বেচাবী মিস মান।"

কথাটা যেন ওদেরই ভাগ্যের পূর্বাভাষ।

"তাঁকে ছাড়া আমাদের চলবে কি ক'বে তাই শুধু ভাবছি।"

"উনি যদি চ'লে যান তাহ'লে নতুন কোনো গৃহশিক্ষিকাব কাছে আমি পড়ব না।"

"আমিও—কিছুতেই সহ্য করব না।"

"মিস মানের মতো এত ভালো আর কেউ হ'তেই পারে না। তা ছাড়া "

কথাটা শেষ করবার সাহস পেল না মেয়েটি। যখন সে প্রথম শুনতে পেয়েছে যে, মিস মানের একটি বাচ্চা আছে সেই সময় থেকে একটা সুপ্ত নারীত্ববোধ মনটাকে ছেয়ে ফেলেছে ওর। তার প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধার সূত্রপাত ওর এই কারণেই।

'এই শোন "

"কি?'

"আমার একটা নতুন মতলব মাথায় এসেছে। মিস মান চ'লে যাওয়ার আগে আমরা কি তার জন্যে ভালো কিছু একটা করতে পারি না? এমন কিছু একটা করতে চাই যা থেকে তিনি বুঝতে পারেন আমরা মায়ের মতো নই। সত্যিই আমরা তাকে ভালবাসি। তুই রাজী?'

'মন্দ কি।"

'তুই তো জানিস সাদা গোলাপ তিনি কত ভালবাসেন। কাল সকাল-বেলা স্কুলে যাওয়ার আগে চল্ না যাই বাজার থেকে কিছু ফুল কিনে এনে তার ঘরে রেখে দিয়ে আসি।"

'কিন্তু রাখবি কখন?'

'স্কুল থেকে ফিরে এসে।

'লাভ কি তার আগেই তো তিনি চলে যাবেন। শোন্ কাল খুব ভোরে চুপে চুপে আমি বেরিয়ে যাব। ফুল কিনে আনব আমি। তারপর আমরা যাব তার কাছে উপহারের ফুল নিয়ে।"

"বেশ তো—কাল সকালে আমরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ব।"

খুঁজে পেতে নিজেদের বাক্স হাতড়ে কিছু পয়সা সংগ্রহ করল ওরা। মিস মানকে যে ওরা কত ভালবাসে সেটা প্রমাণ করবার একটা সুযোগ পেল ভেবে হাসিতে খুশিতে ভ'রে উঠল মেয়ে দুটি।

খুব ভোরে হাতে ফুল নিয়ে ওরা এসে মিস মানের ঘরের দরজায় আওয়াজ করল। ভেতর থেকে জবাব এল না। তিনি বোধহয় এখনো ঘুমচ্ছেন

ভেবে ওরা ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখল। ঘরে কেউ নেই। এমনকি বিছানায় কেউ শুয়েছিল ব'লেও মনে হ'ল না। টেবিলের ওপর দু'খানা চিঠি প'ড়ে রয়েছে। আশ্চর্য বোধ করল মেয়ে দুটি। ব্যাপার কি ?

বড় বোন বলল, "আমি এক্ষুনি মায়ের কাছে চললুম।"

নির্ভয়ে এবং অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গিতে সে তার মায়ের পথ রুখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "মিস মান কোথায় ?"

"তাঁর ঘরে নিশ্চয়ই।"

"ওখানে কেউ নেই। তিনি ঘুমতেও যাননি। কাল রাত্রে নিশ্চয়ই বাড়ি ছেড়ে চ'লে গিয়েছেন। তুমি কেন আমাদের বলোনি সে কথা ?"

মেয়ের এই অভিযোগের সুর মা প্রথমে লক্ষ্যই করেননি। এখন তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি তাঁর স্বামীকে খুঁজতে লাগলেন।

স্বামী তখন মিস মানের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলেন। মা আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের দৃষ্টি সহ্য করতে পারছিলেন না। একটু বাদেই ওদের বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হাতে তাঁর দু'খানা খোলা চিঠি। তিনিও বিচলিত হ'য়ে উঠেছেন। তারপর বাবা আর মা নিজেদের ঘরে গিয়ে নিচু সুরে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। এইবার ওরা আড়ি পেতে কথাবার্তা শোনবার সাহস পেলে না। বাবা-মাকে এত বেশি বিচলিত হ'তে ওরা আগে কখনো দেখেনি।

ওরা দেখল, কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মা। জানবার আগ্রহে মাকে প্রশ্ন করতে চাইল, কিন্তু পারল না। তিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে আদেশ দিলেন, "তোরা স্কুলে যা. দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।"

ওদের চ'লে যেতেই হ'ল। স্কুলে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ ক'রে ব'সে রইল। লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারল না। তারপর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল। মনে হ'ল সবাই কি একটা আশঙ্কাজনক চিন্তায় ডুবে রয়েছে। এমনকি চাকরবাকরদের হাবভাব অদ্ভুত ঠেকছে। মা এগিয়ে এলেন ওদের কাছে। এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন তিনি যেন কথাগুলি সব আগে থেকেই মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছেন। গম্ভীর সুরে মা বললেন, "তোমরা আর মিস মানকে দেখতে পাবে না। তিনি—"

কথাটা শেষ হ'ল না। মেয়েদের ভাবভঙ্গি এত বেশি ভীতিকর হ'য়ে উঠল

যে, তিনি আর ওদের কাছে মিথ্যে কথা বলতে পারলেন না। নিজের ঘরে এসে আশ্রয় নিলেন।

সেইদিনই বিকেলবেলা অটোকে দেখতে পাওয়া গেল। তাকে ডেকে আনা হয়েছিল। কারণ, দু'খানা চিঠির মধ্যে একটা ছিল তার কাছে লেখা। ওকেও খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। কেউ ওর সঙ্গে কথা বলল না। সবাই ওকে এড়িয়ে চলতে লাগল। মেয়ে দুটি ঘরের এক কোনায় ব'সে ছিল। সান্ত্বনাতীত মনের অবস্থা ওদের। অটো এগিয়ে গেল তাদের দিকে।

"আমাদের কাছে এসো না তুমি।" ভয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠল মেয়ে দুটি।

পায়চারি ক'রে ঘুরে বেড়াল খানিকক্ষণ, তারপর অটোকে আর দেখতে পেল না কেউ। মেয়েদের সঙ্গে কেউ আর কথা বলছে না। ওরাও নির্বাক। উদ্দেশ্যহীনভাবে এ-ঘরে ও-ঘরে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। দু'জনের সঙ্গে যখন দেখা হ'য়ে যাচ্ছে তখন একে চেয়ে থাকছে অপরের অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে। এখন ওরা সবই বুঝতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, মেয়ে দুটি জানে সবাই ওদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সত্যিই, মানুষ কত নীচ। মা-বাবাকে আর ওরা ভালবাসে না—বিশ্বাসের মাটিও স'রে গেছে পায়ের তলা থেকে। কাউকেই আর কোনোদিনও বিশ্বাস করবে না ওরা। কচি দুটি মেয়ের ঘাড়ের ওপর যেন জীবনের বোঝাটা চেপে ব'সে গেল। ভাবনাহীন সুমধুর সুখের শৈশব প'ড়ে রইল পেছনে, এখন শুধু ভয়সংকুল ভবিষ্যতের জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকা। ঘটনার গুরুত্ব এখনো ওদের উপলব্ধির বাইরে—কিন্তু তার সম্ভাব্য ভয়াবহ ফলাফলের সঙ্গে মনে মনে সংগ্রাম করছে ওরা। নিঃসঙ্গ পরিবেশে দু'জনের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল। অথচ আদানপ্রদানের ভাষা রইল বোবা হ'য়ে। গুরুজনদের স্নেহের বন্ধন থেকে আলগা হ'য়ে গেল। কেউ আর এগিয়ে আসতে পারল না ওদের কাছে—হৃদয়ের প্রবেশপথে দিল প্রাচীর তুলে। কতদিনের জন্যে যে তুলল বলা মুশকিল। আশেপাশের সবার সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ ক'রে যাচ্ছে। এক বেলার সংক্ষিপ্ত পরিসর পার হ'য়ে আসতে ওদের বয়েস বাড়ল অনেক।

রাত্রিবেলা শোবার ঘরে একাই ছিল ওরা। নিঃসঙ্গতার ভীতি ছড়িয়ে পড়ল মনে। সদ্য-মৃতার আতঙ্ক নাছোড়বান্দার মতো পেয়ে বসল ওদের। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর সম্ভাবনায়। রাত্রে শীত পড়ল খুব।

চারদিকে এত বেশি অবাজকতা যে, চুন্নীব কথাটাও ভুলে গেল ওরা। একই শয্যায শুযে পডল দু'জনে। জডাজডিভাবে গাযেব সঙ্গে গা ঠেকিযে বাখল। সাহস পাচ্ছে আব সেই সঙ্গে উত্তাপও। এতক্ষণ পযন্ত অগ্রপশ্চাৎ ভাবতে পাবেনি। এবার ছোট বোনটিব রুদ্ধ আবেগ ভেঙে পডল—হুহু ক'বে কাঁদতে লাগল, স্বস্তি পেল যেন। বড বোনেবও সেই অবস্থা। আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'যে দু'জনেই কাঁদছে। মিস মানেব জন্যে আব ওদেব অনুতাপ নেই, পিতামাতাব স্নেহশূন্য সম্পর্কেব জন্যেও দুঃখ কববে না। ওদেব দুভাবনা শুধু এই অজ্ঞাত পৃথিবীব দুর্মব বাস্তবতায। কে জানে, এই নিষ্ঠুব বাস্তব সংঘটন ওদেব জীবনেও ঘটবে কিনা। এই তো প্রথম ওবা আজ বাস্তবেব সামনে মুখোমুখি হ'যে দাডাল। শুচি-স্নিগ্ধ সহাস্যলীলায ক্রমে ক্রমে গ ডে-ওঠা জীবন থেকে হঠাৎ যেন ওবা স্খলিত হ'যে পডল। এখন ভাবছে, জীবনটা বুঝি ঘন অরণ্যেব মতো ভযসংকুল—এই অবণ্যই ওদেব পাব হ'তে হবে। ধীবে ধীরে মনেব উদ্বেগ কল্পনায রূপান্তবিত হতে লাগল। কান্নাব বেগও এল ক'মে। শেষ পযন্ত সুস্থিবচিত্তে শান্তিব কোলে শুযে পডল ওবা।

ঘুমল।

রেচেলের অভিযোগ

[উপাখ্যান]

জেরুজালেমের অবিশ্বাসী ও স্বেচ্ছাচারী জনসাধারণ আবার ভুলে গেল ভগবানের নির্দেশ। আবার ওরা পেতলে-মোড়া প্রতিমার সামনে পশুবধের ক্রিয়াকর্মে মত্ত হ'য়ে উঠল। শুধু এই অধার্মিক অনুষ্ঠানই শেষ নয়। ভগবানের অনুগত ভৃত্য সলোমন যে মন্দিরটি তৈরি ক'রে রেখে গিয়েছিলেন সেখানে তারা বেল্‌-দেবতার একটি প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করল। পশুবলির রক্তে লাল হ'য়ে উঠল মন্দিরের অভ্যন্তর।

ভগবান দেখলেন এমন একটি পবিত্র স্থানে তাকে নিয়ে উপহাসের আর অন্ত নেই। ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন তিনি। তার গলার আওয়াজে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল। ভগবানের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। পাপে মগ্ন নগরটিকে ভেঙে-চুরে টুকরো-টুকরো ক'রে দেবেন। তুষের মতো উড়িয়ে দেবেন অধিবাসীদের। তাঁর গর্জন চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি তুলল। পৃথিবী জুড়ে সবাই জানল তার মনের এই ভয়ঙ্কর অভিলাষ।

সর্বশক্তিমানের ক্রোধ যখন একবার প্রকাশ পেয়েছে তখন আর রক্ষা নেই —ভয়ে কেঁপে উঠল পৃথিবী। নোয়ার আমলে যেমন হয়েছিল ঠিক সেই রকমই হ'ল। স্বর্গের জানালা সব খুলে গেল, বড় বড় ঝরনার গতি গেল এলোমেলো হ'য়ে, পাহাড়গুলো নড়তে লাগল ঠকঠক ক'রে। পাখির ঝাক সব আকাশ থেকে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ভগবানের রুদ্র মূর্তি দেখে এমনকি দেবদূতরাও ভয়ে অস্থির।

ধরাতলের এই দণ্ডপ্রাপ্ত নগরটির অধিবাসীরা ভগবানের গর্জন শুনতে পেল বটে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না। সমূলে উৎপাটিত করার দণ্ডাজ্ঞার কথা জানতে পারল না ওরা। পৃথিবীটা যে ভেঙে পড়ছে তা তো ওরা দেখতেই পাচ্ছিল। রৌদ্রদীপ্ত দুপুরের বুকে ঘনিয়ে এল মধ্যরাত্রির অন্ধকার। প্রচণ্ড ঝড় বইতে লাগল, ভেঙে পড়ল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সীডার গাছ, উড়ে যেতে লাগল খড়কুটোর মতো। মাথার ওপর বুঝি ছাদ ভেঙে পড়ে! ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল ওরা। বাইরে বেরিয়ে ভয় আরও বাড়ল। ঝড়ের ঝাপটায় অস্থির হ'য়ে উঠছে।

এত জোরে বৃষ্টি পড়ছে যে, গায়ে ওদের সূঁচ ফুটছে যেন। রাতের বাতাসে গন্ধকের ভেপসা গন্ধ।

নিজেদের কাপড়জামা ছিঁড়ে ফেলল সব, মুখে ছাই মাখল। নত হ'য়ে ভগবানের ক্ষমা প্রার্থনা করল—ব্যর্থ হ'ল সব। তাঁর ক্রোধের প্রচণ্ডতা কমল না, অন্ধকারের ব্যাপ্তি হ্রাস পেল না একটু।

ভগবানের ক্রোধ এমনভাবে পৃথিবীর ওপর ছড়িয়ে পড়ল যে, কবর থেকে বেরিয়ে এল মৃতের শোভাযাত্রা। চিরনিদ্রায় শুয়ে ছিলেন এঁরা, অপেক্ষা করছিলেন শেষ বিচারের দিনটির জন্যে। বিধিলিপির এই রকমই নির্দেশ ছিল। এরা ভাবলেন, শেষ বিচারের আদেশ এল বুঝি। উড়ে চললেন স্বর্গলোকের দিকে। বাত্যাবিক্ষুব্ধ মহাকাশের সীমা পেরিয়ে এসে দেখলেন, শেষ বিচারের দিন এখনও সমাগত নয়। ভগবানের চতুর্দিকে ভিড় করল পিতৃপুরুষদের বিমূর্ত আত্মা। বিদেহীরা প্রার্থনা জানালেন, তাদের সন্তানরা যেন সবংশে নির্মূল না হয়। পুণ্য নগরটি যেন রক্ষা পায় এবার। এদের মুখপাত্র হিসেবে প্রার্থনা করলেন এব্রাহাম, ইসায়াক আর যাকব। কিন্তু তাদের প্রার্থনার ভাষা শুনতে পাওয়া গেল না। সব-কিছু ছাপিয়ে ভগবানের কণ্ঠস্বর উঠে পড়ল উচ্চতর গ্রামে। তিনি বললেন যে, মানুষের অবাধ্যতা আজ সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। এদের ভালবাসলেন তিনি, কিন্তু অকৃতজ্ঞ জীব শিখল না কিছুই। এবার মন্দিরটাকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিয়ে এইসব দুষ্টপ্রকৃতির লোকদের সমুচিত শিক্ষা দেবেন ভগবান। তাঁরই মনোনীত প্রিয় মানুষের পূর্বপুরুষরা কথা শুনে হতভম্বের মতো নিবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। জীবিতকালে মুসা, স্যামুয়েল, ইলাইজা আর এলিসা ছিলেন ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ, প্রবক্তা। তাঁর পুণ্যবাণী প্রচারের যথাযোগ্য প্রতিনিধি। ভগবৎ-প্রেমে হৃদয় এঁদের প্রজ্বলিত ছিল। এবার এঁরা তিনজন ক্ষমা চেয়ে আবেদন জানালেন। কিন্তু কান দিলেন না তিনি—তাঁর ক্রোধের ঝড়ে কথাগুলো উড়তে লাগল যেন। আগের চেয়েও বিদ্যুতের তেজ বাড়ল অনেক। মন্দিরটা তাতে পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হ'ল।

প্রবক্তা এবং মহাজ্ঞানীরা হতাশ হ'য়ে পড়লেন। ঝড়ের মুখে ঝরা পাতার মতো ভয়ে কাঁপতে লাগলেন তাঁরা। ভগবানের সামনে কেউ আর কথা বলবার সাহস পেলেন না। কিন্তু একজন স্ত্রীলোকের অন্তরাত্মা কথা ব'লে

উঠল। নাম তাঁব বেচেল। ইস্রাইল দেশের পরমা মাতৃত্বের অধিকাবিণী ছিল সে। অন্যান্যের মতো সেও কবব থেকে ভগবানেব ওই ভযঙ্কর ঘোষণাটি শুনতে পেল। অবোধ সন্তানদেব জন্যে প্রাণ তাব কেঁদে উঠল। সেও এসে উপস্থিত হ'ল ভগবানেব কাছে। দেবদূতবা ছাডা ভগবানেব মুখ কেউ দেখতে পেতেন না। এই নিযমেব ব্যতিক্রম হবে শুধু শেষ বিচাবেব দিনে।

ভগবৎ-প্রেমে বেচেলেব অন্তব ছিল ভবপুব। সেই থেকে শক্তি সংগ্রহ কবল সে। তাবপব নতজানু হ'যে একটি নীতিগভ রূপক-কাহিনী বলতে লাগল

"হে সর্বশক্তিমান, আমাব অন্তবে কোনো ক্লেদ নেই, জলেব মতো স্বচ্ছ। সেইজন্যেই তোমায আমি সম্বোধন করবাব সাহস পাচ্ছি। কিন্তু আমাব হৃদযেব এই ভীরুতাও তো তোমাব কাছ থেকেই পাওযা, যে মুখ দিযে আমি সভযে প্রার্থনাব ভাষা প্রকাশ কবি সেই মুখও তুমিই দিযেছ। হে প্রভু, আমাব সন্তানবা আজ নিদারুণ সংকটেব মধ্যে নিপতিত হযেছে। এদেব বক্ষাব প্রযোজনে এই রূপক-কাহিনী বর্ণনাব শক্তি পাচ্ছি আজ। তুমি আমায না দিযেছ শযতানি বুদ্ধি, না দিযেছ প্রখব বিবেচনা-বোধ। তোমাব ক্রোধ উপশমেব উপাযও তো জানি না। কিন্তু তুমি জানো আমি কি বলতে চাই। কাবণ আমবা যা বলবাব অভিলাষ কবি তাব প্রত্যেকটা কথাই তো তোমাব মনে সৃষ্টি হয আগে। আমাদেব প্রত্যেকটা কাজ তাও তুমি আগে দেখতে পাও। আজ আমি ঐসব ভাগ্যহত অপবাধীদের জন্যে ক্ষমা চাইতে এসেছি। তুমি কি আমাব প্রার্থনা শুনবে না প্রভু।"

প্রার্থনা শেষ ক'রে বেচেল মাথা নিচু ক'রে অপেক্ষা করতে লাগল। ভগবান বেচেলেব মধ্যে শুধু ভক্তিপূর্ণ নম্রতাই লক্ষ্য কবলেন না, দেখলেন তাব গাল বেযে চোখেব জলও পডছে। ভগবানেব রোষাগ্নি প্রশমিত হ'যে এল, বেচেলেব সনির্বন্ধ মিনতি শোনবাব জন্যে চুপ ক'বে ব'সে বইলেন তিনি।

স্বর্গলোকে ব'সে ভগবান যখন নিঃশব্দে কথা শোনেন, ভূলোকেব স্থান তখন মহাশূন্যে রূপান্তবিত হ'য়ে যায, কালও স্থিব হ'যে দাঁডিয়ে থাকে এক জাযগায। হাওযাব গর্জন থেমে যায, বজ্রের অস্তিত্ব পায লোপ। বস্তুজগতের গতিবিধি অনড হ'যে থাকে, উডন্ত পাখি ডানা গুটিয়ে ফেলে,

নিশ্বাস ফেলতে কেউ সাহস পায় না। সময়ের গতি রুদ্ধ হ'য়ে থাকে। সুন্দর দেবশিশুরা মর্মরমূর্তির মতো স্তব্ধ হ'যে দাঁড়িয়ে পড়ে। এমনকি চন্দ্র, সূর্য এবং নক্ষত্র পর্যন্ত বিশ্রাম গ্রহণ করে—নদীর স্রোত থাকে অবরুদ্ধ হ'য়ে।

নিম্নের সেই বিধ্বস্ত নগরের কেউ রেচেলের সানুনয় প্রার্থনার কথা জানতে পারল না। ভগবান যে তাঁর কথা শুনছেন সেই খবরও কানে এল না ওদের। মরজগতের মানুষের পক্ষে স্বর্গলোকের খবর জানা সম্ভবও নয়। ওরা শুধু বুঝতে পারল, ঝড়ের প্রখরতা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু যখন ওরা করুণাময়ের প্রতি অনুগত চিত্তে আকাশের দিকে দৃষ্টি ফেলল তখন দেখতে পেল, কালো কালো মেঘের পুঞ্জ এমনভাবে জমাট বেঁধে রয়েছে যে, ওগুলো যেন শবাচ্ছাদিত আবরণের মতো। এই অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে ভয় কাটল না ওদের, বরং বেড়েই গেল। যেমন ক'রে আচ্ছাদন-বস্ত্র দিয়ে মৃতদেহকে ঢেকে দেওয়া হয় ঠিক তেমনিভাবে ধরাতলের অখণ্ড নিস্তব্ধতাও ক্রমে ক্রমে ছেয়ে ফেলল ওদের।

কিন্তু রেচেল খুশি হ'ল খুব। ভগবান তার আবেদনের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। সাহস বাড়ল তার। ওপর দিকে মাথা তুলে পুনরায় সে বলতে লাগল, "প্রভু, তুমি জানো যে আমি হারান নামে একটা জায়গায় বাস করতুম। আমার পিতার নাম ছিল লাবান। তার মেষগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল আমার ওপর। একদিন সকালবেলা আমরা কয়েকটি মেয়ে একসঙ্গে মিলে মেষগুলিকে জল খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলুম। গিয়ে দেখলাম যে, একটা মস্ত বড় পাথর দিয়ে ইঁদারার মুখটা বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছে। ওটা তুলে ফেলবার সামর্থ্য আমাদের ছিল না। মুশকিলেই প'ড়ে গিয়েছিলাম। এমন সময় কোথা থেকে একজন অপরিচিত যুবক এসে উপস্থিত হ'ল সেখানে। দেখতে খুব বলিষ্ঠ ব'লেই মনে হ'ল। অতি সহজেই পাথরটা তুলে ফেলল সে। আমরা অবাক হ'য়ে গেলাম। যুবকটির নাম যাকব। আমার পিতার ভগিনী রেবেকার পুত্র। সে যখন তার নিজের পরিচয় দিল তখন আমি তাকে আমার পিতা লাবানের কাছে নিয়ে গেলাম। দেখা হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে উঠলাম। রাত্রিতে আমি ঘুমতে পারলাম না। বলতে আমি লজ্জা পাচ্ছিনে যে, তুষের আগুনের মতো আমার সারা হৃদয় জুড়ে প্রেমের আগুন জ্বলতে লাগল।

"কেন লজ্জা পাব ? এ তো তোমারই ইচ্ছার প্রকাশ, প্রভু। তোমার ইচ্ছানুসারেই তো একটি যুবতী অন্য একটি যুবকের আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'তে চায়, একে অপরকে ভালবাসতেও চায়। এটা এত স্বাভাবিক ব্যাপার যে, তক্ষুনি পরিপূর্ণ মিলনের কথা না ভেবে শুধু বাগদত্তা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম আমি। তোমার তো অবিদিত নেই প্রভু যে, আমার পিতা কি রকম কঠিন হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। যে মাটিতে তিনি লাঙল চালাতেন সেই মাটির মতো কঠিন। বলদের শিং-এর চেয়েও শক্ত ছিল তাঁর মনের গঠন। যাকব যখন তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করল তখন তিনি প্রথমেই বিচার করতে বসলেন যে, তাঁর এই প্রণয়প্রার্থী ভাগ্নেটি কঠিন পরিশ্রমী কিনা এবং অপরিসীম ধৈর্যশীল কিনা। অর্থাৎ পিতার যা যা গুণ আছে সেসব গুণ যাকবেরও থাকা চাই। লাবান দাবি ক'রে বসলেন, তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে হ'লে বাবার কাছে যাকবকে আগে সাত বছর মজুর খাটতে হবে। ভয়ে অস্থির হ'য়ে উঠলুম আমি। যাকবেরও মুখ শুকিয়ে উঠল। আমাদের মতো দু'জন যুবক-যুবতীর পক্ষে সাত বছরের অপেক্ষা তো সোজা কথা নয়—মনে হ'ল সাতটা বছর অনন্তকালের শামিল। তোমার কাছে তো প্রভু, সাত বছরের মানে কিছু নেই, শুধু একটা মাত্র মুহূর্ত, যেন চোখের পাতা ন'ড়ে উঠল একটু। কারণ যিনি অনাদি ও অনন্ত তাঁর কাছে সময়ের পরিমাপ কিছু নেই। কিন্তু আমাদের মতো নশ্বর মানুষদের কাছে সাত বছর তো জীবনের এক দশমাংশ সময়। আমাদের পরমায়ু এত কম যে, ভগবৎ-প্রেম উপলব্ধি করতে না করতে জীবন যায় শেষ হ'য়ে। বসন্তকালের জলস্রোতের মতো জীবনের স্রোতও দ্রুতগামী। ধাবমান ঢেউগুলি তো আর ফিরে-আসে না। যাকবের সাহচর্যে বাস ক'রেও সাতটা বছর বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখা কম কথা নয়। সম্ভোগের নিবিড়তা ঠেকিয়ে রাখতে হবে। যাই হোক, যাকব তার মামার দাবি রক্ষা করতে রাজী হ'ল। আমিও পিতার নির্দেশ পালন করবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলুম, তার কারণ, আমরা দু'জন দু'জনকে ভালবাসি ব'লে।

"কিন্তু ধৈর্য ধরার কাজটা তো তুমি সহজ করোনি, প্রভু। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে তুমি সৃষ্টি করেছ দুরন্ত কামনা। আয়ুর সীমানা সীমাবদ্ধ

ব'লে তাদের মনের মাটিতে ছড়িয়ে দিয়েছ গভীর উৎকণ্ঠার বীজ। আমরা জানি বসন্ত শেষে শরৎ আসে এবং গ্রীষ্মের তপ্ত ঋতু যে দীর্ঘস্থায়ী হয় না তাও আমরা জানি। সেইজন্যেই আমরা নিত্যচঞ্চল আনন্দের মুহূর্তটিকে ভুল-ক্রমেও হাতছাড়া করি না, উপভোগ করি—উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকি বিলীয়মান আমোদপ্রমোদের ডালিটিকে ধ'রে রাখবার আকাঙ্ক্ষায়। প্রতিদিনই আমাদের বয়েস বাড়ছে, আমরা কি পারি স্থস্থিরচিত্তে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় নিবিষ্ট থাকতে? অবিশ্যি স্বীকার করছি ভেতরের জ্বলুনিতে পুড়ে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু উপায় কি, তোমার নির্দেশেই তো সময়ের আঘাত লেগে লেগে ক্ষ'য়ে যাচ্ছি আমরা। সত্যি ক'রে বলো তো প্রভু, মানুষ কি চঞ্চল না হ'য়ে পারে? ঘরের দরজায় সে মৃত্যুর ছায়া দেখতে পায় সর্বক্ষণ। তবুও তো প্রতিদিনের অপেক্ষা হাজার বছরের মতো বিলম্বিত মনে হ'লেও মানুষ তার অন্ধ আবেগ আর অসংযম আয়ত্তে আনতে পেরেছে।

"সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে মনে হ'ল, ব্যবধানটা যেন একদিনের চেয়ে বেশি নয়। প্রভু, আমরা যে এমনভাবে সময়টা কাটিয়ে দিতে পারলুম, তার কারণ আমাদের মধ্যে প্রেম ও প্রীতির বন্ধন ছিল অটুট।

"সপ্তম বৎসরটা যখন শেষ হ'য়ে এল তখন আমি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ছুটে গেলাম পিতা লাবানের কাছে। বিয়ের আয়োজন করবার জন্যে অনুরোধ করলাম। আমার উৎফুল্লতায় তিনি দেখলুম খুশি হলেন না। কেমন যেন উদাসীন। চোখের দৃষ্টিতে অনিশ্চয়তার কুয়াশা। খানিকক্ষণ নির্বাক হ'য়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আমার বোন লিয়াহ্-কে ডেকে আনবার জন্যে আদেশ দিলেন।

"হে প্রভু, তুমি তো জানো, লিয়াহ্ ছিল আমার চেয়ে দু' বছরের বড়। লিয়াহ্-কে কেউ পছন্দ করত না। কোনো যুবক ওকে কখনো কামনাও করেনি। সেইজন্যে লিয়াহ্-র মনে অনুশোচনার অন্ত ছিল না। আমি কিন্তু বোনকে খুব ভালবাসতুম। পিতা যখন লিয়াহ্-কে ডেকে আনতে বললেন তখন আমার সন্দেহ হ'ল যে, তিনি নিশ্চয়ই যাকব আর আমাকে প্রতারণা করবার পথ খুঁজছেন। লিয়াহ্-র সঙ্গে পিতা যখন কথা বলছিলেন তখন আমি ঘরের বাইরে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তার কথাবার্তা শুনতে লাগলুম। তিনি বলছিলেন: 'রেচেলকে বিয়ে করবার জন্যে যাকব তো

সাতটা বছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করল আমার কাছে। কিন্তু লিয়াহ্, তোর কথা ভেবে এই বিয়েতে আমি আমার সম্মতি দিতে পারছি না। এই দেশের নিয়মানুসারে বড় বোনের আগে ছোট বোনের বিয়ে হয় না। সৃষ্টির শুরুতে অবিশ্যি ঈশ্বরের আদেশ ছিল যে, মানুষ যেন পরিবার বৃদ্ধির কোনো ত্রুটি না রাখে। তাঁর নামের মহিমা কীর্তন করবার জন্যে পৃথিবীতে জন-সংখ্যার প্রয়োজন। তিনি চেয়েছিলেন ভূমি যেন অনুর্বর না থাকে, স্ত্রীলোকরা যেন বন্ধ্যা না হয়। তিনি বলেছেন যে, তাঁর পশুচারণভূমি থেকে মেষ কিংবা বকনা বাছুরেরও তৃণ ও লতাপাতা খাওয়ার অধিকার নেই যদি তারাও বন্ধ্যা থাকে। তাহ'লে আমি কি ক'রে আমার বড় মেয়েকে মাতৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখি? লিয়াহ্, তুই তৈরি হ'য়ে নে। বিয়ের চেলী প'রে ফেল। যাকব টেরও পাবে না, রেচেলের পরিবর্তে সে তোকেই বিয়ে ক'রে ফেলবে।'

"নিঃশব্দে লিয়াহ্ পিতার কথা সব শুনে গেল। কিন্তু ওঁদের প্রতি আমার আর রাগের সীমা ছিল না। হয়তো তুমি ভাববে কন্যা কিংবা ভগ্নীর কর্তব্য সম্পাদনে আমি উপযুক্ত নই। আমায় তাহ'লে তুমি ক্ষমা ক'রো, প্রভু। একবার ভেবে ছাখো তো কি অপরিসীম ধৈর্য সহকারে আমি আর যাকব সাতটা বছর অপেক্ষা ক'রে রয়েছি। এই দীর্ঘদিনের কর্তব্যনিষ্ঠার পরে পিতা এখন যাকবের ঘাড়ে লিয়াহ্-কে চাপিয়ে দিতে চাইছেন। আমার নিজের জীবনের চেয়ে যাকবের জীবন ছিল বেশি মূল্যবান। জেরুজালেমের অধিবাসীরা তোমার বিরুদ্ধে যেমন বিদ্রোহ করেছিল তেমনি আমিও আমার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম। তুমিই তো মানুষের মন এমনিভাবে তৈরি করেছ, প্রভু। যখনই সে অবিচারের দ্বারা লাঞ্ছিত হয় তখনই সে একগুঁয়ে হ'য়ে ওঠে। লুকিয়ে লুকিয়ে যাকবের সঙ্গে দেখা করলাম আমি। পিতার গোপন পরিকল্পনার কথাও বললাম তাকে। পিতার ষড়যন্ত্রটি ব্যর্থ করবার উপায় বার করলাম। যাকবকে বললাম, 'আমি তোমায় ইশারা করলে আমায় তুমি চিনতে পারবে। বিয়ে হ'য়ে যাওয়ার পরে নববধূ তোমার ঘরে প্রবেশ করবে। কিন্তু তার আগে সে তোমার কপালে তিনবার চুম্বন করবে। তখন তোমার বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, তোমার নববধূ আমি-ই, লিয়াহ্ নয়।' আমার ব্যবস্থাটা অনুমোদন করল যাকব।

"সেই রাত্রে লাবান নিজেই লিয়াহ্-কে বিয়ের চেলী পরিয়ে দিলেন। ঘোমটার আড়ালে লিয়াহ্-র মুখ এমনভাবে ঢেকেঢুকে দিলেন তিনি যেন যাকবের ঘরে প্রবেশ করবার আগে ওকে সে চিনতে না পারে। গোলাঘরে পিতা আমায় আবদ্ধ ক'রে রাখলেন। তিনি ভেবেছিলেন, চাকরবাকররা হয়তো বিয়ের খবরটা আমার কাছে পৌঁছে দিতে পারে। প্যাঁচার মতো অন্ধকার ঘরে ব'সে রইলুম আমি। ক্রোধে এবং বেদনায় হৃদয় আমার জ্ব'লে যেতে লাগল। তুমি তো জানো প্রভু, যাকবের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে ব'লে বোনের প্রতি রুষ্ট হ'য়ে উঠিনি আমি। যে-মানুষটি আমাকে পাওয়ার জন্য সাত-সাতটা বছর দাসত্ব করল, সেই প্রিয়জনকে প্রতারিত করা হচ্ছে ব'লে রাগ হ'ল আমার। যখন বিয়ের বাজনা বেজে উঠল নিজের হাত কামড়াতে লাগলুম। সিংহ যেমন শিকার ধরলে কামড়ে কামড়ে মাংস ছিঁড়ে নেয় আমিও তেমনি নিজেকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুললুম।

"এইভাবে বন্দিনী হ'য়ে সময় কাটাতে লাগলুম। কি ক্লান্তিকরই না মনে হচ্ছিল। তিক্ততায় সারা মন আমার বিষিয়ে উঠল। বাইরের অন্ধকার যখন আমার অন্তরের অন্ধকারের মতো ঘন হ'য়ে এল তখন কে যেন ধীরে ধীরে ওপাশ থেকে দরজা খুলে ভেতরে এসে প্রবেশ করল। হ্যাঁ, আমার বোন লিয়াহ্ বিয়ের আগে লুকিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তার পায়ের আওয়াজ আমি চিনতুম। ওকে শত্রু ভেবে নিয়ে উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখলুম। লিয়াহ্ আমার মাথায় সস্নেহে হাত বুলতে লাগল। সঙ্গে ক'রে একটা আয়না নিয়ে এসেছিল সে। ওর দিকে দৃষ্টি তুলতেই দেখতে পেলাম লিয়াহ্-র মুখের ওপর বিষাদের ছায়া। আমি সরল চিত্তে স্বীকার করছি প্রভু, ওকে দেখে আমার মনে এক বিদ্বেষপূর্ণ আনন্দের উদ্রেক হ'ল। আমি খুশি হলুম এই ভেবে যে, বিয়ের রাত্রে সেও অস্বস্তি বোধ করছে এবং কষ্টও পাচ্ছে। আহা, বেচারী লিয়াহ্ কিন্তু আমার এই বিদ্বেষপূর্ণ মনের খবর কিছু জানতে পারলে না। আমরা কি একই মাতৃবক্ষ থেকে দুগ্ধ পান করিনি? আমরা কি এতকাল দু'জন দু'জনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসিনি? নিশ্চিত বিশ্বাসে সে আমায় জড়িয়ে ধরল। তারপর ম্লান মুখে বলতে লাগল, 'বোন, এর পরিণতি কি হবে? বাবার এই ছলনাপূর্ণ ব্যাপার দেখে মর্মযাতনায় অস্থির হ'য়ে উঠেছি। তিনি তোমার প্রেমাস্পদকে ছিনিয়ে এনে আমাকে

উপহাব দিচ্ছেন। বেচেল, এই প্রতাবণাব কথা ভাবতেও আতঙ্কিত হ'যে উঠি। কি ক'বে আমি তোমাব বদলে কনে সেজে বসব? আমাব পা কাঁপবে। সত্যিই আমি ভয পাচ্ছি, বেচেল। যাকব নিশ্চযই এই জুযাচুবি ধ'বে ফেলবে। তাবপব সে যদি আমায তাব ঘব থেকে তাডিযে দেয তাহ'লে কলঙ্কেব আব সীমা থাকবে না। আমাব সন্তান এবং নাতি-নাতনিবা বিদ্রূপ কববে আমায। ওবা বলবে, "ঐ সেই লিযাহ্' তাব সেই গল্পটা তোবা জানিস? ফাঁকি দিযে স্বামীব ঘাডে চাপযে দেওযা হযেছিল তাঁকে। স্বামী যখন তা টেব পেলেন তখন তিনি তাকে ঘব থেকে বোগগ্রস্ত খেঁকিকুকুবেব মতো বাব ক'বে দিযেছিলেন।" আমি এখন কি কবব, বেচেল? বাবা যদিও নিষ্ঠুব প্রকৃতিব তবুও কি আমাব এমন ঝুকি নেওযা উচিত? না কি তাকে অমান্য কবব? আমি কি ক'বে এই জুযাচুবিটা বেশিদিন যাকবেব কাছ থেকে গোপন ক'বে বাখব? আমাব যদিও কোনো অপবাধ নেই, তবুও লজ্জা আমি ঢেকে বাখতে পাবব না। ভগবানেব নামে আমি অনুবোধ কবছি বোন, এই বিপদ থেকে আমায উদ্ধাব কব।'

"প্রভু এব পবেও আমাব বাগ কমল না। যদিও আমি আমাব দিদিকে ভালবাসতুম খুব, তবুও তাব এই উৎকণ্ঠাব মধ্যেও আমাব পাপী মন আনন্দেব উৎস খুঁজে পেল। যেহেতু সে তোমাব পুণ্যময নামোচ্চাবণ কবল এবং পবম করুণাময়েব নাম ক'বে আমায অনুবোধও কবল, সেই কাবণে তোমাব ঐকান্তিক করুণা ও চিবগুণসম্পন্ন প্রভাব আমাব অন্তবেব অন্ধকাব দূব ক'বে দিল সব। এমন অবশ্যম্ভাবী অলৌকিক ঘটনাব উৎসকতা তো তুমিই, প্রভু। যখনই আমবা প্রতিবেশীব দুঃখ এব লাঞ্ছনাব অংশ গ্রহণ কবি তখনই আমাদেব বিভেদ-বৈষম্যেব প্রতিবন্ধক সব ভেঙে পডে। লিযাহ্‌ব মনেব আশঙ্কা আমাকেও পেযে বসল। নিজেব ব্যক্তিগত দুঃখেব কথা ভুলে গিযে এখন আমি ওব বিপদেব কথা ভেবে চিন্তিত হ'যে পডলুম। ওব দুঃখেবও অংশ নিলুম আমি। তোমাব এই নির্বোধ পবিচাবিকাটি তখন (তুমি নিশ্চযই লক্ষ্য কবছ প্রভু, তোমাকে আমি প্রার্থনায স্মবণ কবি) তাব বোনেব অত্যন্ত প্রযোজনেব মুহূর্তে সমবেদনা প্রকাশ করল। আমি যেমন তোমাব সামনে এখন চোখেব জল ফেলছি, লিযাহ্-ও তেমনি তখন অশ্রু-ভাবাক্রান্ত হ'যে উঠেছিল। এখন আমি যেমন তোমাব করুণা ভিক্ষা

করছি, লিয়াহ্-ও আমার কাছে ঠিক তেমনিভাবে করুণা ভিক্ষা করেছিল। যাকবকে কি ক'রে প্রতারণা করতে হবে সেই কৌশলটি তখন আমি ওকে শিখিয়ে দিলুম। নিজে যা করব ব'লে স্থির করেছিলাম তাই-ই ওকে বললুম, 'যাকবের ঘরে প্রবেশ করবার আগে ওর কপালে তিনবার চুমু খেয়ে নিও।' পরমকরুণাময় তুমি, তোমাকে ভালবাসি ব'লেই তো ঈর্ষাকাতর মনটাকে জয় করতে পারলুম—আর নিজেরই প্রেমাস্পদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্রবৃত্ত হলুম।

"লিয়াহ্-কে যখন এই গোপন সংকেতের কথা খুলে বললাম, তখন সে আর নিজেকে সংবরণ করতে পারল না। নতজানু হ'য়ে ব'সে পড়ল মাটিতে, আমার হাত দুটো চেপে ধরল, আমার জামার ওপর মুখ রাখল সে। তুমি তো মানুষদের এমনি ক'রেই সৃষ্টি করেছ। যখনই তারা অপরের মধ্যে তোমার মঙ্গলহস্তের চিহ্ন দেখতে পায় তখন আর তাদের মনে বিরূপতা থাকে না—কৃতজ্ঞতা ও বিনয়বোধে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। আমরাও একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম, দু'জনের গাল পরস্পরের অশ্রুজলে সিক্ত হ'য়ে উঠল। লিয়াহ্ স্বস্তি অনুভব করল। এবং বধূ হওয়ার জন্যে তৈরি হ'ল। কিন্তু আমি দেখলাম, ওর মুখের ওপর আবার একবার বিষাদের ছায়া পড়ল, ঠোঁট দুটোও আবার বর্ণহীন ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। ধীরে ধীরে সে বলল, 'তোকে অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি, বোন। তোর দয়ার কোনো তুলনা নেই। তুই যা বললি তাই আমি করব। কিন্তু আমার সংকেত দেখেও যদি যাকব বিশ্বাস না করে? আমাকে বুদ্ধি দে, রেচেল। তোর নাম ধ'রে সে যদি আমায় ডাকে, কি করব আমি? বর যদি কনের সঙ্গে কথা কইতে চায় তাহ'লে কি আমি একগুঁয়ের মতো নীরব থাকতে পারি? অথচ যে মুহূর্তে আমি কথা কইতে যাব অমনি সে বুঝতে পারবে যাকে সে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করছে সে রেচেল নয়, লিয়াহ্। তোর কণ্ঠস্বরে তো আমার জবাব দেওয়া চলবে না। সর্বশক্তিমানের নাম ক'রে বলছি আমায় সাহায্য কর, বোন। তোর বুদ্ধি-বিবেচনা তো অনেক বেশি।'

"প্রভু, আবার যখন সে তোমার পবিত্র নামোল্লেখ ক'রে অনুরোধ করল, তোমার নামের মহিমায় আবার আমি অভিভূত হ'য়ে পড়লুম। হৃদয় গ'লে গেল আমার। নিজের বাসনা কামনা সব অকাতরে বিসর্জন দিলাম।

চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকারের জন্যে স্থিরকল্প হ'য়ে জবাব দিলাম, 'নিশ্চিন্ত থাকো, লিয়াহ্। যদি তেমন বিপদও আসে তাহ লেও উপায় আমি বাংলে দিচ্ছি। পরমকরুণাময়ের জন্যেই আমি আরও অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে রাজী আছি। আমি দেখব যে, যতক্ষণ পর্যন্ত যাকব তোমায় রেচেল ব'লে বিশ্বাস না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমায় সে লিয়াহ্ ব'লেও চিনতে পারবে না। এই তো আমার পরিকল্পনা। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে যাকবের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ব। গুটিসুটি মেরে অন্ধকারের মধ্যে বর-কনের বিছানার পাশে ব সে থাকব আমি। সে যখন কথা বলতে চাইবে তোমার সঙ্গে, জবাব দেব আমি। তাহ'লে ওর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আসবে না। আলিঙ্গনে তোমাকেই আবদ্ধ করবে যাকব। তারপর দেহসম্ভোগের মাধুর্যে মাতৃত্বের মহিমা অর্জন করবে তুমি। তোমার জন্য এমন কাজ করতে আমি রাজী আছি লিয়াহ্। ভেবে ছাখো তো, ছেলেবেলা থেকে আমরা দু জন দু জনকে কত ভালবাসতুম। তা ছাড়া পরমেশ্বরের জন্যে কি না করা যায়। ভবিষ্যতে যখন আমার সন্তানসন্ততিরা তার নাম ধ'রে ডাকবে তখন ওরা তার অপার করুণা থেকে বঞ্চিত হবে না।

"প্রভু, আমার কথা শুনে লিয়াহ্ আমায় আলিঙ্গন করল আদরও করল অনেক। যখন সে উঠে দাঁড়াল তখন আমি দেখলুম লিয়াহ্ যেন অন্য এক নতুন নারী। উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি পেল সে। ঘোমটা দিয়ে সতর্কভাবে মুখ ঢেকে চ লে গেল যাকবের কাছে—সমর্পণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। আমার দুঃখের পেয়ালা পূর্ণ হ'ল। আমি লুকিয়ে রইলাম বিছানার পাশে। এই শয্যাতেই আমার দিদির সঙ্গে মিলন হবে আমারই প্রেমাস্পদের। একটু পরেই বিয়ের বাজনা বেজে উঠল। ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। কনেকে আশীর্বাদ এবং গ্রহণ করবার আগে যাকব ইতস্ততঃ করতে লাগল। আমার সেই প্রতিশ্রুত সংকেতের জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। তখন লিয়াহ্ ওর কপালে তিনবার চুম্বন করল। যাকব এবার নিশ্চিত হ যে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে ওকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করল। তারপর আলগা ক'রে নিজের বাহুর ওপর তুলে নিয়ে শয়ন-কামরায় ঢুকে পড়ল সে। আমি বিছানার পেছনে জড়সড়ভাবে ব সে রইলাম। লিয়াহ্ যা ভেবেছিল ঠিক তাই হ ল। যাকব এখনো নিঃসন্দেহ হ'তে পারেনি। মিলনের পূর্বমুহূর্তে তাই সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল,

'আমি যাকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করলুম সে সত্যিই রেচেল তো?' প্রভু, তুমি তো সর্বজ্ঞ, তুমি জানো, জবাব দিতে আমার কি কষ্টই না হয়েছিল। তবুও আমি ওর হ'য়ে নিচু স্বরে বললুম, 'হ্যাঁ প্রিয়তম, আমি রেচেল।' আমার কণ্ঠস্বর চিনতে পারল যাকব। এই লোকটিই আমাকে পাওয়ার জন্যে সাতটা বছর অপব্যয় করেছে। তারপর যৌবনোচিত উদ্যমে লিয়াহ্‌কে গ্রহণ করল সে। তীক্ষ্ণ কাস্তের মুখে যেমনভাবে তৃণগুচ্ছ কাটা পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে সূচিভেদ্য অন্ধকারও অপসারিত হয় তোমার মানসচক্ষুর সামনে। প্রভু, তোমার তো অ-দেখা কিছু থাকে না। আমার সেই জড়সড়ভাবে যাকবের স্পর্শ-নৈকট্যে ব'সে থাকার দুর্বিষহ অবস্থাটা সেদিন দেখেছিলে তুমি। ওর আলিঙ্গন-লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার প্রবল। অথচ আমি বুঝতে পারলুম, আমার কথা মনে করেই যাকব লিয়াহ্‌-র সঙ্গে দেহলীলায় মত্ত হ'য়ে উঠল। তুমি তো সর্বত্র বিরাজমান প্রভু, একবার সেই স্মরণীয় রাত্রিটার কথা মনে করো। সাত ঘণ্টা আমি ওখানে ব'সে ছিলাম—মৃত্যু-যন্ত্রণায় জর্জরিত ঘণ্টাগুলি পার হ'য়ে যাচ্ছে আর অনুভব করছি, রতিবিলাসের গভীর ভাবাবেগে ওরা আত্মহারা হ'য়ে গেল। এমন মৃগ-মদ তো আমারই পান করার কথা ছিল। অথচ পেলুম না আমি কিছুই। সাতটা ঘণ্টা যেন সাতটা যুগ। বিছানার পাশে ব'সে কি প্রবলভাবেই না নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করতে লাগলুম। এই বুঝি কেঁদে ফেলি আমি। রুদ্ধ নিশ্বাসে ব'সে রইলাম আর দেখলাম, রতিসুখের সংগ্রামে যাকবও উত্তাল হ'য়ে উঠেছে। যাকবের সাত বছরের অপেক্ষার চেয়ে ঐ রাত্রির সাতটা ঘণ্টা আমার কাছে দীর্ঘতর মনে হয়েছিল। অন্তরের নিভৃতে সেদিনের সেই ধৈর্যধারণের রাতটিতে যদি তোমাকে আমি বারবার স্মরণ না করতাম তাহ'লে নিজেকে আমি সংবরণ করতে পারতাম না। তোমার অনন্ত ধৈর্যের কথা ভেবে আমারও সংগ্রাম-স্পৃহা সুদৃঢ় হ'য়ে উঠেছিল।

"এই তো আমার একমাত্র কীর্তি, প্রভু। যতদিন জীবজগতে বাস করেছি ততদিন এই কীর্তিটাকেই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম ব'লে ভেবে এসেছি। এমন কথাও মনে হয়েছে যে, সৃষ্টিকর্তার করুণা প্রকাশের এবং ধৈর্যধারণের ক্ষমতার চেয়ে আমার ক্ষমতাও কম নয়। আমার সন্দেহ হয় প্রভু, সেই রাত্রে আমার মতো একজন স্ত্রীলোকের বুকের ওপর যে মানসিক যন্ত্রণার বোঝা

তুমি চাপিয়ে দিয়েছিলে, তেমন আর অন্য কোনো স্ত্রীলোকের ওপর চাপিয়েছ কিনা। তবুও শেষ পর্যন্ত আমি ভেঙে পড়িনি, সহ্য করেছি। ভোরবেলা যখন মোরগ ডেকে উঠল, তখন আমি শ্রান্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। দেখলাম, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে আছে। দ্রুত পায়ে পিতার গৃহে এসে উপস্থিত হলাম। কারণ আমি জানি অনতিবিলম্বে গতরাত্রের প্রতারণা ধরা পড়বে। ভেবে ভয় পেলুম যে, যাকবের রাগের আর সীমা থাকবে না। সত্যিই, আমার ভয় সত্যে পরিণত হ'ল। নিরাপদে ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে যাকবের চিৎকার শুনতে পেলুম। ক্রোধোন্মত্ত ষাঁড়ের মতো চিৎকার-ধ্বনিতে ভোরের বাতাস মথিত ক'রে তুলল সে। উদ্যত কুঠার হাতে নিয়ে এদিক ওদিক আমার পিতা লাবানকে খুঁজতে লাগল। যাকবের রোষাগ্নিপূর্ণ মুখের দিকে চেয়ে তিনি ভয়ে প্রায় অবশ হ'য়ে গেলেন। মাটিতে ব'সে প'ড়ে তিনি তোমারই পুণ্য নাম ধ'রে ডাকতে লাগলেন। প্রভু তোমার কাছে পিতার এই আবেদন শুনে আমার নিস্তেজ সাহস আবার পুনরুজ্জীবিত হ'ল। প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠলাম আমি। অসুখী পিতাকে রক্ষা করতে হবে। আমার প্রেমিকের ক্রোধের উত্তাপ যেন সব আমার গায়েই পড়ে, এই ভেবে দু'জনের মাঝখানে সবেগে এসে উপস্থিত হলাম। রাগে ফেটে পড়ছিল যাকব। প্রতারণায় অংশ নিয়েছি আমি। আমার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে। তারপর হাত দিয়ে মুখে আমার আঘাত করল। আমি প'ড়ে গেলাম। প্রভু, তুমি তো জানো, বিনা প্রতিবাদে এই লাঞ্ছনা আমি সহ্য করেছিলাম। বুঝতে আমার অসুবিধে হ'ল না যে, ওর ভালবাসার গভীরতা এত বেশি ব'লেই ক্রোধের মাত্রাও ভয়ঙ্কর। যদি সে আমায় খুন ক'রে ফেলত—সত্যি কথা বলতে কি খুন করবার জন্যে কুঠার ওর উদ্যত হ'য়েও উঠেছিল, তাহ'লে তোমার কাছে এতটুকু অভিযোগও করতুম না।

"কিন্তু যখন সে দেখতে পেল বিক্ষত এবং রক্তাক্ত দেহে ওর পায়ের কাছে প'ড়ে রয়েছি তখন তার দয়া এল মনে। সহসা ওর মুঠো গেল আলগা হ'য়ে, কুঠারটা প'ড়ে গেল মাটিতে। উবু হ'য়ে ব'সে অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে আমার ঠোঁটের রক্তে মুখ ঠেকাল যাকব। আমার জন্যেই পিতা লাবানকেও সে ক্ষমা করল। শুধু তাই নয়, নিজের ঘর থেকে লিয়াহ্-কেও

তাড়িয়ে দিল না। এক সপ্তাহ পরে আমার পিতা দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে আমায় ওর হাতে সম্প্রদান করলেন। যাকবের সঙ্গে মিলন হ'ল আমার। সন্তানের জননী হলুম আমি। মাতৃবক্ষের দুধ খেয়ে তারা প্রতিপালিত হ'ল। তোমারই নির্দেশানুসারে আমি ওদের শিখিয়েছি যে, দুর্দিনের সময় ওরা যেন তোমাকেই শুধু স্মরণ করে; আর তোমার ঐ অনির্বচনীয় নামের মহিমার রহস্য-বোধে ধন্য হয়। প্রভু, আজকের এই দারুণ দুঃসময়ে তুমিও যাকবের মতো ক্রোধের কুঠারটি হাত থেকে ফেলে দাও—ক্রোধ তোমার প্রশমিত হোক, মেঘ কেটে যাক। রেচেল তো তার বোনের জন্যে কম করেনি। প্রভু, তুমিও কি রেচেলের সন্তানসন্ততিদের প্রতি দয়া দেখাতে পারো না? আমি যেমন ধৈর্য ধরেছিলাম, তুমিও কি তেমনি ধৈর্য ধ'রে পুণ্য নগরটিকে রক্ষা করতে পারো না? ওদের তুমি করুণা করো প্রভু, জেরুজালেমকে বাঁচাও।"

সারা স্বর্গলোক ছেয়ে রেচেলের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি তুলল। শক্তি ওর নিঃশেষ হ'যে গিয়েছে। শ্রান্ত হ'য়ে ব'সে পড়ল মাটিতে। অবিন্যস্ত চুলের রাশি কালো স্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়ল কম্পমান দেহের ওপর। এইভাবে রেচেল অপেক্ষা করতে লাগল ভগবানের জবাব শোনবার জন্যে।

কিন্তু ভগবানের কাছ থেকে জবাব এল না। তিনি নীরব রইলেন। নিস্তব্ধ হ'যে রইল স্বর্গলোক আর পৃথিবী। এদের মধ্যবর্তী ঘূর্ণায়মান অংশটাতেও আওয়াজ নেই। ভগবানের নিস্তব্ধতার চেয়ে ভীষণতর সংঘটন কিছু কল্পনাই করা যায় না। তিনি যখন স্তব্ধ হ'য়ে থাকেন তখন সময়ের গতি বন্ধ হ'য়ে যায়, আলোকের অস্তিত্ব মিশে যায় ঘনান্ধকারে, দিবসের আয়ু নিঃশেষিত হয় রাত্রির বুকে। সৃষ্টিপূর্বের বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে ভূ-লোক জুড়ে। জীবজগতের প্রাণশক্তি রুদ্ধ হ'য়ে থাকে, নদীর স্রোত যায় নিশ্চল হ'য়ে, ফুলের কুঁড়ি ফোটে না।—এমনকি ভগবানের আদেশ না পেলে জোয়ার-ভাটা পর্যন্ত বন্ধ হ'যে যায়। কোনো মানুষের পক্ষে ভগবানের নিস্তব্ধতা সহ্য করা অসম্ভব। এই দুর্বিষহ অচঞ্চল শূন্যতায় বিরাজ করেন শুধু ভগবান। যদিও তিনি দ্যুলোক-ভূলোকের জীবনবোধের প্রাণকেন্দ্র, তবুও তিনি যখন নিস্তব্ধ থাকেন তখন তাঁরও মৃত্যু ঘটে।

ধৈর্য ধরা সত্ত্বেও রেচেল আর এই অনন্ত নৈঃশব্দ্য সহ্য করতে পারছিল

না। আরও একবার সে অদৃশ্য শক্তির দিকে দৃষ্টি তুলে চেয়ে রইল। শান্ত হাত দুটি ওপর দিকে তুলল বটে, কিন্তু এবার তার ভাষায় প্রকাশ পেল প্রবল উষ্মা। সে বলতে লাগল, "সর্ব চরাচরে বিরাজ করো তুমি, আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছো না? সর্বজ্ঞ, আমার কথার অর্থ কি তুমি বুঝতে পারোনি? তোমার তৈরি খেলার পুতুলটি কি আরও সহজভাবে কথাগুলো প্রকাশ করবে? তাহ'লে শোনো, (যদিও তুমি বধির হ'য়ে আছো) আমি লিয়াহ্-র প্রতি ঈর্ষা পোষণ করতাম। কারণ আমার যা প্রাপ্য ছিল তা সব যাকবের কাছ থেকে পেল লিয়াহ্। ঠিক তোমার মতোই, প্রভু। আমার সন্তানরা অন্য দেবতার কাছে পশুবলি দিয়েছে ব'লে তুমি ঈর্ষাপরায়ণ হ'যে উঠেছ। আমার মতো একজন সামান্য স্ত্রীলোক ঈর্ষাকে জয় করতে পেরেছিল। তুমি করুণাময়, তোমার জন্যেই সম্ভব হয়েছিল তা। লিয়াহ্-র জন্যে আমি সমব্যথা অনুভব করেছি যাকব করেছে আমার জন্যে। সর্বশক্তিমান, তুমি মনে রেখো, আমরা যদিও সামান্য মানুষ মাত্র, তবুও ঈর্ষাকাতর অসৎ মানসিকতা দমন ক'রে রাখতে পারি আমরা। কিন্তু তুমি তো জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং আদি ও অন্ত—তোমার সৃষ্ট এই বিশাল জগৎ-সমুদ্রে আমরা তো কয়েকটি বুদ্বুদের মতো, অতএব তোমার মতো সর্বশক্তিমান কি এতটুকু করুণাও প্রকাশ করতে পারে না। আমি ভালো ক'রে জানি আমার সন্তানরা জেদী এবং অবোধ। একবার নয়, বারবার ওরা বিদ্রোহের নিশান উড়িয়েছে। কিন্তু তুমি ভগবান—প্রাচুর্যের অধিকর্তা তুমি। ওদের অবাধ্য মনোবৃত্তির জন্যে তোমার ধৈর্যশীলতা ভেঙে পড়বে কেন? ওদের পাপকর্ম কি তোমার ক্ষমার মহত্ত্বকে নিষ্ক্রিয় ক'রে দেবে? প্রভু, এমন তো হতে পারে না। তোমার দেবদূতদের সামনে তুমি অপমানিত হবে কেন? ওঁরা বলবেন, 'একদা রেচেল নামে একজন নশ্বর স্ত্রীলোক পৃথিবীতে বাস করত। সে তার ক্রোধাগ্নি দমন ক'রে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। অথচ, যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি পারলেন না তার ক্রোধের আগুন দমন করতে।' না, কিছুতেই তা হ'তে পারে না, প্রভু। অন্তহীন করুণাসিন্ধুর আধার তুমি। আর নিজেও যদি তুমি অনন্ত না হও তাহলে তো ভগবানও নও তুমি! তা না হ'লে আমি ভাবব, তুমি একজন 'অদ্ভুত দেবতা মাত্র'। শুধু রাগ, দ্বেষ এবং প্রতিশোধস্পৃহায় জর্জরিত একজন দেবতা তুমি। আমি, আমি রেচেল

এমন একজন ভগবানের শরণাপন্ন হয়েছিলাম যাঁর মধ্যে দেখেছি শুধু ভালবাসার মঙ্গলময় রূপ। আমি তাহ'লে তোমার দেবদূতদের সমক্ষে এ মিথ্যে-ভগবানকে পরিহার করছি। দেবদূতরা এবং তোমার বাণী প্রচারের মহাগুরুরা নিশ্চয়ই নিজেদের হৃতমান মনে করবেন। আমি এবার নির্ভয়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াচ্ছি এবং তোমাকে অমান্য করছি। প্রভু আমার সন্তানদের ওপর তোমার শাস্তির উদ্যত কুঠার নিপতিত হওয়ার আগে তোমায় আমি প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করছি। তোমার শাশ্বত বাণীর বিরুদ্ধাচরণ করছে তোমার প্রবৃত্তি। তোমার অন্তর যা চায়, তোমার আক্রোশপ্রসূত কার্যাবলীর মধ্যে তার বিপরীতটাই প্রকাশ পাচ্ছে। তুমি এবং তোমার শাশ্বত বাণীর মাঝখানে আছেন ভগবান। তিনি বিচারক। এই-ই যদি সত্য হয় যে, ভগবান ঈর্ষা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ, তাহ'লে এই মুহূর্তেই আমি ঝাঁপ দিচ্ছি পৃথিবীর ঐ অন্ধকারের মধ্যে। আমার সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হব আমি—ওদের নরকভোগের অংশ নিতে চাই। ক্রোধোন্মত্ত ভগবানের রূপ আমি ধ্যান করতে চাই না। ঈর্ষাপরায়ণ ভগবানের কথা চিন্তা করতে আমার ঘৃণা হয়। আর তুমি যদি ক্ষমাশীল প্রেমময় ভগবান হও, যাকে আমি এতকাল ভালবেসে এসেছি যাঁর প্রেরণায় আমি হাঁট'তে শিখেছি, তাহ'লে সেই রূপে তুমি আমার সামনে প্রকাশিত হও, প্রভু। দয়াপরবশ হ'য়ে আমার সন্তানদের রক্ষা করো। তোমার ক্ষমার আলোয় জেরুজালেমও রক্ষা পাক।"

ভগবানের বিরুদ্ধে কথাগুলো উৎসর্গ করার পরে রেচেল আবার শ্রান্ত হয়ে পড়ল। অপেক্ষা করতে লাগল সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে কোনো জবাব আসে কিনা। চোখের পাতা বুজে এল ওর।

রেচেলের আশেপাশে যেসব পিতৃপুরুষ আর মহাজ্ঞানীরা ছিলেন তাঁরা ভয় পেয়ে ওখান থেকে দূরে স'রে গেলেন। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। তাঁরা ভাবলেন যে, বিদ্যুতের আগুনে রেচেলের অসৎবুদ্ধি সব নিশ্চয়ই পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। যাবেই, কারণ ভগবানকে সে অভিযুক্ত করেছে। ভীত দৃষ্টিতে ওঁরা দৃষ্টি তুললেন ওপর দিকে। কিন্তু রেচেলের অনুরোধ রাখবার জন্যে যে ভগবান সাগ্রহে রাজী হবেন তার কোনো লক্ষণ এঁরা দেখতে পেলেন না।

ভগবানের রোষাক্রান্ত মুখ দেখে দেবদূতরা ভয়ে নিজেদের মুখ লুকিয়ে

রাখলেন। রেচেল ঈশ্বরের প্রভুত্ব অস্বীকার করেছে ভেবে তাঁরা সভয়ে একবার তার দিকে উঁকি দিতে গিয়েই দেখলেন যে, রেচেলের কপাল থেকে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মনে হ'ল যেন তার অন্তর থেকেই আলোটা ফুটে বেরুচ্ছে। ভোরের আলোয় শিশিরকণাগুলি যেমন উদ্ভাসিত হ'যে ওঠে ঠিক তেমনিভাবে অশ্রুবিন্দুগুলিও রেচেলের শুভ্র গণ্ডদ্বযের উপর জ্বলজ্বল করতে লাগল। ব্যাপারটা কি? দেবদূতরা এর নিগূঢ় অর্থের সন্ধান পেলেন। ভগবান এখন রেচেলকে দেখাচ্ছেন যে তাঁর নিজের মুখ আর অন্ধকারে আবৃত নেই, স্নেহ আর ভালবাসার গৌরবালোকে প্রজ্বলিত। এঁরা বুঝতে পারলেন যে, পরমেশ্বরের করুণাধারা আরো বেশি পরিমাণে রেচেলের ওপর বর্ষিত হচ্ছে—যদিও সে ঈষৎ পূর্বে ধৈর্য হারিয়ে ভগবানকে অস্বীকার করেছিল। তিনি তার মহাজ্ঞানী আর মহাপুরুষদের যত না ভালবাসেন তার চেয়ে বেশি ভালবাসলেন রেচেলকে। তার অবাধ্যতাই এর কারণ। মহাজ্ঞানীরা ক্রীতদাসসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। তার সেই রোষাক্রান্ত নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেননি। রেচেল করেছে।

দেবদূতদের ভয় দূর হ'যে গেল। এখন তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে ওপর দিকে চোখ তুললেন। তাঁরা দেখতে পেলেন, চিরজ্যোতিষ্মান ভগবানের রাজ্যে আবার শান্তির আলো ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর হাসির রং লেগে রঙীন হ'যে উঠল স্বর্গমর্তের অনন্ত শূন্যতা। ডানাওয়ালা স্বর্গের শিশুরা আবার চোখ খুলল, আনন্দের হাওয়ায় গা ভাসাল তারা। আকাশে বাতাসে সংগীতের সুর তুলল ওরা। দেবদূতরাও একসঙ্গে গাইতে লাগলেন এবার। যাঁরা কবর থেকে উঠে এসেছিলেন তাঁরাও এঁদের সঙ্গে সুর মেলালেন। ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন। যারা ভবিষ্যতের মানুষ, ভগবান যাদের এখনো সৃষ্টি করেননি, তেমন মানুষের সুরধ্বনিও এদের সঙ্গে মিলে-মিশে গেল।

কিন্তু মর্তভূমিতে যারা বাস করছিল তারা স্বর্গলোকের এইসব সংঘটনের কথা কিছু জানতে পারল না। তারা শুধু বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে অন্ধকারে আবৃত পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি ফেলে রেখেছিল। তারপর সহসা ওরা শুনতে পেল একটা মৃদু আওয়াজ, যেন প্রথম বসন্তের হাওয়া উঠল বুঝি। ওপর দিকে চেয়ে এরা বিস্মিত বোধ করল। জমাট-বাঁধা ঘন মেঘ সব টুকরো-টুকরো

হ'য়ে স'রে গিয়েছে। সারা আকাশ জুড়ে ফুটে বেরিয়েছে একটা সাতরঙা রামধনু।

এ তো ভগবৎ-মহিমার রূপালোকে তৈরি। শোকক্রন্দমানা জননী রেচেলের মুখ সেই রঙের স্পর্শে আলোকিত হ'য়ে উঠল।

শিকার

গত বছর গ্রীষ্মকালের একটা মাস আমি কাদেনাব্বিয়ায় কাটিয়েছিলুম। কোমো লেকের আশপাশের ছোট ছোট জায়গাগুলোর মধ্যে এটাও একটা। ঘন গাছের মাঝখানে গ্রামের সব সাদা রঙের বাড়িগুলিকে ভারী সুন্দরভাবে ছায়াচ্ছন্ন ক'রে রাখা হয়েছে। বসন্তকালেও জায়গাটি নির্জনতায় মগ্ন—যদিও সেই সময় লেকের তীরবর্তী সংকীর্ণ স্থানটি জনমুখর হ'য়ে ওঠে। বেল্লাজ্জিও এবং মেনাজ্জিও থেকে অনেকেই তখন বেড়াতে আসেন এখানে। তবুও বলব, আগস্ট মাসের গরমের ক'টা সপ্তাহে ওখানকার পরিবেশ সুমধুর রৌদ্রালোকিত নির্জনতায় ভরপুর হ'য়ে থাকে।

হোটেলটা তখন প্রায় খালি হ'য়ে এসেছিল। যে ক'জন দলভ্রষ্ট হ'য়ে সেখানে র'য়ে গেলেন তাঁরা দেখতুম প্রত্যেক দিনই সকালবেলা পরিহাসের দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে চেয়ে আছেন। শুধু তাই নয়, কেউ যে এমন একটা পরিত্যক্ত জায়গায় এখনো থাকতে পারেন তা দেখে এঁরা বিস্মিত বোধ করতেন। আমার অবিশ্যি বিস্মিত হওয়ার বিশেষ একটা কারণ ছিল। আমি দেখতুম, একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক তখনো হোটেলে বাস করছেন। পোশাক-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত এবং আচার-ব্যবহারেও তিনি বনেদীভাবাপন্ন---ইংরেজ কূটনীতিজ্ঞ আর প্যারীসের শহুরে বাবুর সংমিশ্রণ। নিজেকেই আমি নিজে প্রশ্ন করতুম: এই ভদ্রলোকটি কেন সমুদ্রতীরবর্তী কোনো স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়ে আশ্রয় নেননি? তা না ক'রে তিনি তন্ময়ভাবে নিজের সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে চেয়ে চেয়ে সময় কাটাতেন, আর কখনো কখনো একটা বইএর পাতাও ওল্টাতেন তিনি।

দিন দুই বৃষ্টি হ'ল। এই সময় আমাদের মধ্যে পরিচয় হ'য়ে গেল। সাধারণ পরিচয়টুকু এত বেশি আন্তরিক ক'রে তুললেন তিনি যে, অনতি-বিলম্বে আমাদের বয়েসের ব্যবধানটা আর রইল না—আমরা উভয়ে উভয়ের ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলুম। লিভোনিয়া তাঁর জন্মস্থান। লেখাপড়া শিখেছেন ইংল্যাণ্ড আর ফরাসী দেশে। কোনো নির্দিষ্ট পেশা কিংবা স্থায়ী বাসস্থান ব'লে তাঁর কিছু ছিল না। তিনি যেন একজন গৃহহীন পরিব্রাজক, কিংবা

জলদস্যু অথবা একজন অস্থিরচিত্ত ভ্রমণকারীর মতো ঘুরে বেড়াতেন, আর যেখানেই যেতেন সেখানেই সৌন্দর্যের উৎস খুঁজতেন তিনি। সব রকম শিল্প-কর্মের প্রতি তাঁর শৌখিন অনুরাগ ছিল, কিন্তু হাতেকলমে শিল্পচর্চার প্রতি উপেক্ষাও ছিল তাঁর। এ থেকে তিনি তৃপ্তি পেয়েছেন প্রচুর। যদিও নিজে তিনি সৃষ্টিপ্রয়াসী ছিলেন না। আরও একাধিক জীবনের মতো তাঁর জীবনটাও যেন অনাবশ্যক ছিল। কারণ তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সব নষ্ট হ'যে যাবে, এদের কোনো উত্তরাধিকারী থাকবে না।

একদিন সন্ধেবেলা তাঁর কাছে এই ধরনের কথাই পরোক্ষভাবে উল্লেখ করলুম। নৈশভোজের পর আমরা এসে বসলুম হোটেলের সামনে। দেখলাম ধীরে ধীরে হ্রদের বুকে অন্ধকারের ছাউনি পড়ল। একটু হেসে তিনি বললেন, "আপনার কথাই বোধহয় ঠিক। বিগতদিনের স্মৃতির প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই। অভিজ্ঞতা মানুষের একবারই হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পরিসমাপ্তিও ঘটে। কল্পিত বাস্তবই কি বাঁচে? যখনই হোক, বিশ, পঞ্চাশ, একশো বছর পরেও কি তা ধুয়ে মুছে যায় না? আপনাকে একটা ঘটনার কথা বলব। তা থেকে একটা ভালো গল্প তৈরি করা যেতে পারে। চলুন, একটু হেঁটে আসি। হাঁটতে হাঁটতে আমার কথা বলতে সুবিধে হয়।"

লেকের ধারের পথ ধ'রে আমরা হাঁটতে লাগলাম। রাস্তাটি ভারী সুন্দর। সাইপ্রিস আর বাদামগাছের তলা দিয়ে চ'লে গিয়েছে বরাবর। আমরা দেখতে পেলুম, লেকের জল রাত্রির হাওয়া লেগে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে।

তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, "নিজের একটা কবুল-জবাব দিয়েই গল্পটা আরম্ভ করি। গত বছর আগস্ট মাসে কাদেনাব্বিয়ার এই একই হোটেলে আমি বাস করছিলুম। আপনি নিশ্চয়ই আশ্চর্য হচ্ছেন কথাটা শুনে। কারণ আগেই আপনাকে বলেছিলাম যে, একই জায়গায় আমি দু'বার কখনও যাই না। কিন্তু আমার গল্পটা যখন শুনবেন আপনি তখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন কেন আমি এই নিয়মটা ভাঙতে বাধ্য হয়েছিলাম। এটা বলাই বাহুল্য যে, জায়গাটা এখনকার মতো সেই সময়েও জনবিরল ছিল। মিলানো শহরের লোকটিকে দেখতুম সারা দিন মাছ ধরতে। সত্যিই বড় অদ্ভুত ধরনের মানুষ! সারাদিন ধরে যেসব মাছ সে ধরত সেগুলোকে সন্ধেবেলা ছেড়ে দিত

লেকের জলে, পরের দিন আবার তাদেরই ধরবার জন্যে। দু'জন ইংরেজও এখানে ছিল। তাদের জীবনযাপন এত বেশি নিষ্ক্রিয় আর শান্তিপূর্ণ ছিল যে, অন্য কেউ ওদের উপস্থিতির কথা জানতেও পারত না। এ ছাড়া, সুশ্রী একজন তরুণের সঙ্গে একটি মেয়েও এসেছিল। দু'জনের সম্পর্কের মধ্যে অনুরাগের মাত্রা ছিল খুব বেশি, একটু যেন বাড়াবাড়ি। সেইজন্যেই আমার সন্দেহ হ'ত, ওদের সম্পর্কটা স্বামী-স্ত্রীর মতো নয়।

"এবার সেই উত্তর জার্মানীর পরিবারটির কথা বলছি। তাদের মধ্যে একটি মহিলাকে তো প্রৌঢ়াই বলা চলে। ছিপছিপে গড়ন, বিগতযৌবনা— একটু যেন জবুথবু ধরনের। তীক্ষ্ণ তার নীল চোখ। শুধু কি তাই? খিটখিটে মেজাজের মহিলাটিকে দেখলে মনে হয় মুখটা যেন তার ছুরি দিয়ে চেরা। সঙ্গের অপর মহিলাটি যে তার বোন সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলুম। কারণ, দু'জনার শারীরিক বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকমের, যদিও দ্বিতীয় মহিলাটির মধ্যে একটু নম্রভাব লক্ষণ ছিল। সব সময়েই দু'জনকে একসঙ্গে দেখা যেত। আর সব সময়েই তারা সেলাই-ফোঁড়াই নিয়ে ব্যস্ত। যেন ব'সে ব'সে ওরা মনের শূন্যতা সব সেলাই করে ফেললেন। অসংখ্য বন্ধনবিজড়িত ক্লান্তিকর পৃথিবীর এক জোড়া বোন—যেন নিষ্করুণ প্রৌঢ়তার নিদর্শন ওরা। তাদের সঙ্গে ষোল-সতেরো বছরের একটি তরুণীও ছিল। ওঁদের কারো একজনের মেয়ে হবে নিশ্চয়ই। পরিবারগত চারিত্রিক রুক্ষতা এর মধ্যে খুব কম। কারণ, তার নারীত্বের রেখাগুলি পূর্ণযৌবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তা যাই হোক, মেয়েটি যে সরল প্রকৃতির তাতে আর সন্দেহ নেই। তখনো সে ছিপছিপে, দেহলাবণ্য পরিপূর্ণতা পায়নি। সাজসজ্জায় যত্নের অভাব ছিল কিন্তু তবুও বলব, মুখখানা ছিল ওর নিবিড় কামনা-চিহ্নিত।

"চোখ দুটি বড় বড়, চাপা-আগুনের প্রকাশ তাতে সুস্পষ্ট। লাজুক স্বভাবের মেয়ে। কারো দিকেই সোজাসুজি চাইতে পারত না। মা-মাসির মতো সেও সেলাই-ফোঁড়াই করত সবক্ষণ। কখনো-কখনো কর্মচঞ্চল হাত দুটি মন্থর হ'য়ে আসত, আঙুলগুলো পড়ত ঝিমিয়ে। আবার কখনো বা স্তব্ধভাবে ব'সে স্বপ্নাবিষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত লেকের দিকে। ঠিক ঐসব মুহূর্তে ওর মধ্যে কি যে আমি দেখতে পেতুম বলতে পারব না। কিন্তু মেয়েটি

আমায আকর্ষণ কবত। এটা কি সাধাবণ ব্যাপাবেব চেযে বড কিছু ছিল? এমন হওযা কি সম্ভব নয যে একটি উদ্ভিন্নযৌবনাব পাশে নির্জীব মা-টিকে দেখতুম ব'লে আমাব দৃষ্টি সেদিকে আবদ্ধ হ'ল? এ যেন কাযাব পেছনে ছাযা। প্রশ্ন উঠত মনে, গালেব ফাঁকে কি ভাঁজ লুকনো, হাসিব পেছনে শ্রান্তি? কিংবা স্বপ্নেব মধ্যে প্রচ্ছন্ন হতাশা? তাব ভাবভঙ্গিতে পাওযাব আকাঙ্ক্ষা প্রবল, কিন্তু সে-আকাঙ্ক্ষা কি উদ্দেশ্যবিহীন ছিল? একটি তরুণীর জীবনে এই তো অত্যুত্তম সময—প্রলুব্ধ বিস্মযে সে চেযে থাকে পৃথিবীব দিকে, খোঁজে, কামনা কবে। কাবণ, যাব সঙ্গে ঘব বাঁধবে তাকে তখনো সে খুঁজে পাযনি। আমি ভাবতুম, তবে কি মেযেটি নষ্ট হ'যে যাচ্ছে, যেমনভাবে সমুদ্রশৈবাল ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডেব গাযে লেগে লেগে নষ্ট হ'যে যায? যে কাবণেই হোক, তাকে দেখে আমার মনে করুণাব উদ্রেক হ'ত। দেখতুম, কুকুব কিংবা বিড়ালকে সে আদব কবছে। অস্থিব চিত্তে একটাব পব একটা কাজ আবম্ভ কবছে বটে, কিন্তু শেষ কবছে না কোনোটাও। হোটেলেব লাইব্রেরিতে গিযে ধূলিধূসব বইগুলিকে কি আগ্রহেব সঙ্গেই না সে উল্টেপাল্টে দেখত। কিংবা ওব সঙ্গে যে দু-একটা কবিতাব বই থাকত তাবও পাতা ওল্টাত সে। কখনো কখনো গ্যেটে কিংবা বাউম্‌বাখেব কবিতা মনে মনে আউড়ে যেত সে। দৃশ্যগুলো কি মর্মস্পর্শী।" একটু থেমে ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা কবলেন, "আপনি হাসছেন যে?"

ক্ষমা চেযে আমি বললুম, "আপনি নিশ্চযই স্বীকাব কববেন যে, গ্যেটে আর বাউম্‌বাখকে পাশাপাশি দাঁড কবালে একটু অদ্ভুত ঠেকে।"

"অদ্ভুত? বোধহয আপনাব কথাই ঠিক। কিন্তু তবুও আমি বলব ব্যাপাবটা সত্যিই হাস্যকব নয। ঐ বযেসেব একটি মেযে পবোযা কবে না কবিতা ভালো কি মন্দ—কিংবা কবিতাব ভাব সত্য কি মিথ্যা তাও সে বিচাব ক'বে দেখে না। ছন্দোবদ্ধ কবিতাব ছত্রগুলি যেন এক একটা পাত্র, তেষ্টা মেটাবাব জন্যে কিছু একটু পেলেই হ'ল। পাত্রেব সুবা উৎকৃষ্ট কিনা তাতে তার যায আসে না। কাবণ, সুবা-পাত্রে মুখ লাগাবাব আগেই তো সে মত্তনেশায বুঁদ হ'যে আছে।

"এই মেয়েটিব অবস্থাও ঠিক এই বকমই ছিল। তাব আকাঙ্ক্ষাব পাত্র কানায়-কানায় পূর্ণ। দৃষ্টিভঙ্গিতে এর প্রমাণ পাওযা যেত। আকাঙ্ক্ষার

প্রাবল্যে ওর সন্ত্রস্ত আঙুলগুলো দেখতুম টেবিলের ওপর উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করছে। এর ফলে তার আচরণ অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকত বটে, কিন্তু অস্থিরতা আর ভীরু মনোভাবের সংমিশ্রণে ওর সৌন্দর্য যেন বেড়েই যেত। আমি বুঝতে পারতুম, কথা বলবার জন্যে ছটফট করছে। ভেতরের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু কথা কইবার মতো তার আশেপাশে কেউ তো ছিল না। শান্ত এবং সতর্ক প্রকৃতির দুজন প্রৌঢার মাঝখানে একা-একা ব'সে থাকত সে। ওর প্রতি সমবেদনায় মন আমার ভ'রে উঠত। কিন্তু আমিই বা কি করি, গায়ে পড়ে তো আলাপ করতে পারি না। আমার মতন একজন বয়স্ক লোকের মধ্যে তার কি-ই বা আকর্ষণ থাকতে পারে। তা ছাড়া, একটা গোটা পরিবারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় শুরু ক'রে দিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষ ক'রে ওই বয়েসের দুটি সংসারী ভদ্রমহিলার প্রতি আমার তো বিরুদ্ধ মনোভাব ছিলই।

"একটা অদ্ভুত ধরনের পাগলামি আমায় পেয়ে বসল। আমি ভাবলুম, 'এই অপরিণত এবং অনভিজ্ঞ মেয়েটি স্কুল থেকে বেরিয়েই সোজা চলে এসেছে ইতালি দেশে। এটা যে তার প্রথম পদার্পণ তাতে আর সন্দেহ নেই। জার্মানীর প্রত্যেকেই শেক্সপীয়ার পড়ে। (শেক্সপীয়ার অবিশ্যি কোনোদিনও এখানে আসেননি।) তবুও এটা তারই কৃতিত্ব বলতে হবে যে, তাঁর জন্যেই মেয়েটি ভাবছে ইতালি দেশ নিশ্চয়ই একটা অবাধ-প্রেমের জায়গা। ভাবছে, কত রোমিও-র সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে এখানে। কত দুঃসাহসিক অভিসার না জানি চলে এই দেশে। আমি নিঃসন্দেহ যে, মেয়েটি কল্পনা করেছিল, এখানে সে দেখতে পাবে হাতের পাখা মাটিতে ফেলে দিয়ে প্রেমিকা সংকেত করছে। উদ্যত ছোরা, মুখোশ আর প্রণয়লিপির দেশ বুঝি এটা। যুবতী মেয়ের কল্পনা কি আকাশচুম্বী নয়? সে কি স্বপ্ন দেখে না আকাশের ওই শুভ্র মেঘের স্রোতরেখাগুলো ভেসে চলেছে নীলের বুকে নিরুদ্দেশের পথে? যখন সন্ধ্যা নামে তখন কি লাল আর সোনালী রং ঝিকমিক ক'রে ওঠে না আকাশের গায়ে? কোনো কিছুই তার চোখে অবাস্তব কিংবা অসম্ভব ব'লে মনে হয় না।' স্থির করলুম, ওর জন্যে একটি প্রেমিকের সন্ধান ক'রে দেব আমি।

"সেই রাত্রেই একটা বড় চিঠি লিখলাম। চিঠিখানায় যে শুধু সহানুভূতির

কথা রইল তা নয়। ওতে রইল নম্রতা আর যথাযোগ্য মর্যাদার যথেষ্ট প্রমাণ। জার্মান ভাষাতেই লিখলুম বটে, কিন্তু রচনাশৈলীর মধ্যে বিদেশী ভাবের সংযোজন করলুম। চিঠিখানা বেনামী রইল। লেখক মেয়েটির কাছে চাইল না কিছুই, দেবার অঙ্গীকারও কিছু করল না। এই রকমের প্রেমপত্র উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায়। খুব বড় চিঠি নয়। তবুও বলব প্রগল্‌ভতার মধ্যেও সংযমের মুখশ্রী ফুটিয়ে তুলেছিলাম আমি। মেয়েটির মনে এত বেশি অস্থিরতা ছিল যে, খাবার ঘরে সবার আগে এসে উপস্থিত হ'ত সে। কিন্তু তার আগেই তো আমি সেদিন ওর টেবিলের ন্যাপকিনের তলায় চিঠিখানা রেখে দিয়েছিলাম।

"পরের দিন সকালবেলা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যেই বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। জানালার মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করলুম, মেয়েটি বিস্মিত হ'ল। যেন বিস্ময়ের মধ্যেও অবিশ্বাসের আভাস। কিন্তু আমার মনে হ'ল, বিস্ময়ের চেয়েও বড় কিছু একটা ঘটল। মেয়েটি চমকে উঠল। তার মলিন গাল দুটিতে সহসা রং লাগল বুঝি। ভীত সন্ত্রস্তভাবে মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে ঘরের চারদিকটা দেখল একবার। হাত দুটি তার কাঁপছিল। তারপর অলক্ষিতে চিঠিখানা লুকিয়ে ফেলল সে। খাবার টেবিলে সে আর সুস্থিরভাবে বসতে পারলে না। এক গ্রাস খাদ্যও তার মুখে উঠতে চায় না। কারণ, ওর একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল এখন কোনো একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে এই রহস্যাবৃত চিঠিখানা প'ড়ে ফেলা।—আপনি কিছু বললেন কি ?"

অনিচ্ছাকৃত অস্থিরতা প্রকাশ ক'রে ফেলেছিলাম। অতএব আমাকে বলতেই হ'ল, "আপনি একটা বড় রকমের ঝুঁকি নিয়ে ফেলছিলেন। আপনি কি আগে বুঝতে পারেননি যে, মেয়েটি খোঁজ নিতে পারে—হোটেলের চাকরবাকরদের জিজ্ঞেস করতে পারে তার ন্যাপকিনের তলায় চিঠিখানা কি ক'রে এল ? কিংবা তার মায়ের কাছেও তো সে চিঠিটা নিয়ে উপস্থিত করতে পারত ?"

"তেমন সম্ভাবনা যে ছিল না তা নয়। কিন্তু আপনি যদি মেয়েটিকে দেখতেন তাহ'লে বুঝতে পারতেন যে, উদ্বেগের সত্যিই কোনো কারণ ছিল না। মেয়েটি ভীতু প্রকৃতির। কেউ যদি উঁচু সুরে কথা কইত তাহ'লেও সে শঙ্কিত হ'য়ে উঠত। এমন ধরনের অনেক মেয়ে আছে যারা স্বভাবতই খুব

লাজুক। কেউ যদি ভদ্রতার সীমা অতিক্রমও করে তবুও তারা চুপ ক'রে থাকে। সহ্য ক'রে যাবে তবু অভিযোগ করবে না।

"আমার পরিকল্পনাটি সফল হচ্ছে দেখে আমি খুবই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলুম। মেয়েটি বাগান থেকে বেড়িয়ে এল। তাকে দেখে কপালের রগে আমার স্পন্দন উঠল। এ যেন এক নতুন মেয়ে। চলাফেরার ভঙ্গিতে স্ফূর্তির ঢেউ। নিজেকে নিয়ে কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। গাল দুটিতে উত্তেজনা, বিশৃঙ্খল, কিন্তু সুন্দর তার অপ্রতিভতা। সমস্তটা দিন এই রকমই চলল। এক-এক ক'রে প্রতিটি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে দেখছে, এবং হেঁয়ালির সূত্র খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছে। একবার সে আমার দিকেও দৃষ্টি ফেলেছিল। কিন্তু দৃষ্টি তার প্রতিহত হ'ল। আমি তো আগে থেকেই সতর্ক ছিলুম। ধরা দিলুম না। এমনকি চোখের পাতাটি পর্যন্ত নড়ল না আমার। সেই চঞ্চল মুহূর্তটির মধ্যে আমি অনুভব করলাম, মেয়েটির মনে গভীর অনুসন্ধানের আগ্নেয়গিরি জ্বলছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সত্যিই আমি আতঙ্কিত হ'য়ে উঠলাম। বহু বছর আগে আমি যা জানতে পেরেছিলাম সেই কথাটি মনে পড়ল আমার। আমি জানতুম, যে পুরুষ একটি মেয়ের জীবনে প্রথম প্রেমের স্বাদ সৃষ্টি করে তার কাছে এর চেয়ে বেশি মারাত্মক ও প্রলোভনসংকুল আনন্দ আর অন্য কিছুতে থাকে না।

"আমি লক্ষ্য করতাম, সেলাই নিয়ে ব্যস্ত দুটি প্রৌঢ়ার মাঝখানে গিয়ে মেয়েটি ব'সে পড়ল। মাঝে মাঝে হাতটি সে জামার একটি বিশেষ জায়গায় ফেলে রাখছে। আমি নিঃসন্দেহ যে, ঠিক ঐ জায়গাটিতেই সে চিঠিখানা লুকিয়ে রেখেছিল। খেলার কৌতুক বাড়তে লাগল। সেইদিন রাত্রে দ্বিতীয় চিঠি লিখলুম আমি। এবং তারপর প্রতি রাত্রেই তার কাছে একটি ক'রে চিঠি ছাড়তে লাগলাম। অতিমাত্রায় মত্ত হ'য়ে উঠলুম। চিঠির ভাষায় ঢেলে দিলাম প্রেমাবদ্ধ যুবকের অকুণ্ঠ অনুরাগ। কাল্পনিক হৃদয়াবেগের পাত্রটা দিলাম পূর্ণ ক'রে। আমি জানি, যে শিকারী খেলাচ্ছলেও ফাঁদ পাতে, তারও অনুরূপ অনুভূতি হয়। হরিণ-শিকারীর আমোদ পরিপূর্ণ হওয়া চাই। নিজের কৃতকার্যতায় নিজেই শঙ্কিত হ'য়ে উঠলাম। দ্বিধা-সংশয়ে দুলতে দুলতে ভাবলুম, এই আমোদের পরিসমাপ্তি ঘটুক। কিন্তু

পারলুম না। যে খেলাটি এমন সুন্দরভাবে শুরু হয়েছে তাকে চালু রাখবার লোভ আমার মধ্যে তখন প্রচণ্ড প্রবল।

"আমার মনে হ'ল, মেয়েটি যেন হাঁটতে হাঁটতে নেচে বেড়ায়। উদ্দীপ্ত সৌন্দর্য যেন তার অঙ্গসৌষ্ঠবকে ছেয়ে ফেলল। সকালের চিঠিখানা হাতে পাওয়ার জন্যে নিশ্চয়ই সারা রাত জেগে জেগে অপেক্ষা করে। চোখের তলায় কালি দেখলুম ওর। সাজসজ্জার প্রতি বেশি ক'রে মনোযোগ দিচ্ছে, চুলের ওপর ফুলের শোভা। দরদ-বাহুল্যে হাতের ছোঁয়া সিক্ত, যে জিনিসই দেখছে তার মধ্যেই অনুসন্ধানের উৎকণ্ঠা। কারণ, চিঠির মধ্যে এমন ইঙ্গিত করেছিলুম আমি যে পত্রলেখক ধারে-কাছেই আছে। বিদেহীর মতো আকাশে বাতাসে গানের সুর ভাসিয়ে দিচ্ছে সে। মেয়েটি যা কিছু করছে আড়াল থেকে সবই সে দেখতে পায়। ওর উচ্ছ্বাসের মাত্রা এত বেশি বেড়ে গেল যে, নিস্তেজ বৃদ্ধা দুটির চোখেও ধরা পড়ল তা। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তারা লক্ষ্য করতেন মেয়েটির উচ্ছলিত চলনভঙ্গি। তার যৌবনোচ্ছল গণ্ড দুটিও মা-মাসির দৃষ্টি এড়ায়নি। এরা দুজন নিজেদের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় করতে লাগলেন। মেয়েটির কণ্ঠস্বর মধুরতর হ'ল। শুধু কি তাই? আত্মবিশ্বাসে সেই কণ্ঠস্বর স্পষ্টতরও হ'ল। প্রায়ই মনে হ'ত মেয়েটি বুঝি বা উদ্দাম অস্থিরতায় পস্ফুটিত হ'য়ে একটি বিজয়া-সংগীতের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ার মহামুহূর্তটাতে এসে পৌঁছে গেছে, বুঝি বা—কিন্তু আপনি আবারও যেন বেশ আমোদ উপভোগ করছেন।"

"না, না—দয়া ক'রে গল্পটা আপনি বলুন। আমি ভাবছিলুম, কি সুন্দর-ভাবেই না আপনি গল্প বলতে পারেন। আপনার মধ্যে সত্যিকারের ক্ষমতা আছে। কোনো ঔপন্যাসিকই এই বর্ণনাকে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করতে পারত না।"

"মনে হচ্ছে আপনি ইঙ্গিত করছেন যে জার্মান ঔপন্যাসিকদের বিশেষ ঢঙ-যুক্ত লক্ষণীয় রীতিনীতিগুলি আমিও অনুসরণ করছি। অর্থাৎ তাদের মতো আমিও কবি-কল্পনায় উচ্ছ্বাসময়, ভাবপ্রবণ, পঙ্করুদ্ধ এবং ক্লান্তিদায়ক। আমার বর্ণনা এবার সংক্ষেপ করব। পুতুলটি নাচতে লাগল পেছন থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে সুতো টানতে লাগলুম আমি। আমাকে যেন সন্দেহ না করে (কারণ মাঝে মাঝে সে আমার ওপর সন্দেহজনক দৃষ্টি ফেলছিল) সেইজন্যে

চিঠিতে আমি লিখেছিলুম যে, পত্রলেখকটি সত্যি সত্যি কাদেনাব্বিয়ায় থাকে না। আশপাশের একটা স্বাস্থ্যনিবাস থেকে সে স্টিমারে ক'রে প্রতিদিনই এখানে এসে উপস্থিত হয়। তারপর থেকে যখনই স্টিমার পৌঁছবার ঘণ্টা বাজত তখনই সে মায়ের নজর এড়িয়ে কোনো-না-কোনো অজুহাত দেখিয়ে চ'লে আসত ঘাটের ধারে। সেতুর এক কিনারে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে যাত্রীদের দিকে চেয়ে থাকত সে।

"একদিন বিকেলবেলা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে এল। মেয়েটির দিকে দৃষ্টি রাখা ছাড়া আমার আর অন্য কাজ ছিল না। ঠিক এই সময়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। যেসব যাত্রী স্টিমার থেকে নেমে এল তাদের মধ্যে একজন সুদর্শন যুবককেও দেখতে পাওয়া গেল। পোশাক-পরিচ্ছদে বাহুল্য। অবিশ্যি ইতালি দেশের লোকেরা জামাকাপড়ে একটু শৌখিনও বটে। ঘাটের চারদিকটা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে মেয়েটির গভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির প্রতি নজর পড়ল তার। অজ্ঞাতসারেই বুঝি বা মেয়েটির ঠোঁটের কিনারে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল। গণ্ডদ্বয়ে লালের আভা। যুবকটি চলে যাচ্ছিল, এমন সময় তার দৃষ্টি এসে নিবদ্ধ হল মেয়েটির ওপর। এমত অবস্থায় সবাই যা করে যুবকটিও তাই করল। মেয়েটির আকুল চাহনিতে একটা অলিখিত অর্থের সন্ধান পেয়ে মৃদুভাবে হাসল এবং তারপর এগিয়ে এল তার দিকে। মেয়েটি ছুটতে লাগল। এক মুহূর্তের জন্যে আবার দাঁড়িয়েও পড়ল। ভাবতে লাগল, এই যুবকটি নিশ্চয়ই তার সেই বহু-প্রতীক্ষিত প্রেমিক। তারপর আবার সে দ্রুতগতিতে হাঁটতে লাগল—পেছন ফিরে আরও একবার যুবকটিকে দেখে নিল সে। এ যেন সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের পুরনো খেলা! একদিকে পাওয়ার কামনা, অন্যদিকে শঙ্কা—আকাঙ্ক্ষা প্রবল, অথচ কলঙ্কের ভয়ও আছে প্রচুর। অবিশ্যি এসব ক্ষেত্রে প্রেমেরই জয় হয়। অনুরূপ অবস্থায় উৎসাহিত বোধ করা স্বাভাবিক। অবাক হওয়া সত্ত্বেও যুবকটি তাই মেয়েটির পিছু-পিছু তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। মেয়েটিকে প্রায় ধরেই ফেলল সে। আতঙ্কিত হয়ে ভাবতে লাগলুম যে সৌধটি আমি গড়ে তুলেছিলুম সেটা বুঝি এবার ভেঙে পড়ে। এমন সময় মা আর মাসি এসে উপস্থিত হলেন সেই রাস্তায়। আকস্মিক ভয়-[illegible] মতো মেয়েটি গিয়ে তাঁদের কাছে আশ্রয় চাইল। ওখান [illegible] সরে এসে বিচক্ষণতার পরিচয় দিল যুবকটি।

কিন্তু স'রে আসবার আগে আবার দু'জনের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় হ'ল। দৃষ্টির মধ্যে ছিল সাগ্রহ আকুলতা। এ যেন আমার শিকারের খেলা শেষ করবার সংকেত-জ্ঞাপন। তবুও কি শেষ করতে পারলুম? খেলার প্রলোভন পেয়ে বসল আমায়। ঝুঁকি নিলুম আমি। সেই রাত্রেই আবার তাকে চিঠি লিখলুম। আগের চেয়েও বড় চিঠি। এমনভাবে লিখলুম যাতে তার সন্দেহটা দৃঢ়তর হয়। দুটি পুতুলকে নিয়ে খেলা করার অর্থ হচ্ছে, আমোদের মাত্রাটাও দ্বিগুণ হ'ল।

"পরের দিন সকালবেলা শঙ্কিত হ'য়ে উঠলুম। চতুর্দিকেই বিশৃঙ্খলা। মনোমুগ্ধকর অস্থিরতার পরিবর্তে অবোধ্য এক দুঃখের চিহ্ন দেখলুম যেন। চোখের জলে মেয়েটির দুটো চোখই বিবর্ণ। তার মধ্যে এমন এক ধরনের স্তব্ধতা বিরাজ করছে যে, মনে হয় বিরাট এক ক্রন্দনের পূর্বাভাস বুঝি। আমি আশা করেছিলাম, নিশ্চিত আনন্দের দোলায় সে বিহ্বল হ'য়ে উঠবে —কিন্তু এখন দেখলুম, ওর গোটা অস্তিত্বটাই নৈরাশ্যে নিমগ্ন। মনে মনে আমি দুঃখ বোধ করলুম। এই আমি প্রথম অনুভব করলাম তৃতীয় ব্যক্তির অনুপ্রবেশ। আমার ইচ্ছামতো সুতো টানলেও পুতুলটি আর নাচবে না। কোথায় যে ঠিক গণ্ডগোলটা ঘটল খুঁজে বার করবার জন্যে চেষ্টার আর ত্রুটি রাখিনি। কিন্তু চেষ্টা আমার ব্যর্থ হ'ল। পরিস্থিতির পরিবর্তনে আমার বিরক্তি আর দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। মেয়েটির মুখে প্রচ্ছন্ন অভিযোগের ভাষা দেখতে পেলুম আমি। এবং তার সাহচর্য পরিহারের উদ্দেশ্যেই সারা দিনটা বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ালুম। যখন ফিরে এলুম তখন অবিশ্যি ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে গিয়েছিল। ওঁদের খাবার টেবিলটা সাজানো নেই। হোটেল ত্যাগ ক'রে চ'লে গিয়েছেন ওরা। মেয়েটিও চ'লে গেল, তার প্রেমিকের সঙ্গে একটি কথাও সে ব'লে যেতে পারলে না। মা-মাসিকে বলবার সাহস হ'ল না যে, আর একটা দিন কিংবা আর একটা ঘণ্টার প্রতীক্ষা তার কাছে কত জরুরি ছিল। তাঁরা ওকে ওর রঙিন স্বপ্নের জগৎ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চ'লে গেলেন কোনো এক অতি তুচ্ছ ছোট্ট শহরে। আমার এই আমোদের খেলাটির যে এমনিভাবে পরিসমাপ্তি ঘটবে, আগে তা ভাবতে পারিনি। এখনো আমার চোখের সামনে মেয়েটির অভিযোগ-আকুলিত মুখটা ভেসে ওঠে। আমি দেখতে পাই সেই মুখটিতে ক্রোধ, হতাশা আর

ক্লেশের চিহ্ন। আজও আমি ভাবি, একটি তরুণীর জীবনে কত দুঃখই না সৃষ্টি করেছিলাম। হয়তো আরও অনেকগুলো বছর দুঃখের কালো মেঘ জীবনটাকে ঘিরে রাখবে ওর।"

গল্পটা শেষ করলেন ভদ্রলোক। শেষ করতে বেশ রাত হ'য়ে গেল। আমি দেখলুম, মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। খানিকটা দূর আমরা হাঁটতে হাঁটতে চ'লে এলুম। হঠাৎ একসময়ে ভদ্রলোকটি আবার ব'লে উঠলেন, "এই তো আমার কাহিনী। একজন ঔপন্যাসিকের কাছে এটা কি একটা গল্পের ভাল বিষয়বস্তু হ'তে পারে না?"

"অসম্ভব নয়। আমি অবিশ্যি গল্পটা সহজে ভুলব না। আপনি যা বললেন তার চেয়েও বড় জিনিস এর মধ্যে দেখতে পেয়েছি আমি। কিন্তু এ তো শুধু ভূমিকা, পুরো গল্প নয়। পথ চলতে একজনের সঙ্গে অপরের দেখা হ'য়ে গেল, অথচ ভাগ্যের সুতো একসঙ্গে পাক খেল না। একে আপনি ভূমিকা ছাড়া কি বলবেন? গল্পের একটা উপসংহার চাই তো।"

"আপনি যা বলতে চাইছেন বুঝতে পেরেছি। আপনি বোধহয় জানতে চাইছেন মেয়েটির কি হ'ল, বাড়ি ফিরে কি করল সে, তার দৈনন্দিন জীবনের দুঃখদায়ক—"

"না, এসব কথা আমি ভাবছি না। মেয়েটির সম্বন্ধে আমার আর কৌতূহল নেই। নিজেদের সম্বন্ধে যা-ই ভাবুক না কেন, ঐ বয়েসের মেয়েরা আমার কৌতূহল জাগাতে পারে না। কারণ ওদের অভিজ্ঞতা বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য—অতএব সবই প্রায় একই ধরনের। যে মেয়েটির ভূমিকা আপনি দিলেন, কালক্রমে তার একজন যোগ্য লোকের সঙ্গে বিয়েও হ'য়ে যাবে এবং তখন তার কাছে এই ঘটনাটি একটা উৎসাহ-উদ্দীপক অতীত চিত্র ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। সত্যিই বলছি, মেয়েটির কথা আমি ভাবছি না।"

"আপনি আমায় অবাক করলেন। যুবকটির মধ্যে কি দেখলেন আপনি, বুঝতে পারছি না। তার সেই এক-পলকের চাহনিগুলি তো চকমকির ঝলকের মতো—ঐ বয়েসে কার না জানা থাকে। আমরা অনেকেই তা নজর করি না। যারা তখন-তখন মনে রাখে তারাও পরে ভুলে যায়। হিমশীতল স্ফুলিঙ্গের কথা মনে রাখে কে? বৃদ্ধ বয়েসে না পৌঁছনো পর্যন্ত আমরা

জানতেই পারবি না যে, ঐসব স্ফুলিঙ্গগুলো জীবনের মহত্তম এবং গভীরতম সংঘটন—যৌবনের বিশেষ অধিকার-প্রাপ্ত মহামূল্য সনদ ওগুলো।"

"আমি কিন্তু যুবকটির কথাও ভাবছিলুম না।"

"তবে ?"

"যিনি চিঠি লিখতেন সেই বৃদ্ধ লোকটির গল্পটা আমি শেষ করতে চাই। আমার সন্দেহ হয়, কোনো লোক বৃদ্ধ বয়েসেও শুধু ছলনার উদ্দেশ্যে এমন রসঘন চিঠি লিখতে পারেন কিনা। লিখবেন অথচ সত্যিকারের হৃদয়ানুভূতির জ্বালা অনুভব করবেন না, তা কি হয় ? আমি আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করছি যে, খেলাটি শেষ পর্যন্ত কি রকম গুরুতর হ'য়ে উঠল। যিনি ভেবেছিলেন যে, তিনি শিকারের খেলা খেলছেন, কি ক'রে যে তিনি নিজের ফাঁদেই জড়িয়ে পড়লেন, সে-কথাও বলব আপনাকে। আমরা না হয় অনুমানই করলুম যে, বৃদ্ধ লোকটি নিঃস্বার্থভাবেই তার সৌন্দর্যের কথা কল্পনা করেছেন। কিন্তু তিনি যে মেয়েটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ এবং আবদ্ধ হ'য়ে পড়েছিলেন তা তো অস্বীকার করা যায় না। তারপর যখন তার হাত থেকে সব-কিছু ফসকে গেল, তখন সেই খেলা আর পুতুলটির জন্যে নিজের মনে তিনি উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে লাগলেন। অনুরূপ অবস্থায় বৃদ্ধের প্রেমানুরাগও অপরিণতবয়স্ক যুবকের প্রেমানুরাগের মতো হ'য়ে পড়তে বাধ্য। কারণ, উভয়েই তাদের অযোগ্যতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। সত্যিই তার ঐ প্রেমানুভূতির পরিবর্তনের ছবিটি যদি আঁকতে পারতুম, কি আনন্দই না হ'ত ! অশান্ত প্রেম আর ব্যর্থ আশার ক্লান্তি তার পক্ষে পীড়াদায়ক হবে। আমি তাঁকে অস্থিরচিত্ত ক'রে তুলতুম, মেয়েটির সঙ্গে আরও একবার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাকে আমি ওর পিছু-পিছু পাঠিয়েও দিতুম। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মেয়েটির সামনে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার সাহস তিনি হারিয়ে ফেলতেন। যেখানে খেলাটা আরম্ভ করেছিলেন সেখানেই আবার ফিরে আসবেন তিনি। তার সে পুনর্মিলনের দুরন্ত আশা নিয়েই আসবেন। ভাগ্যের অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে গিয়ে দেখবেন ভাগ্য কি নিষ্ঠুর। গল্পের পরিণতি এই রকমই করতুম আমি। এবং তাহ'লে ... ."

"মিথ্যে, সম্পূর্ণ মিথ্যে হ'ত তাহ'লে।"

চমকে উঠলাম আমি। ভদ্রলোকের কথাগুলো রূঢ় শোনাল, অথচ কণ্ঠস্বরে তার ভীরু কম্পন। মনে হ'ল তিনি যেন ধমকে উঠলেন। আগে

কখনো তাঁকে এমনভাবে মানসিক চাঞ্চল্যে বিচলিত হ'তে দেখিনি। তক্ষুনি আমি বুঝতে পারলুম অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়তে গিয়ে তাঁর সবচেয়ে বড় ক্ষত-স্থানটি স্পর্শ করেছি আমি। এত বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন যে, হাঁটতে হাঁটতে সহসা দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। পেছন ফিরে তার দিকে যখন চেয়ে দেখলুম তখন তাঁর শুভ্র কেশের নগ্ন সত্য কষ্ট দিল আমায়।

যা ব'লে ফেলেছি তার গুরুত্বটুকু হালকা করবার চেষ্টা করলুম বটে, কিন্তু তাতে কান দিলেন না। ততক্ষণে তিনি আত্মসংবরণ ক'রে ফেলেছিলেন। গম্ভীর, শান্ত অথচ বিষণ্ণ স্বরে তিনি আবার বলতে লাগলেন, "বোধহয় আপনার কথাই ঠিক। গল্পটার শেষ নিশ্চয়ই এইভাবেই হওয়া উচিত। 'বৃদ্ধ বয়েসের প্রেম অত্যন্ত ব্যয়বহুল।' যতদূর মনে পড়ে উক্তিটি বালজাকের। এটা তার একটা গল্পের নাম। গল্পটা খুব হৃদয়স্পর্শী। এমন একটা সুন্দর নাম দিয়ে আরও কত গল্প লেখা যায়। কিন্তু যাদের এই সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা আছে সেইসব বয়স্ক ব্যক্তিরা শুধু সাফল্যের কাহিনীই বলতে ভালবাসেন। ব্যর্থতার কথা গোপন ক'রে যান তারা। এরা মনে করেন ব্যর্থতাগুলো তাঁদের উপন্যাসের পাত্র ক'রে তুলবে। অথচ ব্যর্থতাগুলোও তো জীবনেরই অংশ। কাৎসানোভার আত্মস্মৃতির যেসব পরিচ্ছেদগুলো হারিয়ে গেল, আপনার কি মনে হয় তা দৈবঘটনা? দুঃসাহসিক কাৎসানোভার যখন বয়েস বাড়ছিল তখনকার পরিচ্ছেদগুলো কই? কিংবা, শিকারী যখন তার নিজের ফাঁদে পা দিয়েছেন তারও তো কোনো ইতিবৃত্ত নেই। হয়তো তিনি লিখতে চাননি। হয়তো হৃদয়ের ক্ষত তার একটা ছিল না ছিল একাধিক।"

কথা শেষ ক'রে বন্ধুটি হাত বাড়িয়ে দিলেন। তার কণ্ঠস্বরে আর একবিন্দু উন্মাদনা রইল না। তিনি বললেন, "এবার তাহ'লে চলি। আমি বুঝতে পারছি, গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় কোনো যুবকের কাছে এমন একটা গল্প বলা বিপজ্জনক। এই সময়টাতে অতি দ্রুত অবাস্তব কল্পনা আর অনাবশ্যক স্বপ্নের সৃষ্টি হয়। চললুম।"

বয়েসের ভারে চলার গতি মন্থর হয়েছে বটে, তবুও বলব জীবন্ত পদক্ষেপ ফেলতে ফেলতে তিনি চলে গেলেন অন্ধকারের দিকে। বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। এমন একটা গুমোট ধরনের [illegible] আমার নিজেরই শারীরিক শ্রান্তি আসা উচিত ছিল। [illegible] অস্বাভাবিক কিছু যখন ঘটে তখন তার আলোড়নে

অবসাদ আসতে পারে না। কিংবা অপরের অভিজ্ঞতা যখন মুহূর্তের জন্যে নিজের জীবনে সহানুভূতির স্রোতে প্রাণচঞ্চল হ'য়ে ওঠে তখন ক্লান্তি আসে না—অবসাদের অবগুণ্ঠন অপসারিত হয়। উদ্দেশ্যহীনভাবে আমি সেই নীরব নির্জন রাস্তাটি ধরে চলে এলুম ভিল্লা কারলোত্তা পর্যন্ত। প্রস্তরনির্মিত সিঁড়ির ধাপগুলি এখান থেকে সোজা নেমে গেছে লেকের কিনারা অবধি। ঠাণ্ডা শীতল সিঁড়ির ওপর ব'সে পড়লুম আমি। রাত্রের রূপ আজ সৌন্দর্যে-আলোয় সমুদ্ভাসিত। বেল্লাজ্জিও-র যেসব আলো আগে ভাবতুম জোনাকির মতো পাতার ফাঁকে ফাঁকে চোখের সামনে জ্বলছে, এখন মনে হচ্ছে, সেগুলো যেন হ্রদ পেরিয়ে কত দূরেই না চলে গেছে। নিস্তব্ধ হ্রদের ছোট্ট ছোট্ট ঢেউগুলি সব সিঁড়ির ওপর লুটিয়ে প'ড়ে খেলা করছে। ধনুকাকৃতি ঊর্ধ্বাকাশে আজ অনেক তারা, অনেক আলো। বিস্তৃতি এর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। মাঝে মাঝে উল্কাপাতও হচ্ছে। এ যেন ঐ মহাকাশের গা থেকে খ'সে-পড়া নক্ষত্রের মতো ছিটকে এসে তির্যগ্‌ভাবে তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের বুকে। হয়তো আরও দূরে, নিম্নদেশের ঘনান্ধকারে, পাহাড় পেরিয়ে উপত্যকার সাগ্রহ আলিঙ্গনে, কিংবা দূরস্থিত জলরাশির মধ্যে ডুবে যাচ্ছে সে। উল্কাটি স্ব-ইচ্ছায় ছিটকে আসেনি, তার পেছনে রয়েছে এক অন্ধ শক্তির তাড়না। আমাদের জীবনও ঠিক এমনিভাবে তাড়িত হয়ে, অপরিজ্ঞাত ভবিষ্যতের অন্তহীন গহ্বরে নিমজ্জিত হ'য়ে যায়।

বুখ্‌মেণ্ডেল

একটা দূরবর্তী জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে এইমাত্র আমি ভিয়েনায় ফিরে এলাম। স্টেশন থেকে বাড়ি ফেরবার মুখে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। পথের লোক সব আশপাশের গাড়িবারান্দা কিংবা ভেজানো-দরজার এদিক-ওদিকে আশ্রয় নিল। আমিও ভাবলুম, কোনো একটা জায়গায় আশ্রয় নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সৌভাগ্যের কথা যে, রাজধানীর প্রত্যেকটা রাস্তার ওপরই কাফের অভাব নেই। যেটা আমার সামনে প'ড়ে গেল সেখানে গিয়েই ঢুকে পড়লাম আমি। কিন্তু তার আগেই আমার টুপি আর জামাটা ভিজে গেল। পুরনো আমলের শহরতলি মতো জায়গা। শহরের কাফেগুলিতে যেমন গানবাজনা এবং নাচের ব্যবস্থা থাকে তেমন কোনো বন্দোবস্ত এখানে নেই। দোকানদার আর মজুররাই প্রধানত এখানে আসে কফি খেতে। দেখলুম, কফি খাওয়ার আগ্রহের চেয়ে এদের সংবাদপত্র পড়বার আগ্রহ অনেক বেশি। রাতই হ'য়ে গিয়েছিল। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরের হাওয়া ভারি। তা সত্ত্বেও, ভেতরটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং রুচিসম্মতভাবে সাজানোও বটে। নতুন সাটিন কাপড় দিয়ে সোফাগুলোর ওপর আবরণ দেওয়া হয়েছে। সদ্য-কেনা একটা ক্যাশ-রেজিস্টার যন্ত্রও আছে। সব মিলিয়ে জায়গাটি মন্দ নয়—পছন্দসই। ফেরবার মুখে তাড়া ছিল ব'লেই কাফেটার নাম পড়তে ভুলে গিয়েছিলাম। যাকগে—তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। এখানে ঢুকে একটু বিশ্রাম করছি, বন্দোবস্তও সব আরামদায়ক। মাঝে মাঝে শুধু জানালার কাচের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করছিলাম যে, বৃষ্টি ধ'রে এল কিনা। আমাকে তো উঠতেই হবে।

অলস ঔদাসীন্যে সময়টা কেটে যেতে লাগল। পরিবেশের মাদকতায় ডুবে গেলুম যেন। ভিয়েনার কাফেগুলোর বৈশিষ্ট্য ঠিক এই ধরনেরই—একবার ঢুকে পড়লে নিষ্ক্রিয়তার ছোঁয়াচ লাগে। আচ্ছন্নের মতো ব'সে থাকতে হয়।

ওখানে যারা ছিল তাদের প্রত্যেককে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলুম।

ঘরের আবছা এবং কৃত্রিম আলোয় এদের দৃষ্টি যেন ধুলিধূসর হ'য়ে উঠেছে। কোনো উদ্দেশ্য ছিল না তবু কাউণ্টারে যে যুবতী মেয়েটি ব'সে ছিল তার দিকে দৃষ্টি দিলাম আমি। যতবার ওয়েটার-রা আসছে ততবারই সে যন্ত্রের মতো প্রত্যেকটা কফির পেয়ালায় চিনি এবং একটা ক'রে চামচে দিচ্ছে। অন্যমনস্কভাবে মাঝে মাঝে দেয়ালের গায়ে লেখা আজেবাজে বিজ্ঞাপনগুলিও পড়ছিলাম। যাই হোক, এই নীরস পরিবেশের মধ্যেও কি যেন একটা আকর্ষণের টান আছে ব'লে মনে হ'ল আমার। সহসা অদ্ভুতভাবে আমার মনের এই জড়তা গেল কেটে। যেমনভাবে দাঁত-ব্যথা শুরু হয় ঠিক তেমনিভাবে আমার মনেও একটা অস্পষ্ট আন্দোলনের উপস্থিতি অনুভব করলাম। ব্যথা শুরু হয়েছে বুঝতে পারছি, অথচ ঠিক কোন জায়গা থেকে যে শুরু হ'ল ধরতে পারছিনে। মোটের ওপর একটা অস্পষ্ট মানসিক অস্থিরতা এবং চাপা উত্তেজনা যে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছিনে তাতে আর সন্দেহ নেই। তারপর আমি পুরোপুরিভাবে সচেতন হয়ে উঠলুম। কেন উঠলুম তার কারণটা আমার জানা ছিল না। বহু বছর আগে আমি নিশ্চয়ই এই কাফেতে একবার এসেছিলাম। অবচেতন মনের পাপ ক্রমশই উন্মোচিত হতে লাগল। এই ঘরের দেয়াল, টেবিল এবং চেয়ার ইত্যাদির কথা মনে পড়তে লাগল আমার। এমনকি ধূমে আবৃত ঘরটাও আর অপরিচিত মনে হচ্ছে না। বিস্মৃতপ্রায় অতীতের কথা মনে করবার যত বেশি চেষ্টা করছি ততই যেন সব কিছু ভুল হ'য়ে যাচ্ছে। চেতনার অন্ধকারে পূর্বস্মৃতি যেন সামুদ্রিক মৎস্যের মতো পিছলে যাচ্ছে, ধরতে পারা যাচ্ছে না। ঘরের প্রতিটি জিনিস আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম বটে, কিন্তু চেষ্টা আমার ব্যর্থ হ'ল। প্রথম যখন আমি এখানে এসেছিলাম তখন এদের ক্যাশ-রেজিস্টার যন্ত্রটি ছিল না—কাউণ্টারের ওপর যে মার্বেল মোড়া রয়েছে সেটাও দেখিনি। দেয়ালে যে কাঠের প্যানেল লাগানো হয়েছে সেটাও নতুন। এসব নিশ্চয়ই এই আমলের ব্যাপার। হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়ছে এখানে আমি বিশ বছর আগে একবার এসেছিলাম। এখানকার চার দেয়ালের মধ্যে নিজের অহং-অস্তিত্বকে ফেলে গিয়েছিলুম আমি। গত বিশ বছরে সেই অস্তিত্বটা মরল না, শুধু বেড়েই গেল। গাছের ডগায় পেরেক পোঁতার মতো আমিও আমার নিজের অহং-টাকে এখানে পুঁতে রেখে গিয়েছি।

ব্যর্থ চেষ্টায় সেই হারানো স্মৃতি খুঁজতে লাগলুম আমি। ঘরের মধ্যেই শুধু খুঁজলুম না, নিজের অন্তরেও অনুসন্ধান করলুম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, অনুসন্ধানের তল পেলুম না যেন।

নিজের অকৃতকার্যতায় অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠলাম আমি। তবুও হারানো সূত্রটা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমার স্মৃতি-শক্তির বিশেষত্ব ছিল। খারাপ এবং ভালো দুই-ই। কখনো-কখনো অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, আবার ফাঁকিও দিত আমায়। তাই ভাবলুম, কোনোরকম একটা সূত্র পেলেই হ'ল, রহস্যের সন্ধান পেতে অসুবিধে হবে না। হয়তো প্রয়োজনীয় ঘটনাসমূহ স্মৃতিপট থেকে ধুয়ে মুছে গেছে, চেষ্টা করলেও তাদের আর বিস্মরণের শূন্যতা থেকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। তবুও সামান্য একটা চিহ্ন থেকেও অনেক সময় পুরো অতীতটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, মনে প'ড়ে যায় ছোটখাট ঘটনাবলীও। ছবি সংবলিত একটা পোস্টকার্ড অথবা খামের ওপর লেখা একটা ঠিকানা কি বা পুরনো সংবাদপত্রের তুচ্ছ একটা কাটিং-এর সাহায্যে আকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটাকে ধ'রে ফেলা যায়। যেমনভাবে মৎস্যশিকারী তার বঁড়শিটিকে অনিচ্ছুক মাছের মুখে গলিয়ে দেয় এও যেন ঠিক তাই। স্মরণশক্তির খেলা অনেকটা কানামাছি খেলার মতো। বহু দিন পূর্বে হয়তো একটি লোককে আমি একবারই মাত্র দেখেছিলাম। তা সত্ত্বেও আজও আমি তার চেহারার বিশেষত্বগুলি মনে করতে পারি। তার মুখের আকৃতি শুধু নয়, ওপরের সারি থেকে যে একটা দাঁত তার ভেঙে গিয়েছিল এবং তার হাসির স্বরের কৃত্রিমতা পর্যন্ত ভুলিনি। যখন সে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠত তখন তার গোঁফের প্রান্ত প্রচণ্ডভাবে ন'ড়ে চ'ড়ে উঠত এবং সঙ্গে সঙ্গে যে তার মুখের ভাবভঙ্গি সব বদলে যেত তাও কি আমি ভুলে গিয়েছি? ভুলিনি কিছুই। এইসব শারীরিক বিশেষত্বগুলোই শুধু চোখের সামনে ভেসে ওঠে না, এমনকি আমাকে যা যা সে বলেছিল তার প্রত্যেকটা কথা এবং তৎসঙ্গে আমার জবাবের মর্মার্থ পর্যন্ত আমি আজও মনে করতে পারি। কিন্তু অতীতটাকে আমি যদি পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলতে চাই, তাহ'লে যোগাযোগের একটা নির্দিষ্ট সূত্র খুঁজে পাওয়া দরকার। অবাস্তব কল্পনায় কাজ হবে না কিছুই।

চোখ বুজে গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে গেলাম। বঁড়শিটাকে খেলাতে

লাগলাম, মাছটা যদি ধরা পড়ে। কিন্তু চেষ্টা আমার ব্যর্থ হ'য়ে গেল। বঁড়শি নেই, কিংবা বঁড়শিটা গিলতে চাইছে না সে। রাগে আমার কপালের রগ ফুলে উঠল। ইচ্ছে হ'ল, নিজের গায়ে নিজেই আঘাত করি। চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারলুম না। গরম মেজাজে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম, যেন শিকারের সন্ধান করছি আমি। এবার সত্যি সত্যি পশ্চাৎ-স্মৃতি ফিরে আসতে লাগল। মনে পড়ল ক্যাশ-রেজিস্টার যন্ত্রটির ডান পাশে নিশ্চয়ই একটা দরজা আছে। সেই দরজা দিয়ে একটা ঘরে গিয়ে পৌঁছনো যেত। ঘরটিতে একটাও জানালা ছিল না তখন। বাইরের আলো সেখানে প্রবেশ করা অসম্ভব ছিল। হ্যাঁ, এই ধরনের একটা ঘর সত্যিই ওখানে ছিল। এখন যেরকমভাবে সাজানো-গুছনো রয়েছে তখন ঠিক সেরকমটি ছিল না। দেখতে বাক্সের মতো চৌকো, তাস খেলার ঘর ছিল। আর ছিল ঐ মদ্যপানের জায়গাটার পেছন দিকে। আসবাবগুলো দেখতে দেখতে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠলুম আমি। এবার ধীরে ধীরে সব কথা মনে পড়ছে। হ্যাঁ, ঐ তো ওখানে দুটো ছোট সাইজের বিলিয়ার্ড-টেবিল ছিল, দেখতে অনেকটা শেওলায়-ঢাকা ডোবার মতো। ঘরের কোনায় কোনায় তাস খেলবার টেবিল পাতা থাকত। একটা টেবিলে এখন তো দু'জন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক ব'সে ব'সে দাবা খেলছেন। দেখলে মনে হয় শিক্ষকদের মতো চেহারা। যেখানে উনোনটা রয়েছে তার পাশেই দরজার গায়ে লেখা আছে, "টেলিফোন"। কিন্তু আগে এখানেও একটা ছোট্ট টেবিল ছিল। চকিতের মধ্যে মনে প'ড়ে গেল সব। ওটা ছিল মেণ্ডেলের জায়গা—যাকোব মেণ্ডেল। হ্যাঁ, বুখ্‌মেণ্ডেল ওখানেই বসত।

তাহ'লে আমি কাফে গ্লুক-এ এসে উঠেছি। যাকোব মেণ্ডেলকে ভুলে গেলুম কি ক'রে। অদ্ভুত ধরনের মানুষ ছিল, যেন ঠাকুরমার ঝুলির গল্প-জগতে বাস করত সে। তাকে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়েও তার প্রসিদ্ধি ছিল প্রচুর। স্বল্পসংখ্যক গুণগ্রাহীদের কাছে তার জনপ্রিয়তার অন্ত ছিল না। বই পড়তে ভীষণ ভালবাসত। ঐখানে ব'সে বই-এর মধ্যে ডুবে থাকত সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। কাফে গ্লুক-এর গৌরব ছিল সে। দীর্ঘদিন ধ'রে এমন মানুষটির কথা একবারও ভাবিনি ব'লেই কি সব ভুলে গিয়েছিলাম? সত্যিই ভুললুম কি ক'রে?

কল্পনা করতে লাগলুম। মেণ্ডেলের মুখ আর দেহটা ছবির মতো স্পষ্ট-ভাবে ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। রক্তমাংসের লোকটিকে সত্যি সত্যিই যেন দেখছি। ছাই রঙের মার্বেল পাথরের টেবিলটার সামনে এসে বসল। টেবিলের ওপর প'ড়ে আছে স্তূপীকৃত বই আর পাণ্ডুলিপি। চোখে চশমা পরা—নিশ্চলভাবে ব'সে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রাখল বই-এর পাতায়। ঠিক যে নিশ্চলভাবে ব'সে রইল তা নয়। একটা অদ্ভুত ধরনের অভ্যাস ছিল তার। পড়বার সময় চকচকে টেকো মাথাটি সে সামনে-পেছনে দোলাত আর নিজের মনে গুনগুন ক'রে গানও করত। সে ছিল ইহুদী। মাথা দুলিয়ে পড়বার অভ্যাসটা সে ইহুদীদের ইস্কুল থেকেই শিখে এসেছিল। নীতিকথা শিক্ষার সময় ইহুদী ছেলেরা ঠিক এইভাবেই মাথা দোলায় আর সুর ক'রে পড়ে। ধর্মযাজকদের বিশ্বাস যে, বাচ্চাদের যেমন দোলনায় শুইয়ে গান ক'রে ক'রে ঘুম পাড়ানো হয়, ঠিক সেইভাবে ছন্দমধুর পদ্ধতিতে ধর্ম-শিক্ষা দিলে ফল পাওয়া যায় বেশি। প্রকৃতপক্ষে, পড়বার সময় ব্যাকার মেণ্ডেলের সঙ্গে বাইরের জগতের কোনো সম্পর্কই থাকত না—আফিংখোর মতো ধ্যানমগ্ন হ'য়ে যেত। ঘরের মধ্যে যে বিলিয়াড বলের আওয়াজ হচ্ছে, ওয়েটার-রা যাওয়া-আসা করছে, টেলিফোনের ঘণ্টা বাজছে এসবের প্রতি কান দিত না সে। ঘরের মেঝে যখন ঘষামাজা হচ্ছে কি বা উনোনটা ধরানো হচ্ছে তখনও তার সেই একই অবস্থা, নির্বিকার। একবার উনোন থেকে একটা জ্বলন্ত কয়লা প'ড়ে গিয়ে মেঝেতে আগুন লেগে গিয়েছিল। মেণ্ডেলের পা থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে আগুনটা জ্বলছিল। ঘরটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল, কে একজন আগুন নেবাবার জন্যে ছুটে গেল জল আনতে। কিন্তু এত হৈ-চৈ এবং ধোঁয়া থাকা সত্ত্বেও সে অবিচলিত-ভাবে বই এর মধ্যে ডুবে রইল। অন্যান্য সবাই যেমন তন্ময় হ'য়ে প্রার্থনা করে, জুয়াড়ীরা যেমন মত্ত হ'য়ে থাকে জেতার আশায়, মাতালরা যেমন চেয়ে থাকে অখণ্ড শূন্যতার দিকে, মেণ্ডেলও ঠিক তেমনি একাগ্রমনে বই পড়ত। সে ছিল গেলিশিয়া প্রদেশের লোক। পুরনো বই-এর ব্যবসা করত। এই গভীর মনোযোগের রহস্য প্রথম উদ্‌ঘাটিত হয় মেণ্ডেলকে দেখে। আমার তখন যৌবন বয়েস। শিল্পী পণ্ডিত, মহাজ্ঞানী এবং জড়মূর্খদের মধ্যে এমন পরিপূর্ণ একাগ্রতার বিশেষত্ব দেখতে পাওয়া যায়। পারিপার্শ্বিকের

সঙ্গে একেবারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাওয়ার জন্যে যে বিষাদক্লিষ্ট সুখ এবং দুঃখের সৃষ্টি হ'তে পারে তার প্রথম প্রমাণ পেলাম মেণ্ডেলের কাছ থেকে।

উঁচু ক্লাশের একটি ছাত্র আমায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তার সঙ্গে। আমি তখন মেস্‌মের-এর জীবনী এবং তাঁর কীর্তিকাহিনী সম্বন্ধে গবেষণা করছিলাম। তিনি ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু আজও তিনি একরকম অপরিজ্ঞাত হ'য়েই আছেন। আমার গবেষণা-কাজও বেশি দূর এগুতে পারছিল না। যেসব বই-এর খোঁজ পেলাম তাতে তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ানের কাছে সাহায্য চাইলুম। তিনি অত্যন্ত অশিষ্টভাবে বললেন যে, নতুন ছাত্রদের গবেষণার গ্রন্থাদি খুঁজে দেওয়া তার কাজ নয়। তখন আমার কলেজের বন্ধুটি আমায় মেণ্ডেলের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করল। সে বলল, "বই সম্বন্ধে মেণ্ডেল সব কিছুই জানে। তুমি যা চাও এবং কোন্ বইতে তা পাওয়া যাবে সে তোমায় ব'লে দিতে পারবে। ভিয়েনায় তার মতো দ্বিতীয় আর কেউ নেই। সাহায্য নেবে তো এমন একজন পণ্ডিত মানুষের কাছ থেকেই নেওয়া উচিত। লোকটি গ্রন্থজগতের বৈচিত্র্যবিশেষ। অধুনা-লুপ্ত এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তিনিই শুধু কোনোরকমে টিঁকে রয়েছেন।"

এর পর আমরা কাফে গ্লুক এ গিয়ে উপস্থিত হলুম। দেখলাম বুখমেণ্ডেল তার নিত্যকার জায়গাটিতে বসে রয়েছে। চশমা পরা, শ্মশ্রুমণ্ডিত এবং কালো রঙের পুরনো জামা-কাপড় পরিহিত। আগে যেমন বলেছি ঠিক সেইভাবে সামনে পেছনে দেহটাকে দোলাচ্ছে। আমাদের সে লক্ষ্যই করল না। বই-এর মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রাখল। প্রথম দেখে মনে হ'ল লোকটি যেন একজন চীনা সরকারী কর্মচারীর মতো। তিনি সব ভারে মাথাটি নিচু ক'রেই রেখেছে। তার পেছন দিকে দেয়ালের গায়ে একটা ওভারকোটটা টাঙানো রয়েছে। ওভারকোটের পকেটগুলো ফুলে-ফেঁপে উঠেছে—বই, পাণ্ডুলিপি আর ক্যাটালগ দিয়ে ভর্তি। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে বন্ধুটি বেশ জোরেই কেশে উঠল একবার। কিন্তু তাতেও কাজ হ'ল না, মেণ্ডেল কাশির সংকেতও উপেক্ষা করল। শেষ পর্যন্ত আমার বন্ধু শিমিড টেবিলের ওপর সজোরে ঘুষি মারল। এবার মেণ্ডেল ওপর দিকে দৃষ্টি তুলল। চশমাটা ঠেলে তুলে দিল কপালের ওপর। পুরু এবং এলোমেলো ছাই রঙের ভুরুর তলা

থেকে সতর্ক চোখ দুটি জ্বলজ্বল করতে লাগল। বন্ধুটি আমায় পরিচয় করিয়ে দিল। আমার বিপদের কথা বললুম তাকে। শিমিডের কথামতো আমি তাকে আমার অশেষ বিরক্তির কথা জানিয়ে উল্লেখ করলুম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান আমায় সাহায্য করতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক। মেণ্ডেল হেলান দিয়ে বসল। অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। গেলিশিয়া দেশের লোকেদের মতো নিজের কণ্ঠস্বরে উচ্চারণভঙ্গির বৈশিষ্ট্য এনে সে ব'লে উঠল, "তুমি ভাবছ, লাইব্রেরিয়ানের অনিচ্ছা? তা নয়। এটা তার অযোগ্যতা। সে হচ্ছে একজন গবুচন্দ্র। তাকে আমি প্রায় বিশ বছর ধ'রে চিনি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে লোকটি শেখেনি কিছুই। মাসে মাসে মাইনে নেওয়া ছাড়া এরা আর কিছুই করে না। গ্রন্থজগতের ওপর চেপে ব'সে না থেকে এদের উচিত রাস্তাঘাট মেরামত করার কাজ নেওয়া।"

তার এই আবেগপূর্ণ উক্তির পরে ব্যাপারটা অনেক সহজ হ'য়ে গেল। এই গ্রন্থকীটটি বন্ধুভাবাপন্ন হ'য়ে আমায় বসবার জন্যে আমন্ত্রণ করল। আমি যে তার সাহায্য এবং উপদেশ নিতে এসেছি সেই কথা আবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। তাকে বললুম যে, পশুদের চুম্বকশক্তি সম্বন্ধে যেসব বই লেখা হয়েছিল প্রথম যুগে তার একটা তালিকা চাই। মেসমের-এর জীবিত-কালে এবং পরবর্তী সময়ে তার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যেসব পুস্তিকা কিংবা পুস্তকাদি লেখা হয়েছিল তারও একটা তালিকা আমার দরকার। আমার বক্তব্য যখন শেষ হ'ল তখন মেণ্ডেল তার বাঁ চোখটি মুহূর্তের জন্যে সহসা বন্ধ ক'রে ফেলল। যেন চোখ থেকে ধূলিকণা বার করছে সে। আসলে তার মনের সেই সাংঘাতিক একাগ্রতা যে পুঞ্জীভূত হ'য়ে আসছে এটা তারই পূর্বাভাস। এর পর মনে হ'ল সে বুঝি একটা অদৃশ্য ক্যাটালগ থেকে দু-তিন ডজন বই-এর নাম ব'লে যেতে লাগল। প্রত্যেকটা বই করে এবং কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার তারিখ এবং স্থানগুলোও ব'লে দিল সে। শুধু কি তাই? একটা মোটামুটি দামের তালিকাও পেশ করল মেণ্ডেল। আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। অবিশ্যি বিস্ময় প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল শিমিড। সে জানত, বিস্ময় প্রকাশ করলে মেণ্ডেলের আত্মগর্ব আরও বাড়বে। হ'লও তাই। তার বিপুল স্মৃতিশক্তির আবদ্ধ ঘরের চাবি গেল খুলে। সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক-বিবরণী সম্বন্ধে নিজের টীকা পর্যন্ত দিয়ে যেতে লাগল

সে। এতটা ভাবতে পারিনি, সত্যিই বিস্ময়কর! যারা নিদ্রিতাবস্থায় হেঁটে বেড়ায় তাদের সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই কি আমি? পার্কিনের উদ্ভাবিত ধাতুনির্মিত ট্রাকটর, কিংবা সম্মোহনবিদ্যার যেসব নিরীক্ষা-পরীক্ষা হয়েছিল প্রাচীন কালে তার সম্বন্ধে আমার কোনো কৌতূহল আছে কি? ব্রেইড, গ্যাসনের অথবা ভূতপ্রেতদের বাধ্য করার জাদু সম্পর্কে, কিংবা খ্রীষ্টীয় বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধেও যদি আমার জানবার কিছু থাকে তাহ'লে মেণ্ডেল আমায় সাহায্য করতে পারে। এমনকি থিওসফি এবং ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্স্কি পর্যন্ত তার জ্ঞানের রাজ্য থেকে বাদ পড়ল না। প্রত্যেকটা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্পর্কে অসংখ্য বই-এর নাম, তারিখ আর প্রসঙ্গোচিত তথ্যাদি বর্ণনা করতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম, যাকোব মেণ্ডেল একটি জীবন্ত অভিধান। ব্রিটিশ মিউজিয়মের পাঠাগারে যে ক্যাটালগটি আছে তার সঙ্গে এর অনেকটা মিল রয়েছে। তফাত শুধু, যাকোব মেণ্ডেল জীবন্ত আর ক্যাটালগটি নির্জীব। পুস্তক-বিবরণী সম্বন্ধে তার জ্ঞানের পরিধি দেখে হতবুদ্ধির মতো আমি তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। গেলিশিয়া প্রদেশের পুরনো পুস্তক বিক্রেতাটির অপরিচ্ছন্ন আলখাল্লার তলায় যেন তার এই বিরাট জ্ঞানের রাজ্যটি ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে আছে। এক নিশ্বাসে আশিটা বই-এর নামোল্লেখ করবার পর সে নোংরা রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছল। এক সময়ে রুমালটা হয়তো সাদাই ছিল। বইগুলোর যখন নাম বলছিল মেণ্ডেল, তখন এমন একটা ভাব দেখাল যেন এই ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু আমি জানি, আসলে সে মনে মনে আনন্দ পাচ্ছিল খুব। যেন অপ্রত্যাশিতভাবে তুরুপের তাস মেরে জয়ের আনন্দ উপভোগ করছে সে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "খুব বেশি ঝঞ্ঝাট না ক'রে এদের মধ্যে কোন্ কোন্ বইগুলো আপনি আমায় যোগাড় ক'রে দিতে পারেন?"

"আমি তাহ'লে একবার দেখে নিই। কাল এখানে তুমি এসো। কয়েকটা বই আমি নিশ্চয়ই নিয়ে আসব। অন্যগুলোও তুমি পাবে। তবে সময়-সাপেক্ষ। আমায় খুঁজে দেখতে হবে।"

বললুম, "সত্যিই কৃতজ্ঞ থাকব আমি।" তারপর ভদ্রতার খাতিরেই ভাবলুম যে, আমার দরকারী বই-এর তালিকাটি তাকে দিয়ে দিই। শিমিড আমায় তার কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে সাবধান করল। কিন্তু খুবই দেরি

হ'যে গিযেছিল। কাবণ মেণ্ডেল ইতিমধ্যে আমাব দিকে একদৃষ্টিতে চেযে ছিল। লক্ষ্য কবছিল আমাকে। দৃষ্টিতে তাব জযেব গব, আবাব উপেক্ষাব পবিমাণও কম নয। সব মিলিযে একটা উন্নাসিক ভাব। যেন ম্যাকডাফেব হুঙ্কাব শুনেও ম্যাকবেথ টলছে না, বাজকীয মেজাজে আত্মসমর্পণেব আহ্বান উপেক্ষা কবছে সে। আমাব বই-এব তালিকাব কথা শুনে কাঠখোট্টাভাবে হেসে উঠল মেণ্ডেল। উত্তেজনায কণ্ঠমণিটা তাব ন'ডে-চ'ডে উ'ল। বলা অনাবশ্যক যে, অপমানিত বোধ কবল সে।

অপমানিত বোধ কববাব তাব যথেষ্ট কাবণ ছিল। সে হচ্ছে যাকোব মেণ্ডেল, তাব মতো একজন মানুষকে গ্রন্থতালিকা দেওযার প্রস্তাব কবাব অর্থ কি? এমন প্রস্তাব শুধু নিবোধেবাই কবতে পাবে, কিংবা যাবা তাকে চেনে না তাদেব পক্ষেই সম্ভব। যাকোব মেণ্ডেল তো আব বই-এব দোকানেব একজন সাধাবণ কর্মচাবী নয। পবে যখন আমি তাকে ভালো ক'বে চিনতে পেবেছিলুম তখন মনে হযেছিল যে, ভদ্রতা বক্ষাব জন্যেই মেণ্ডেলকে আমি পুস্তক-তালিকাটি দিতে চেযেছিলুম বটে, কিন্তু তাতে এই অনাদৃত প্রতিভাশালী ব্যক্তিটি কষ্ট পেযেছিল নিশ্চযই। বাইবে থেকে দেখতে খুব অপবিচ্ছন্ন এবং সাধাবণ হ'লে কি হবে তাব স্মৃতিশক্তি এত প্রখব ছিল যে, প্রতিটি মুদ্রিত পুস্তকেব নাম ছবিব মতো ভেসে উঠত চোখেব সামনে। বইগুলি গতকাল মুদ্রিত হযেছে, না শত শত বছব আগে প্রকাশিত হযেছে তাতে মেণ্ডেলেব কিছু যায আসে না। কাবণ, বইগুলিব দাম, প্রকাশকদেব ঠিকানা এবং লেখকদেব নাম সবই তার মুখস্থ ছিল। স্মবণশক্তি থেকে বইগুলিব বিষযবস্তু সম্বন্ধেও কথা বলতে পাবত সে। এমনভাবে বলত যেন সত্যি সত্যি বই থেকে প'ড়ে যাচ্ছে বুঝি। শুধু তাই নয। উল্লিখিত পুস্তকেব ব্যাখ্যাকাবী চিত্রগুলি পযন্ত সে ভুলে যাযনি। এ তো হচ্ছে শুধু হাতেব কাছে যেসব বই থাকত সেগুলোব কথা। কিন্তু দোকানেব শো-কেসে বক্ষিত বইগুলো দূব থেকে দেখেও মেণ্ডেল যেন মনশ্চক্ষুতে তাদেব ভেতবেব বিষযবস্তু সব দেখতে পেত। চিত্রশিল্পী যেমন বং-তুলি ব্যবহাব কববাব আগে তাব কল্পনাটিকে পবিষ্কাব দেখতে পায, এও ঠিক তেমনি স্পষ্টভাবে কল্পনা কবতে পাবত সব। পুবনো বই-এব ব্যবসা ছিল মেণ্ডেলেব। কেউ যদি তাব কাছে একটা পুবনো বই বেচতে এসে চাব টাকা দাম চাইত, তাহ'লে সে ব'লে দিতে পাবত যে, দু'বছর আগে

ঠিক ঐ বইটারই একটা কপি ভিয়েনার এক নিলামঘরে চার আনায় বিক্রি হয়েছিল। ক্রেতার নামটা পর্যন্ত মনে ক'রে রেখেছে সে। মোদ্দা কথা হচ্ছে যে, যাকোব মেণ্ডেল বই-এর নাম কিংবা দাম কখনো ভোলে না। নিত্যপরিবর্তনশীল গ্রন্থজগতের এমন কোনো নিগূঢ় রহস্য নেই যা তার কাছে অপরিজ্ঞাত। যে-কোনো বিদ্যার বিশেষজ্ঞদের চেয়ে তার জ্ঞান ছিল বেশি। লাইব্রেরিতে কি কি বই আছে সে সম্বন্ধে লাইব্রেরিয়ানদের চেয়ে মেণ্ডেলের ধারণা ছিল ব্যাপকতর। বিভিন্ন প্রকাশভবনের মালিকরা তাঁদের নিজেদের পুস্তক-তালিকা সম্বন্ধে যত না খোঁজ রাখতেন তার চেয়ে বেশি খবর রাখত মেণ্ডেল। এইজন্যে তাকে বিশেষ কোনো ব্যবস্থার বা চেষ্টার আশ্রয়প্রার্থী হ'তে হয়নি, শুধু তার নির্ভুল স্মৃতিশক্তিই তাকে সর্বক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। তার এই স্মৃতিশক্তির মধ্যে এমন এক ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা ছিল যার ব্যাখ্যা খুজে পাওয়া সত্যিই অসাধ্য। মেণ্ডেলের এই বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির উৎস ছিল তার একাগ্র মনের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা।

বই ছাড়া পৃথিবীর আর কিছুই সে জানত না। যতক্ষণ না ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত হ'য়ে বই আকারে বেরিয়ে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবনের রহস্য ওর কাছে অবাস্তব কল্পনা ব'লে মনে হ'ত। বই পড়ত সে অর্থ বুঝবার জন্যে নয়, কিংবা আধ্যাত্মিক উন্নতির অভিলাষও তাতে ছিল না। গ্রন্থ-জগতের প্রতি তার এই অত্যুগ্র কৌতূহলের পেছনে ছিল শুধু একটা কারণ। বই-এর লেখক, তার দাম, পৃষ্ঠাসংখ্যা এবং বইটার নাম জানতে পারলেই তার কৌতূহল যেত শেষ হ'য়ে। প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাবে যে, এর কোনো মূল্য নেই। সৃষ্টিশীলও নয় এ। কিন্তু যাকোব মেণ্ডেলের এই সেকেলে স্মৃতিশক্তির দৃষ্টান্ত সত্যিই অদ্বিতীয়। মাথাটা তার মুদ্রিত গ্রন্থতালিকা নয়। অথচ প্রতিটি বিবরণ তার মাথায় নিখুঁতভাবে খোদাই করা ছিল। এটাও তো কম কৃতিত্বের নয়। মেৎসোফ্যান্টির ভাষাজ্ঞানের প্রতিভা, লাসকের-এর দাবা খেলার দক্ষতা, বুসোনির সংগীত-পারদর্শিতা কিংবা নেপোলিয়নের চেহারা থেকে চরিত্রনির্ণয়ের ক্ষমতার চেয়ে মেণ্ডেলের ক্ষমতা কোনো অংশে কম প্রশংসনীয় নয়। তাকে যদি শিক্ষকতার কাজ দেওয়া হ'ত তাহ'লে আজ লক্ষ লক্ষ ছেলের কৃতজ্ঞতাভাজন হ'ত সে। যাকোব মেণ্ডেল এদের মধ্যে বহু ছাত্রকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে

পাবত যে, অনেকেই যথার্থ পাণ্ডিত্য লাভ করত। এবং জনসাধাবণেব জ্ঞানবৃদ্ধির জন্যে যেসব লাইব্রেবি খোলা হয়েছে সেখানে এঁদের মূল্য হ'ত সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তা তো হয়নি। শুধু একজন বই-এব ফেবিওয়ালা হ'য়ে বইল সে। গেলিশিয়া দেশেব সাধাবণ একটা ধর্মশিক্ষাব ইস্কুলে সে লেখাপড়া শিখেছে। সমাজেব উঁচুতলাব শিক্ষিত অংশটায় প্রবেশ কববাব পথ পেল না মেণ্ডেল। তাব কৃতিত্ব প্রকাশেব একমাত্র জায়গা হ'ল কাফে গ্লুক-এব একটা আবদ্ধ ঘবেব এই টেবিলখানাব ওপব। এমন দিন যদি আসে যখন কোনো মনস্তাত্ত্বিক মানুষেব স্মৃতিশক্তিব বৈশিষ্ট্যকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ কবছেন, (যেমন প্রাণিজগতেব প্রজাতি সম্বন্ধে প্রকাবভেদ কবেছেন ব্যুফ) তখন অতীতেব সেই বিস্মৃতপ্রায় যাকোব মেণ্ডেলেব জন্যেও তাঁকে একটি আলাদা স্মৃতিব কক্ষ তৈবি কবতে হবে।

পুস্তক ব্যবসায়ী এবং সাধাবণ লোকেবা তাকে একজন পুবনো বই এব সামান্য কাববাবী ব'লেই জানে। দীর্ঘদিন ধ'বে প্রতি ববিবাব খববেব কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হ'য়ে আসছে 'পুবনো পুস্তক খবিদেব জন্যে সর্বোচ্চ মূল্য দেওয়া হয়—মেণ্ডেল। ঠিকানা, ওবিয়েব অ্যাল্‌সাসট্রাস।" ওতে একটা টেলিফোন নম্ববও থাকত। আসলে সেই নম্ববটা ছিল কাফে গ্লুক-এব। মেণ্ডেলেব কোনো দোকান ছিল না। সাবা সংসাব খুঁজে পেতে তন্নতন্ন ক'বে যেসব সওদা সে কিনত তা একজন দাড়িওয়ালা কুলীব মাথায় চাপিয়ে দিয়ে নিয়ে আসত নিজেব কাছে। সপ্তাহে একবাবই তাব সওদা কেনবাব দিন। তাব আগে অবিশ্যি পুবনো স্টক বেচে ফেলত সে। সাবাটা জীবন সে একজন নগণ্য কাববাবী হ'যে বইল। ব্যবসা থেকে আয়েব পবিমাণ তাব কোনোদিনই বাড়ল না। ছাত্রবা বিক্রি কবত পাঠ্যপুস্তক। সেই একই বই বছবেব পব বছব সে আবাব নতুন ছাত্রদেব কাছে বেচে দিত। তা ছাড়া, অল্প একটু পাবিশ্রমিক পেলে অন্যান্য বইও সে যোগাড় ক'বে আনত তাদেব জন্যে। কোনো বই সম্বন্ধে খবব জানতে চাইলে বিনা পয়সাতেই খবব সব দিয়ে দিত। তাব এই নিজস্ব জগৎটিতে টাকার কোনো মূল্যই ছিল না। ছেঁড়া কালো কোটটি ছাড়া কেউ কখনো তাকে ভালো জামাকাপড় পরতে দেখেনি। খাবাব সম্বন্ধেও সেই একই অবস্থা। সকালে এবং বাত্রে খেত এক গেলাস দুধ আব দু' টুকবো রুটি। দুপুবের খাওয়াও

ছিল সামান্য। ধূমপান করত না, তাসপাশার প্রতিও ঝোঁক ছিল না কিছু। তার চশমার পেছনে চোখ দুটি দেখতে না পেলে কেউ বুঝতে পারত না যে, যাকোব মেণ্ডেল বেঁচে আছে কিনা। মানুষ সম্বন্ধে তার কৌতূহল নেই। আবেগশূন্য মন। শুধু আত্মশ্লাঘাই ছিল তার মনের একমাত্র সম্পদ। কেউ যদি কখনো সর্বত্র ব্যর্থমনোরথ হ'য়ে কোনো একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থের জন্যে তার কাছে ছুটে আসত, মেণ্ডেল তখন সেই বইটির খোঁজ দিয়ে আত্মতুষ্টিতে চোখ বুঁজত। এই পরোপকারী এবং জ্ঞানী লোকটিকে ভিয়েনার অনেকেই শ্রদ্ধা করত ব'লে আনন্দের আর সীমা ছিল না তার। আধুনিক যুগের অতি অদ্ভুত শহরগুলির বুকে ছোট ছোট জগতের অস্তিত্ব আমাদের চোখে পড়ে না বটে, কিন্তু বিভিন্ন চারুকলার রসপণ্ডিত কিংবা সমপেশাদারদের কাছে সেগুলির মূল্য অত্যন্ত বেশি। গ্রন্থজগতের অনুরাগী ভক্তরা যাকোব মেণ্ডেলকে ভালো করেই চিনত। সংগীত সম্বন্ধে কোনো কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে সবাই যেমন ম্যান্‌ডিউইস্কির কাছে যায়, কিংবা ভিয়েনার প্রাচীন থিয়েটার অথবা সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে জানতে হলে ফাদার গ্লাসির কাছে যেতেই হয়, তেমনি ভিয়েনার গ্রন্থকীটরাও নিশ্চিত বিশ্বাসে ছুটে আসে কাফে গ্লুক-এ—যাকোব মেণ্ডেলের সামনে নামিয়ে দেয় সমস্যার বোঝা।

সবাই তার কাছে পরামর্শ নিতে আসছে দেখে আমি সত্যিই আগ্রহের ভারে ভেঙে পড়তে লাগলুম। তা ছাড়া আমি নতুন বলেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে উন্মুখ হ'য়ে উঠেছিলুম। বিক্রেতা যখন তার কাছে সাধারণ একটা বই নিয়ে আসত তখন সে অবজ্ঞাভরে মলাট দুটো বন্ধ করে দিয়ে বলত, "ছ্যাঃ। এ তো মাত্র দু'-আনা দামের বই।" কিন্তু যদি তাকে একটা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ দেখানো হ'ত, তাহলে সহসা সে সজাগ হ'য়ে উঠত। টেবিলে একটা পরিষ্কার কাগজ বিছিয়ে দিয়ে মহামূল্যবান রত্নের মতো বইটি রেখে দিত তার ওপর। তখন সে নিজের অপরিষ্কার কালি-লাগা আঙুলগুলির জন্যে লজ্জা বোধ করত খুব। অত্যন্ত সতর্কভাবে, সশ্রদ্ধচিত্তে এবং স্নেহের সঙ্গে গ্রন্থ-রত্নটির পাতা ওল্টাত সে। এমত অবস্থায় কেউ তাকে বিরক্ত করত না। মানুষ যখন ধর্মমন্দিরে প্রার্থনায় রত থাকে, তখন তার ওপরে হামলা করলে ভক্তির একাগ্রতা আর থাকে না। বইটি হাতে নিয়ে যাকোব মেণ্ডেলও যেন আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্ম পালন করত।

মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে নিজের মনেই ব'লে উঠত, "আহা, কি সুন্দর।" আবার যখন দেখত একটা পাতা খোয়া গিয়েছে, কিংবা কোনো একটা অংশ পোকায় কেটে দিয়েছে তখন সে বিষাদের সুরে বলত, "হায়, হায়, কি সর্বনাশ।"

বইটা হাতে নিয়ে এমন গভীরভাবে চিন্তা করবে যেন এসব বই বেচা-কেনা হয় সোনার মতো ওজন ক'রে ক'রে। যেমনভাবে মেয়েরা ভাবপ্রবণতায় গদগদ হ'য়ে গোলাপফুলের গন্ধ শোঁকে, মেণ্ডেলও ঠিক তেমনিভাবে বইটা নাকের কাছে তুলে ধ'রে জোরে জোরে নিশ্বাস টানে। অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হাতে পড়লে দরদ-বাহুল্যে অস্থির হ'য়ে ওঠে সে। পরীক্ষার অনুষ্ঠানটি যখন শুরু হয় তখন যদি গ্রন্থের মালিক অধৈর্য হ'য়ে ওঠেন তাহ'লে তার ব্যবহারটা অশোভন ব'লে গণ্য হয়।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর খুব উৎসাহের সঙ্গে এবার সে গ্রন্থটি সম্বন্ধে হাজার রকমের সংবাদ বিতরণ করতে থাকবে। এই সম্পর্কে যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্য কাহিনী সে জানে তাও বলবে মেণ্ডেল। তারপর এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটির অন্যান্য দুএকটা কপি করে এবং কোন্‌ নিলামঘর থেকে কত দামে বিক্রি হয়েছিল তার বিবরণগুলির মধ্যে নাটকীয় রস পরিবেশন করবে। সেই সময় মনে হবে, তার বুঝি বয়েস ক'মে গেছে। আনন্দের উচ্ছ্বাসে জীবন্ত হ'য়ে উঠবে সে। তার এই বিগলিত হৃদয়াবেগের স্রোত বন্ধ করবার একটি মাত্র উপায় আছে। যখন সেই গ্রন্থের মালিক কৃতজ্ঞচিত্তে বিশেষজ্ঞের মতামতের জন্যে দাম দিতে চাইবেন তখন যাকোব মেণ্ডেল নির্বাক হ'য়ে ব'সে থাকবে তার চেয়ারে। এ যেন আমেরিকান ট্যুরিস্ট যাদুঘর দেখতে এসে যাওয়ার সময় তার জিম্মাদারকে বখশিশ দিতে চাইছে। এই ধরনের আনাড়ীরা যাকোব মেণ্ডেলকে চিনতে পারেনি। তার মতামতের মূল্য টাকার বিনিময়ে ধার্য করা যায় না। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্কটা তার সাধারণ ব্যাপার নয়, অত্যন্ত পবিত্র। স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের সম্পর্কের মতো। যাকোব মেণ্ডেলের জীবনে শুধু সেই কটা মুহূর্তই প্রেমালাপের স্বর্ণ সময়। বই-ই শুধু তাকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখতে পারে। টাকাপয়সার জগৎটা নগণ্য। সেইজন্যে সুবিখ্যাত সংগ্রাহকরা তাকে লাইব্রেরিতে লাইব্রেরিয়ানের চাকরি দেওয়ার চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থ হয়েছেন। ধন্যবাদ জানিয়ে মেণ্ডেল

তাঁদেব প্রস্তাব প্রতিবাবই বাতিল ক'রে দিযেছে তাব এই চিরপরিচিত কাফে গ্লুক-এর কেন্দ্রীয় দফতবটি সে ত্যাগ কবতে পাবেনি। তেত্রিশ বছব আগে গেলিশিযা থেকে একটি আনাডী ধবনেব যুবক ভিয়েনায এসেছিল ইহুদী ধর্মেব শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতাব কাজ কববাব উদ্দেশ্য নিযে। কিন্তু এক-ঈশ্ববেব পূজায সে আত্মনিযোগ করতে পাবল না। অনুগত ভক্তেব মতো ভালবাসল বহু ঈশ্ববরূপী গ্রন্থজগতেব বাশি বাশি বই। তারপর হঠাৎ একদিন কাফে গ্লুক-এব সঙ্গে তাব পবিচয হয। ক্রমে ক্রমে এটাই তাব কাবখানা, দফতব এবং পোস্ট-অফিসে রূপান্তবিত হ'যে গেল। সৃষ্টি হ'ল যাকোব মেণ্ডেলেব এক নিজস্ব জগৎ। জ্যোতির্বিজ্ঞানী যেমন একা একা তাব মানমন্দিবে ব'সে বাত্রিব পব বাত্রি দূববীক্ষণ যন্ত্রেব সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রেব বহস্যময গতিবিধিব প্রতি দৃষ্টি বাখে, যাকোব মেণ্ডেলও তেমনি কাফে গ্লুক-এব টেবিলে ব'সে চশমাব মধ্যে দিযে চেযে থাকে তাব গ্রন্থজগৎটিব দিকে। এব অবস্থান আমাদেব দৈনন্দিন জীবনেব অনেক ঊর্ধ্বে।

বলাই বাহুল্য যে, কাফে গ্লুক-এ যাবা আসে তাবা সবাই মেণ্ডেলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অধ্যাপক সে নয। কিন্তু আমবা তাকে বেসবকাবীভাবে অধ্যাপকই ভাবতুম। সেই জন্যেই আমাদের শ্রদ্ধাব মাত্রা ছিল আবও বেশি। চেবীকাঠেব কাউন্টাব কিংবা বিলিযাড খেলাব পুবনো টেবিলটাব মতো সেও ছিল এই ঘবখানাব অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ। টেবিলটা ছিল তার মন্দিবেব মতো পবিত্র স্থান। টেবিল-সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানটিব মঙ্গল কামনা করত তাব অগণিত খদ্দেব এবং ভক্তবৃন্দ। সেই উদ্দেশ্যে খাওযাদাওয়াও চলত। ফলে, তাব ব্যবসা থেকে সামান্য যা লাভ হ'ত তাব বেশির ভাগই খবচ হ'যে যেত কাফে গ্লুক-এ। এখানকাব সবচেযে বড আকর্ষণ ছিল মেণ্ডেল। সেইজন্যে অনেক কিছু সুযোগ সুবিধেও পেযেছিল সে। পয়সা না দিযেও টেলিফোনটা ব্যবহাব কবতে পাবত। তাব চিঠিপত্র আসত এই ঠিকানায। তাব নামে যেসব পার্সেল আসত তাও সব এখানকাব লোকেরাই বেখে দিত। যে-বৃদ্ধাটি হাতমুখ ধোযাব স্নানঘরটির তত্ত্বাবধানেব কাজ কবত, ফুবসত পেলেই সে মেণ্ডেলেব কোটটাও দিত বুরুশ ক'বে। বৃদ্ধাটি সত্যিই খুব ভালো ছিল। কোটেব বোতাম পর্যন্ত সেলাই ক'বে দিত তার। প্রতি সপ্তাহে জামা-কাপডেব একটা পুঁটলি ব'য়ে নিয়ে যেত ধোপাবাডি।

মেণ্ডেলই ছিল এদের একমাত্র খদ্দের যার জন্যে এরা বাইরের রেস্তরাঁ থেকে খাবার আনিয়ে দিত। প্রত্যেকদিন সকালবেলা কাফের মালিক মিস্টার স্ট্যাণ্ডহার্টনের বিশেষ উদ্যোগ ক'রে তার টেবিলের সামনে এসে বলতেন, "সুপ্রভাত।" বই-এর মধ্যে এত গভীরভাবে ডুবে থাকত মেণ্ডেল যে, প্রায় প্রত্যেকদিন এই অভিবাদনের প্রতি নজরই দিত না সে। একেবারে ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে সাতটায় এখানে এসে উপস্থিত হ'ত এবং রাত্রিবেলা যতক্ষণ না আলো নিবিয়ে দেওয়া হ'ত ততক্ষণ পর্যন্ত জায়গাটা ত্যাগ করত না সে। কাফের অন্য খদ্দেরদের সঙ্গে কখনো তাকে কেউ বাক্যালাপ করতে দেখেনি। খবরের কাগজ পড়ত না। ঘরের কোনো পরিবর্তনের দিকে নজরও দিত না। একবার একটা ভারি মজার ব্যাপার ঘটেছিল। এতকাল কাফের আলোগুলোতে দুর্গন্ধযুক্ত কেরোসিন তেল ব্যবহার করা হ'ত। সেগুলো সরিয়ে দিয়ে তার বদলে দেওয়া হ'ল অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো। মিস্টার স্ট্যাণ্ডহার্টনের একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কেরোসিন-ল্যাম্প-এর চেয়ে বৈদ্যুতিক আলোয় পড়তে তার বেশি সুবিধে হয় কিনা। যাকোব মেণ্ডেল অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল বাল্‌বগুলির দিকে। গত ক'দিন ধ'রে মিস্ত্রীরা কাজ করছিল, হাতুড়ি এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির আওয়াজ তাতে কম হয়নি—কিন্তু তা সত্ত্বেও এই নতুন ব্যবস্থাটা চোখে পড়েনি তার। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর কোনো কিছুই তার চোখে পড়ে না। গোলাকৃতি দুটো চশমার কাচের মধ্য দিয়ে শুধু সে দেখতে পায় কালো কালো অক্ষরের সারি। বই-এর কোটি কোটি অক্ষরই শুধু তার মাথায় ঢোকে। তার আশেপাশের যাবতীয় সংঘটনগুলিকে সে অর্থহীন আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই ভাবত না। জীবনের ত্রিশটা বছর এই টেবিলে ব'সে যাকোব মেণ্ডেল পড়াশোনা করেছে, চিন্তা করেছে। বিরামহীন একটানা ত্রিশ বছরের জাগ্রত স্বপ্ন! ঘুমের সময়টুকু ছাড়া তার মধ্যে আর মুহূর্তের বিরতি ছিল না।

আজকে যখন কাফে গ্লুক-এর পেছন দিকের সেই ছোট্ট ঘরটির দিকে দৃষ্টি পড়ল আমার তখন আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না। মনটা আতঙ্ক-বিহ্বল হ'য়ে উঠল। মার্বেলে মোড়া যেই টেবিলটাতে ব'সে যাকোব মেণ্ডেল জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিত সেটার বুক যেন আজ সমাধির রিক্ততা।

বয়েস বেড়েছে আমার। এখন বুঝতে পারছি, মেণ্ডেলের মতো মানুষ যখন তার যথার্থ স্থানটুকু থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়েছে তখন ক্ষতির পরিমাণ বড় কম নয়। দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমির মধ্যে এমন একটি অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের যে কতখানি দাম তাও আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম। তা ছাড়া বুখ্‌মেণ্ডেল ছিল আমার ছেলেবেলাকার প্রিয়জন। তাকে দেখে দেখেই আমি প্রথম একটা প্রহেলিকামূলক সত্যের সন্ধান পেয়েছিলাম। আমি শিখেছিলাম যে, কেবলমাত্র কেন্দ্রীভূত মানসিক একাগ্রতার দ্বারা মহৎ কাজ করবার ক্ষমতা জন্মায়। এই ধরনের প্রচণ্ড একাগ্রতাকে উচ্চমার্গের উন্মত্ততা বললেও চলে। অপরিজ্ঞাত প্রতিভাসম্পন্ন পুরনো পুস্তক ব্যবসায়ীটি ছিল আমার কাছে একটা জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্ত দেখেই আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ভারতীয় যোগী কিংবা মধ্যযুগের সন্ন্যাসীদের মতো একাগ্রতার সাহায্যে কোনো একটা বিশেষ কল্পনার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ডুবে যাওয়া কিংবা বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করা খুবই সম্ভব। এবং লেখকদের লেখা প'ড়ে যত না প্রেরণা পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশি প্রেরণা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল ঐ জীবন্ত দৃষ্টান্তটির সাহচর্য লাভে। তাও এত বড় একটা মহৎ সাহচর্য পাওয়া যেত সাধারণ একটা কাফেতে বসে। তা সত্ত্বেও যাকোব মেণ্ডেলকে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এর জন্যে মহাযুদ্ধের বছরগুলোই শুধু দায়ী নয়, নিজের কাজের মধ্যেও ডুবে গিয়েছিলাম আমি। এখন ঐ খালি টেবিলটা চোখে পড়তেই লজ্জিত বোধ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকটার সম্বন্ধে কৌতূহলও জাগল। একজন ওয়েটারকে ডেকে জিজ্ঞেস করলুম তার কথা। সে বলল, "মিস্টার মেণ্ডেল নামে কাউকে আমি চিনি না। যারা সদাসর্বদা কাফে গ্লুক-এ আসা-যাওয়া করেন তাঁদের মধ্যেও ঐ নামে কেউ নেই। আপনি বরং হেড ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করুন।"

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে কেমন যেন সন্দেহজনকভাবে হেড-ওয়েটার বলল, "মিস্টার মেণ্ডেল? নাঃ, এই নামের কোনো লোকের কথা জানি না। আপনি বোধ হয় মিস্টার মাণ্ডেল্‌-এর কথা বলছেন যার একটা লোহার দোকান আছে?"

তিক্ত অভিজ্ঞতা হ'ল আমার। বুঝলাম, অতীতটাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। জীবনের বেলাভূমিতে হাওয়া উঠলেই যদি ঈষৎ পূর্বের

পদক্ষেপের চিহ্নগুলি ধুয়ে-মুছে যায় তাহ'লে বাঁচার কি অর্থ হয়? একটা লোক এখানে ত্রিশ কি চল্লিশ বছর ধ'রে নিশ্বাস টেনেছে, লেখাপড়া করেছে, চিন্তা করেছে এবং এই স্বল্প-পরিসর ঘরটিতে ব'সে আলাপ-আলোচনা করেছে —অথচ মাত্র তিন-চার বছরের ব্যবধানে আজ দেখছি হঠাৎ যেন মিশরদেশে এক নতুন রাজার উদ্ভব হ'ল, যোসেফকে কেউ জানল না। কাফে গ্লুক-এর একটি লোকও যাকোব মেণ্ডেলের নামটা স্মরণ করতে পারল না। একটু বিরক্ত হ'য়েই হেড-ওয়েটারকে বললুম, "মিস্টার স্ট্যাণ্ডহার্টনের কি বা তার কোনো পুরনো কর্মচারীর সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।" "মিস্টার স্ট্যাণ্ডহার্টনের? যিনি এখানকার মালিক ছিলেন আগে? তিনি তো বহুদিন আগে এই কাফেটা বেচে দিয়েছেন। এখন তো তিনি বেঁচেও নেই। আর আগে যে হেড-ওয়েটার ছিল সেও কাজ থেকে অবসর নিয়েছে। টাকাও জমিয়েছিল যথেষ্ট। জায়গা জমি কিনে এখন সে ক্রিমসে বাস করছে। পুরনো আমলের কেউ আর নেই এখানে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে সবাই। তবে হ্যাঁ, সেই বৃদ্ধাটি, মিসেস স্পারশিল এখনো রয়েছেন এখানে। আমি জানি তিনি এখানে বহুদিন ধরে কাজ করছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, তিনিও বোধ হয় মিস্টার মেণ্ডেলের নামটা স্মরণ করতে পারবেন না। আজকাল লোক দেখলেও চিনতে পারেন না তিনি।"

নিজের মনে মনেই প্রতিবাদ করলুম আমি যাকোব মেণ্ডেলকে কেউ অত সহজে ভোলে না।

কিন্তু হেড-ওয়েটারকে বললুম, "ছাখো, তবু আমি একবার বৃদ্ধাটির সঙ্গে কথা বলতে চাই। অবিশ্যি তাঁর যদি সময় থাকে তবেই।"

এই সময় বৃদ্ধাটি দেখলুম তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে নীচুতলার ঘর থেকে ওপরে উঠে এল। মাথাভরা সাদা চুল, বয়েসের ভারে ভেঙেচুরে জবুথবু হয়ে গিয়েছে। বুঝতে পারলুম, ময়লা পরিষ্কারের কাজ থেকে তাকে ডেকে আনা হল। সেইজন্যেই কাফের এই আলোকিত ঘরটিতে হঠাৎ এসে উপস্থিত হওয়ায় অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। চাকরবাকররা জানে যে, পুলিশরা যখন কোনো কিছু তদন্তের জন্যে আসে তখনই কর্তারা তাদের ডেকে পাঠান। ভিয়েনার সাধারণ মানুষদের মনে এই ধারণাটা এখনো বদ্ধমূল হ'য়ে আছে। সন্দেহজনকভাবে বৃদ্ধাটি তাই আমার দিকে দৃষ্টি দিল

একবার। কিন্তু যখনই যাকোব মেণ্ডেলের কথা জানতে চাইলুম আমি তখনই সে সোজাভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল বটে, কিন্তু চোখ দুটি তার অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে গেল। সখেদে ব'লে উঠল সে, "আহা বেচারী মেণ্ডেল তাহ'লে দেখছি তাকে মনে ক'রে রাখবার মতো এখনো কেউ আছে?"

সাধারণত দেখা যায় যে, কেউ যদি বৃদ্ধলোকদের কাছে তাদের অতীতের কথা উল্লেখ করে তাহ'লে তারা ভাবাবেগে অস্থির হ'য়ে ওঠে। আমি জিজ্ঞেস করলুম যে, যাকোব মেণ্ডেল এখনো বেঁচে আছে কিনা। বৃদ্ধাটি জবাব দিল, "আহা, সে বেঁচে নেই। পাঁচ-ছ' বছর আগে সে মারা গিয়েছে। পাঁচ-ছ' বছর কেন, পুরো সাত বছরই হ'ল। কি ভালো মানুষই না ছিল সে। আমি তাকে চিনতুম পঁচিশ বছরেরও বেশি। আমি এখানে কাজে লাগবার আগে থেকেই সে ঐ টেবিলটাতে ব'সে পড়াশোনা করত। শেষ পর্যন্ত কি বিশ্রীভাবেই না মারা গেল—এরা একটুও গা করল না। সত্যিই, লজ্জার কথা।"

কথা বলতে বলতে ক্রমশই উত্তেজিত হ'য়ে উঠতে লাগল বৃদ্ধাটি। তারপর জানতে চাইল, আমি তার আত্মীয় কিনা। কোনোদিনও তার সম্বন্ধে কাউকে খোঁজখবর নিতে সে দেখেনি। তার অবস্থার কথা কি আমি জানি না? বললুম, "না। দয়া ক'রে আপনি আমায় বলুন।"

ভয়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল সে, আর সেই সঙ্গে তোয়ালে দিয়ে ভেজা হাতটা মুছতেও লাগল। আমি বুঝতে পারলুম, কাফের এই ভদ্র-জনতার সামনে অপরিষ্কার কাপড়চোপড় প'রে দাঁড়িয়ে থাকতে তার লজ্জা হচ্ছিল খুব। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল, কোনো চাকরবাকররা আশপাশ থেকে তার কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে কিনা।

বললুম, "চলুন, তাস খেলবার ঐ ছোট ঘরটাতে গিয়ে বসি। ওটাই তো মেণ্ডেলের সেই পুরনো জায়গা। ওখানে ব'সেই তার কাহিনীটা আপনি বলুন।"

রাজী হ'ল বৃদ্ধাটি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশও করল। তারপর আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল আমায়। দেখলুম, চলনভঙ্গিতে তার বয়েসের ছাপ পড়েছে। লক্ষ্য করলুম, কাফের ওয়েটার এবং খদ্দেররা সবাই আমাদের মতো

এক জোড়া অদ্ভুত মানুষের দিকে চেয়ে রয়েছে। আমরা সেই মার্বেলে মোড়া টেবিলটাতে গিয়ে মুখোমুখি হ'য়ে বসলুম। সেইখানে ব'সে বৃদ্ধাটি যাকোব মেণ্ডেলের মৃত্যুর কাহিনীটা বলতে লাগল। তার কথাতেই কাহিনীটা বিবৃত করব আমি। পরে অন্য জায়গা থেকেও দু-চারটে খবর যা জানতে পেরেছিলুম তাও জুড়ে দেব এই সঙ্গে।

"মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই যাকোব মেণ্ডেল এখানে আসত। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে ঐ টেবিলে ব'সে তন্ময় হ'য়ে পড়াশোনা করত সারা দিন। আমাদের ধারণা, মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার ব্যাপারটা সে জানত না। তার কারণ, সে কখনো খবরের কাগজ পড়ত না। বই-এর আলোচনা ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে দ্বিতীয় কোনো বিষয় সম্বন্ধে কথাবার্তা কইত না সে। এমনকি খবরের কাগজের হকাররা যখন রাস্তা দিয়ে চ'লে যেত আর চিৎকার ক'রে বলত 'পূর্ব সীমান্তে বিরাট যুদ্ধ' কিংবা 'ব্যাপক হত্যাকাণ্ড' তখন সেই দিকে কর্ণপাতও করত না যাকোব মেণ্ডেল। জটলা পাকিয়ে সবাই যখন যুদ্ধ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করত তখনও সে নিজের জগৎটুকুর মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে থাকত। কাফের সেই বিলিয়ার্ড মার্কার ফ্রিট্জ ব'লে যে লোকটি ছিল সে যে যুদ্ধে মারা গিয়েছে তেমন খবরও তার জানা ছিল না। মিস্টার স্ট্যাণ্ডহার্টনের-এর ছেলে রুশদের হাতে যে বন্দী হয়েছে তাও কি সে জানত? জানত না। যুদ্ধের সময় রুটির শুধু পরিমাণ কমল না, ক্রমে ক্রমে অখাদ্য হ'য়ে উঠল দুধের দুষ্প্রাপ্যতার জন্যে দিতে হ'ল নিকৃষ্ট ধরনের কফি—কিন্তু মেণ্ডেলের মুখ থেকে এক দিনের জন্যেও একটা অভিযোগও কেউ শোনেনি। এইসব পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে একবার শুধু সে একটু বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। জানতে চেয়েছিল, কাফেতে আজকাল ছাত্ররা আসে না কেন। একমাত্র বই ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো জিনিসই তার মনের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারত না।

"তারপরেই আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘ'টে বসল। একদিন সকালবেলা, প্রায় এগারোটা নাগাদ দু'জন পুলিশের লোক এসে উপস্থিত হ'ল। একজন এল সাদা কাপড়ে, অন্যজন অবিশ্যি পুলিশের পোশাক প'রেই এসেছিল। সাদা কাপড় পরা লোকটি জিজ্ঞাসা করল, এখানে যাকোব মেণ্ডেল ব'লে কেউ আছে কিনা। মেণ্ডেলের সামনে গিয়েই তারা দাঁড়িয়েছিল। বেচারী

মেণ্ডেল কি সবল প্রকৃতিব মানুষই না ছিল। সে ভাবল. এবা নিশ্চযই পুবনো বই বিক্রি করতে এসেছে। কিংবা হযতো কোনো জরুবী খবর জানতে চায। কিন্তু তা তো হ'ল না—ওবা তক্ষুনি মেণ্ডেলকে গ্রেপ্তাব ক'বে নিযে চ'লে গেল। বলো তো আমাদেব এই কাফেব পক্ষে কত বড কলঙ্কেব কথা। যাবা এখানে খেতে এসেছিল তাবা সবাই মেণ্ডেলকে ঘিবে দাডাল। দু'জন পুলিশেব মাঝখানে দাঁডিযেছিল সে। চশমাটা নডে-চ'ডে ওপব দিকে উঠে গিযেছে, অবাক হ'যে চেযে চেযে দেখছে সবাব দিকে। কেউ কেউ পুলিশেব এই কাজেব বিকদ্ধে প্রতিবাদ কবল। বলল তাবা যে, নিশ্চযই কোথাও কেউ ভুল কবেছে। মিস্টাব মেণ্ডেল একটা পোকামাকডেব পযন্ত ক্ষতি কববে না। কিন্তু ডিটেকটিভটি বেগে উঠল তাতে। বেগে উঠে বলল যে, খদ্দেববা যদি এখন নিজেদেব চবকায তেল দেয তাহ'লেই সে খুশি হবে। ওবা সত্যি সত্যি মেণ্ডেলকে নিযে চ'লে গেল। দু' বছব পযন্ত আমবা আব তাকে দেখতে পেলুম না। আমি নিজে কোনোদিনও জানতে পাবলুম না, তাব বিরুদ্ধে পুলিশেব অভিযোগটা কি। কিন্তু আমাব ষোল আনা বিশ্বাস পুলিশবা ভুল কবেছে। মিস্টাব মেণ্ডেল কখনই অন্যায কবতে পাবে না। এমন একজন নিবপবাধ মানুষকে লাঞ্ছনা দেওযাব মতো পাপ সংসাবে আব কি আছে।"

বৃদ্ধাটি সত্যি কথাই বলেছে। আমাদেব বন্ধু যাঁকোব মেণ্ডেল অন্যায কবতে পাবে না। তবে আমি জেনেছিলাম যে, সাংঘাতিক নির্বুদ্ধিতাব কাজ কবেছিল সে। অবিশ্যি তাব চাবিত্রিক বিশেষত্বগুলি যাদেব জানা ছিল তাদেব পক্ষে এটা বুঝতে পাবা কঠিন ছিল না। তাব একটা লেখা পোস্টকার্ড সামবিক বিভাগেব হাতে পডে। চিঠিখানা সে লিখেছিল প্যাবীসেব এক লাইব্রেবিব লাইব্রেবিযানেব কাছে। অতএব শক্রপক্ষেব সঙ্গে যোগাযোগ বাখাব অপবাধ কবেছে সে। লেখক চিঠিতে অভিযোগ কবেছে যে, এক বৎসবেব পুবো চাঁদা আগাম দেওযা সত্ত্বেও সে গত আট মাস থেকে ফবাসীদেশেব মাসিক কাগজ 'পুস্তক বিবরণী' পাচ্ছে না। যে-শিক্ষকটি তখন সামবিক বিভাগেব সেনস্যার-অফিসে কাজ কবছিল তাব হাতে এই চিঠিখানা পডে। চিঠি প'ডে সে তো প্রথমে ভীষণভাবে অবাক হ'যে গেল। তাবপব ভাবল, লোকটি নিশ্চযই ঠাট্টা কবেছে। প্রতি সপ্তাহে

হাজার দুই চিঠি তাকে পরীক্ষা ক'রে দেখতে হয়। প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হয়, গুপ্তচররা কোনো খবরাদি পাঠাচ্ছে কিনা। কিন্তু এই পোস্টকার্ডখানার মতো একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার আজ পর্যন্ত তার নজরে পড়েনি। অষ্ট্রিয়ার একজন নাগরিক অত্যন্ত নির্বিকারভাবে সরকারী চিঠির বাক্সে একটা পোস্টকার্ড ফেলে দিয়েছে। এবং সেটা লিখেছে একজন শত্রুপক্ষের লোকের কাছে! উনিশ শো চোদ্দ সাল থেকে যে রাশিয়া আর ফরাসীদেশের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই, এবং পূর্ব আর পশ্চিম সীমান্তে যে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে আর অসংখ্য ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছে তেমন ছোটখাট খবরগুলিও এই পত্রলেখকটির জানা নেই। সে জানে না, সেইসব ট্রেঞ্চগুলিতে সশস্ত্র সৈনিকরা কুকুর-বিড়ালের মতো মানুষ মারবার চেষ্টা করছে দিনরাত। এই অফিসারটি তাই পোস্টকার্ডখানার উপর কোনো গুরুত্বই আরোপ করল না। কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠিটা পেশ না ক'রে সে রেখে দিল একটা আলাদা জায়গায়। সে মনে করল, এ একটা অদ্ভুত জিনিসের নমুনা। তারপর কয়েক সপ্তাহ পরে আবার একটা পোস্টকার্ড হাতে পড়ল তার। এবারেও পত্রলেখক সেই যাকোব মেণ্ডেল। লিখেছে লণ্ডনের ঠিকানায় জন অল্‌ডরিজ নামে এক পুস্তক বিক্রেতার কাছে। লেখকটি জানতে চেয়েছে যে, 'অ্যান্‌টিকোয়েরিয়ান' নামে কাগজটার গত কয়েকটা সংখ্যা সে ভিয়েনায় পাঠিয়ে দিতে পারে কিনা। তার ভিয়েনার ঠিকানাটাও যাকোব মেণ্ডেল পোস্টকার্ডে পরিষ্কারভাবে লিখে দিয়েছে।

সামরিক বিভাগের পত্র-পরিদর্শকটি এবার একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এ কি তার ক্লাশের ছেলেরা মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ারকি করছে? কিংবা পোস্টকার্ডের ভাষায় গুপ্ত খবর বিতরণ করছে না তো কেউ? অসম্ভব নয়। এই ভেবে সে গেল তার উর্ধ্বতন অফিসারের কাছে। জুতোয় জুতো ঠেকিয়ে সামরিক কায়দায় স্যালুট করল। এবং তারপর সন্দেহজনক দলিল দুটো পেশ করল 'আইনানুসারে গঠিত যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের' সামনে। টেলিফোনযোগে তক্ষুনি পুলিশকে আদেশ দেওয়া হ'ল খুঁজে দেখতে যে, যাকোব মেণ্ডেল ব'লে সত্যিই কেউ ঐ ঠিকানায় আছে কিনা। থাকলে, তাকে নিয়ে আসতে হবে এখানে। এক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার করা হ'ল। সামরিক কর্মচারীটি ছিলেন একজন মেজর। অত্যন্ত রূঢ়ভাবে

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে পোস্টকার্ডখানা তারই লেখা কিনা। সামরিক কর্মচারীটির রূঢ়তায় রেগে গেল মেণ্ডেল। রেগে যাওয়ার আরও বড় কারণ ছিল। সে ভাবল, চিঠিখানা তাহ'লে এরা ধ'রে রেখেছে। একটা জরুরী ক্যাটালগ প্যারীস থেকে আনাতে চেয়েছিল সে। এখন তাতে বাধা পড়ল। মেণ্ডেল তাই তিক্ত স্বরে জবাব দিল, "নিশ্চয়ই, চিঠিখানা আমিই লিখেছি। ওটা আমারই হাতের লেখা এবং স্বাক্ষরও আমার। মানুষ কি পয়সা দিয়ে একটা সাময়িকপত্রও আনাতে পারবে না?"

মেজরটি ঘুরে ব'সে তাঁর সহকারীর সঙ্গে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় করলেন। ভাবখানা এই, "দেখেছ, লোকটা কত বড় গর্দভ!"

তারপর সামরিক কর্মচারীটি ভাবলেন একে নিয়ে কি করা যায়। ভবিষ্যতে সাবধান হওয়ার জন্যে শুধু একটা ধমক দিয়ে ছেড়ে দেবেন, নাকি ব্যাপারটার আরও ব্যাপক অনুসন্ধান করবেন তিনি। সাধারণত এইসব ক্ষেত্রে যখন সন্দেহের উদ্রেক হয় তখন অন্ধকারে ঢিল না ছুঁড়ে একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয় উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে। তাতে এঁদের আর দায়িত্ব থাকে না। রিপোর্টের ফল ভাল না হ'লেও, অন্তত খারাপ হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে না। লক্ষ লক্ষ অপ্রয়োজনীয় কাগজের টুকরোর মতো এটাও প'ড়ে থাকবে কোনো একটা ফাইলে।

দুঃখের বিষয়, মেণ্ডেল সম্বন্ধে রিপোর্ট পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে ফলটা ভালো হ'ল না। এই নিরপরাধ মানুষটির ক্ষতিই হ'ল। জেরা করতে গিয়ে সন্দেহজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হ'য়ে পড়ল।

প্রশ্ন করলেন তিনি, "তোমার পুরো নাম কি?'

"যাকোব মেণ্ডেল।"

"জীবিকার সংস্থান কি?"

"বই ফিরি করি।" (মেণ্ডেলের দোকান ছিল না। ফেরিওয়ালার লাইসেন্স ছিল)

"জন্মস্থান?"

এই প্রশ্নের পরেই বিপদের শুরু। মেণ্ডেলের জন্মস্থান ছিল পেট্রিকাউ ব'লে একটা জায়গার সন্নিকটে। নামটা শুনে মেজর এবার মুখ তুলে চেয়ে রইলেন মেণ্ডেলের দিকে। কারণ, পেট্রিকাউ ছিল রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত

পোল্যাণ্ড অঞ্চলে। তিনি বললেন, "তুমি তাহ'লে রাশিয়ার প্রজা? কবে থেকে তুমি অস্ট্রিয়ার নাগরিক অধিকার লাভ করলে? এই সম্পর্কে তোমার কাগজপত্র সব দেখাও।"

পরিস্থিতির গুরুত্ব বোধগম্য হ'ল না মেণ্ডেলের। চশমার তলা দিয়ে সে অফিসারের দিকে চেয়ে বললে, "না, প্রমাণ করবার মতো কাগজপত্র আমার কিছু নেই। যা আছে তা ঐ ফিরিওয়ালার লাইসেন্স।"

"তাহ'লে তুমি কোন্ দেশের লোক? তোমার বাবা কি ছিলেন, অস্ট্রিয়ান, না রাশিয়ান?"

বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করল না মেণ্ডেল। সে জবাব দিল, "তিনি রাশিয়ান ছিলেন।"

"তুমি কি?"

"রুশ সৈন্যবাহিনীর কাজ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে তেত্রিশ বছর আগে আমি সীমান্ত অতিক্রম করে পালিয়ে এসেছি। সেই থেকে ভিয়েনাতেই বাস করছি।"

ব্যাপারটা ক্রমশই জটিল হ'য়ে পড়ছে বলে ভাবলেন মেজর সাহেব। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি অস্ট্রিয়ার বাসিন্দে হওয়ার জন্যে চেষ্টা করোনি?"

"না। এসব বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাইনি।"

"তাহ'লে এখনো রাশিয়ার প্রজা তুমি?"

প্রশ্নের যেন ঝড় বইতে লাগল। বিরক্ত বোধ করল মেণ্ডেল। তাই সে সরলভাবে শুধু বলল, "হ্যাঁ, তাহ'লে বোধ হয় আমি রাশিয়ারই প্রজা।"

মেজর সাহেবটি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। এবং ক্রোধোন্মত্ত হয়ে এমনভাবে চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে বসলেন যে, চেয়ারের কাঠ ভেঙে পড়ে আর কি।

সহকারী কর্মচারীটি উঠে পড়লেন। এগিয়ে এলেন মেজর সাহেবের কাছে। এতক্ষণ পর্যন্ত আলাপ আলোচনাটা খুব সহজভাবেই হচ্ছিল। এবার সেটা গুরুগম্ভীর হয়ে উঠল। যেন সামরিক আদালতে বিচার হচ্ছে। মেণ্ডেলকে ওঁরা প্রশ্ন করলেন, "যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর দেশের লোক বলে তুমি কেন আমাদের কাছে রিপোর্ট করোনি?"

মেণ্ডেল তবু বুঝতে পারল না যে, পরিস্থিতিটা অত্যন্ত গুরুতর হ'য়ে উঠেছে। তাই সে ইহুদীসুলভ দুর্বোধ্য ভাষায় জবাব দিল, "রিপোর্ট কেন করব বুঝতে পারছি না।'

মেজর সাহেবটি এবার রেগে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "সর্বত্র যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে তা কি তুমি ছাখোনি?"

"না।"

"তুমি খবরের কাগজ পড়ো না?"

"না।"

এবার দু'জন অফিসারই যাকোব মেণ্ডেলের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন পশ্চিম দিগন্তে সূর্য উঠতে দেখলেন এরা। অস্বস্তির উত্তাপে দু'জনাই ঘেমে উঠেছেন। তারপর ঘন ঘন টেলিফোনটা বাজতে লাগল। টাইপ রাইটার মেসিনে চিঠি টাইপ হচ্ছে। সেপাইসান্ত্রীরা এদিক-ওদিকে ছোটাছুটি করছে—হৈ চৈ ব্যাপার। সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত হ'য়ে মেণ্ডেল চ'লে গেল ব্যারাকে। সেখান থেকে তাকে বন্দীশালায় চালান দেওয়া হবে। যখন প্রহরীদের সঙ্গে চ'লে যাওয়ার আদেশ পেল মেণ্ডেল তখন সে একটু হকচকিয়ে গেল বটে, কিন্তু উদ্বিগ্ন হল না। সে শুধু ভাবলে, অমন সুন্দর পোশাক-পরা রূঢ়ভাষী লোকটি তার বিরুদ্ধাচরণ করছে কেন? কি অপরাধ করল সে? গ্রন্থজগতের মানুষ মেণ্ডেল। সেখানে না আছে যুদ্ধবিগ্রহ, না আছে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ। সেটা তো লেখক, বই, আর তার দামের তালিকা দিয়ে তৈরি জগৎ। প্রহরী পরিবেষ্টিত হ'য়ে সে বেশ প্রফুল্ল মনেই নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। তারা ওকে প্রথম থানায় নিয়ে গেল। সেখানে পুলিশরা তার ওভারকোটের পকেট থেকে বইগুলো বার ক'রে ফেলল। পোর্টফোলিওতে শত কাগজের টুকরো। তাতে হাজার রকমের নোট লেখা ছিল, স্মারকলিপি। তা ছাড়া খদ্দেরদের নাম-ঠিকানাও ছিল অনেক। পুলিশ যখন সেগুলোও টেনে টেনে বার করতে লাগল তখন তার মেজাজ গেল বিগড়ে। সে প্রতিবাদ করতে লাগল। ঘুষি বাগিয়ে উঠল মেণ্ডেল। দড়ি দিয়ে হাত দুটো বেঁধে ফেলল তার। হাতাহাতির সময় চশমাটা প'ড়ে গেল মাটিতে। চশমার কাঁচ দুটো ছিল তার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মতো। তার মধ্য দিয়ে সে চেয়ে থাকত গ্রন্থজগতের বিস্ময়াবৃত নিগূঢ়রহস্যের দিকে। এখন

সেই কাঁচ দু'খানা ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল। দু'দিন পরে দীনহীন-ভাবে জীর্ণ বস্ত্রে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল বন্দীশালায়।

বন্দীশালার দুটো বছর কত লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে যে তাকে কাটাতে হয়েছে তার সংবাদ আমি রাখি না। বই-এর জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে, নিঃস্ব লোকটি কি কষ্টেই যে একগাদা অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে সময় কাটিয়েছে তার খবরই বা আমি পেলুম কই। অবিশ্যি যাঁরা খাঁচায় আবদ্ধ ঈগলপক্ষীর মর্মযাতনার কথা বুঝতে পারেন তাদের পক্ষে মেণ্ডেলের কষ্টের কথা কল্পনা করা কঠিন হবে না।

এখন তো যুদ্ধ থেমে গিয়েছে। ক্রমে ক্রমে আমাদের বিবেচনাবুদ্ধিও ফিরে আসছে। যুদ্ধের সময় কত রকমের নিষ্ঠুরতা আমরা দেখেছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে, কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে একগাদা মানুষকে পশুর মতো আবদ্ধ ক'রে রাখার নিষ্ঠুরতাকে ক্ষমা করা যায় না। তা ছাড়া এদের তো যুদ্ধে যোগ দেওয়ার বয়েসও ছিল না। পরের দেশে এসে ঘর বেঁধেছে এরা। সময়মতো এদেশ ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতেও পারত। ত্যাগ করবার অধিকার ওদের ছিল। কিন্তু সরল বিশ্বাসে আশ্রয়দাতার ওপর নির্ভর ক'রে ছিল ব'লেই তো ত্যাগ করবার কোনো প্রশ্ন ওঠেনি।

বিকৃতমস্তিষ্ক ইয়োরোপের যুদ্ধরত প্রত্যেকটা দেশই, ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং জারমেনি সভ্যতার বিরুদ্ধে এই গুরুতর অপরাধ করেছে। হাজার হাজার নিরপরাধ লোক অনুরূপ অবস্থায় প'ড়ে যেমন পাগল হ'য়ে গেছে, অসুখ-বিসুখে ম'রেও গেছে যাকোব মেণ্ডেলও তেমনি ম'রে যেতে পারত, কিংবা পাগল হ'য়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। অবস্থা চরমে পৌঁছবার পূর্বমুহূর্তে মুক্তি পেল সে। ব্যাপারটা ঘটল নেহাতই দৈবক্রমে। অস্ট্রিয়ায় ফিরে গিয়ে আবার সে স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ পেয়েছিল।

মেণ্ডেল নিখোঁজ হ'য়ে যাওয়ার পরে কাফে গ্ল,ক-এর ঠিকানায় তার নামে অনেকগুলো চিঠি এল। চিঠিগুলো লিখেছেন মেণ্ডেলেরই খদ্দেররা। এঁরা ছিলেন দেশের সব বিশিষ্ট ব্যক্তি। যেমন কাউণ্ট শোনবের্গ। একসময়ে তিনি স্টাইরিয়ার লর্ড-লেফটেনাণ্ট ছিলেন। পুরনো আমলের বইপত্র সংগ্রহের প্রতি ঝোঁক ছিল তার। তারপর এই সম্পর্কে জিগেনফেল্টের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করতেন। তখন তিনি

সেণ্ট অগাস্টিনের গ্রন্থাবলীর ওপর নিজের টীকা সংবলিত বই লিখছিলেন। তার খদ্দেরদের মধ্যে ছিলেন এডলার ফন পিসেক। অবসরপ্রাপ্ত নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল, বয়েস আশি বছরের ওপর। তিনি লিখছিলেন আত্মস্মৃতি। এঁরা সবাই চিঠিতে বুখ্‌মেণ্ডেলের কাছ থেকে নানারকমের খবর চেয়ে পাঠিয়েছেন। কোনো কোনো চিঠি তার বন্দীশালার ঠিকানায় পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থাও হ'ল। বন্দীশিবিরের সেনাপতির হাতে চিঠিগুলো পড়ল। তিনি ছিলেন দয়ালু প্রকৃতির মানুষ। পত্রলেখকদের নামগুলি দেখে তিনি তো অবাক। এইসব অতিপ্রসিদ্ধ লোকেরা চিঠি লিখেছেন ঐ একটা নগণ্য এবং নোংরা রাশিয়ান ইহুদীটার কাছে। তাও আবার লোকটাকে প্রায় অন্ধ বললেও চলে। চশমাটা ভেঙে গেছে, কেনবার পয়সাও নেই—চক্ষুহীন, বোবা এবং গন্ধমুষিকের মতো প'ড়ে থাকে ঘরের এক কোনায়। সেনাপতি ভাবলেন, যার মাথার ওপরে এত বড় বড় সব মুরুব্বি রয়েছেন, তার চেহারা যত খারাপই হোক না কেন, সে নিশ্চয়ই বাজে লোক নয়। সেনাপতি তখন চিঠিগুলো মেণ্ডেলকে প'ড়ে প'ড়ে শোনাতে লাগলেন। তার হ'য়ে তিনি নিজেই জবাব লিখে দিলেন। মেণ্ডেলকে শুধু সই করতে হ'ল। জবাবের মধ্যে মূল বক্তব্য রইল যে, ওপরওয়ালাদের ধরে তার মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এতে কাজ হ'ল খুব। ওরা সবাই দল বেঁধে পেছন থেকে ঘুটি নাড়াতে লাগলেন। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মেণ্ডেল ভবিষ্যতে কোনো ক্ষতি করবে না ব'লে এঁরা সবাই জামিন দাঁড়ালেন। উনিশ শো সতেরো সালে বুখ্‌মেণ্ডেল ফিরে এল ভিয়েনায়। সর্ত রইল শুধু যে, প্রতিদিন একবার ক'রে থানায় গিয়ে সে হাজিরা দিয়ে আসবে। এই সর্তটি মেনে নিতে তার অসুবিধে নেই কিছু। সে যে আবার তার স্বাধীনতা ফিরে পেল সেইটেই বড় কথা। আবার গিয়ে সে তার চিলেকোঠার পুরোন আস্তানায় বাস করতে পারবে, বই-এর জগতে ডুবে থাকতে পারবে—সর্বোপরি, কাফে গ্লুক-এর টেবিলে গিয়ে যে আবার সে বসবার স্বাধীনতা পেল সেই কথা ভেবে খুশি হ'ল মেণ্ডেল। এবার আমি বৃদ্ধার নিজের কথাতেই মেণ্ডেলের ফিরে আসবার কাহিনীটা ব্যক্ত করছি

"একদিন দেখলুম কাফের দরজাটা একটু ফাঁক হ'য়ে গেল। (তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে কি অদ্ভুতভাবেই না সে ঘরে প্রবেশ করত) নিজের

চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি, দরজার সেই ফাঁক দিয়ে সত্যি সত্যি যাকোব মেণ্ডেলই কাত হ'য়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। বেচারী মেণ্ডেল! সৈনিকদের বহুব্যবহৃত একটা জীর্ণ তালি-দেওয়া কোট গায়ে পরেছে সে। মাথায় যা লাগিয়েছে তাকে আর টুপি বলা চলে না। এক সময়ে এটা টুপিই ছিল। কিন্তু ছিঁড়ে গিয়েছে বলে কেউ হয়তো ফেলে দিয়েছিল রাস্তায়। মেণ্ডেল সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় লাগিয়েছে। শার্ট পরেছে, তাতে কলার নেই। মাথার চুল অনেক ক'মে গিয়েছে। কৃশকায়। এত বেশি শুকিয়ে গেছে যে, মনে হয়, যমের ঘরে পৌছতে আর দেরি নেই বুঝি। কিন্তু এমনভাবে সে ঘরে এসে ঢুকল যেন কিছুই তার হয়নি। সোজা গিয়ে ব'সে পড়ল তার সেই চিরপরিচিত টেবিলটার পাশে। একটু যেন হাপাতেও লাগল। একটা কথাও সে বলল না। চেয়ে রইল সামনের দিকে। প্রাণহীন চোখ দুটোতে শুধু হতাশার শূন্যতা। আমরা যখন তার চিঠি এবং ছাপা কাগজপত্র সব এনে তার সামনে হাজির করলাম তখন সে ধীরে ধীরে আবার পড়তে লাগল বটে, কিন্তু দেখলুম, আগের সেই পুরনো মানুষটি আর নেই।"

সত্যিই তাই। যে ফিরে এল সে অন্য মানুষ—সেই অত্যাশ্চর্য জীবন্ত পুস্তক-তালিকাটি উধাও। অন্যান্য যারা তাকে ঐ সময়ে দেখেছিল তারাও সবাই আমার কাছে এই একই করুণ-কাহিনী ক্রমে ক্রমে ব'লে যেতে লাগল। কি যেন একটা চিরজন্মের মতো হারিয়ে এসেছে সে। ভেঙেচুরে একাকার হ'য়ে গিয়েছে। তার বই-এর জগতের প্রশান্ত নির্জনতার মধ্যে ঢুকে পড়েছে মহাযুদ্ধের বহ্নিশিখা। যে চোখ দিয়ে মেণ্ডেল সারা জীবন মুদ্রিত অক্ষর ছাড়া আর কিছুই দেখেনি, সেই চোখ দিয়ে সে গত দুটো বছর নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি মানুষের বর্বর ব্যবহারের লক্ষ দৃষ্টান্ত দেখে এসেছে। আগের সেই সতর্ক এবং বিদ্রূপাত্মক চোখ দুটি আর নেই - জোড়াতালি দেওয়া চশমার তলায় নিষ্প্রভ হ'য়ে আছে। মনে হয়, ঘুমে বুঝি চোখ ভেঙে আসছে। এর চেয়েও মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটল তার স্মৃতি শক্তির ব্যাপারে। কোথায় কেমন ক'রে একটা কবজা খোয়া যাওয়ার জন্যে তার ঐ অত্যাশ্চর্য স্মৃতিশক্তির যন্ত্রটা বিকল হ'য়ে গেছে পুরোপুরি-ভাবে। কেউ কোনো বই জানবার জন্যে প্রশ্ন করলে সে উদাস দৃষ্টিতে

চেয়ে থাকত প্রশ্নকারীর দিকে। প্রশ্নটার অর্থ তার মাথায় ঢুকত না। এমনকি জবাব খোঁজবার আগে প্রশ্নটাই ভুলে যেত সে। মেণ্ডেল আর সেই বুখ্‌মেণ্ডেল নেই। আগের পৃথিবীটাও লুপ্ত হয়ে গিয়েছে আজ। পড়ার মধ্যে ডুবে যেতে পারে না। আগে যেমন দুলে দুলে বই পড়ত তেমন আর পড়ে না এখন। সোজা হ'য়ে বসে। বই-এর দিকে চোখ থাকে বটে, কিন্তু পড়ে না। মনে হয়, ডুবে রয়েছে ভাবাচ্ছন্নতায়। বৃদ্ধাটি বলল, প্রায়ই মাথাটা তার হেলে পড়ত খোলা বইটার ওপর—দিনের বেলাতেই ঘুমিয়ে পড়ত সে। কিংবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকত আলোর দিকে। না, মেণ্ডেল আর সেই সাবেক দিনের বুখ্‌মেণ্ডেল নেই। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যটি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল। এখন শুধু একটা নোংরা, পরাশ্রয়ী, অপ্রয়োজনীয় এবং অস্পৃশ্য বস্তুর মতো প'ড়ে রইল এইখানে। কাফে গ্লুক-এর গৌরব ব'লে আর পরিগণিত হ'ল না।

কাফের নতুন মালিক ফ্লোরিয়ান গুর্টনের তাকে এইরকমই ভাবত। যুদ্ধের বাজারে সে ময়দা আর মাখন বিক্রি ক'রে পয়সা কামিয়েছে। স্তোকবাক্য দিয়ে সে অতি শস্তায় এটা কিনেছে মিস্টার স্ট্যাণ্ডহার্টনের-এর কাছ থেকে। কেনবার পরেই গুর্টনের এটাকে নতুন ক'রে সাজাবার ব্যবস্থা করল। দামী দামী কাপড় দিয়ে বসবার জায়গাগুলো মুড়ে দিল। ঘরের সামনে মার্বেল পাথরের গাড়িবারান্দা তৈরি করল। পাশের বাড়িতে একটা নৃত্যগীতের জায়গা পাওয়া যায় কিনা তার জন্যে কথাবার্তা চালিয়েছে নতুন মালিক। অতএব এই সুন্দর পরিমার্জিত পরিবেশে এমন একজন নোংরা ইহুদীর উপস্থিতি যে তার পছন্দ হবে না তা তো জানা কথা। তা ছাড়া সে জানত যে, যুদ্ধের সময় কর্তৃপক্ষ লোকটিকে সন্দেহ করত। এবং এখনো তাকে 'শত্রুপক্ষের লোক' ব'লেই ভাবা উচিত। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটা টেবিল সে দখল ক'রে ব'সে থাকে। অন্তত দু' পেয়ালা কফি তো খায়ই. এর ওপর কিছু খাবারও তাকে দিতে হয়। আগের মালিকের কাছে মেণ্ডেলের দাম ছিল। তিনি কখনোই তাকে লোকসানের খদ্দের ব'লে ভাবতেন না। সবাইকে ব'লে রেখেছিলেন যে, তাঁর এই পুরনো খদ্দেরটি সাধারণ লোক নয়। অতএব লাভক্ষতির কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কাফে গ্লুক-এর ওপর তাঁর ম্যাগোরনের অধিকার

জ'ন্মে গেছে। কিন্তু ফ্লোরিয়ান গুর্টনের-এর নতুন ব্যবস্থায় ঘরের সৌন্দর্যই শুধু বৃদ্ধি পায়নি, সে একটি ক্যাশ-রেজিস্টার মেসিনও বসিয়েছে। প্রতিটি লাভের পয়সা ঘরে তোলবার মনোবৃত্তি তার প্রবল। অতএব তার এই আধুনিক রুচিসম্মত কফি-হাউস থেকে মেণ্ডেলের মতো গেঁয়ো জঞ্জালটিকে উৎখাত করবার ছুতো খুঁজছিল সে।

ছুতো খুঁজে বার করতে তার দেরি হ'ল না। যাকোব মেণ্ডেল একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে গিয়েছিল। যে ক'টা টাকা তার কাছে ছিল, মুদ্রাস্ফীতির দরুন তার মূল্য গেল কমে তার পুরনো খদ্দেরদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধে মারা গিয়েছে, কেউ কেউ সর্বস্বান্ত হ'য়ে বসেছে, বাকি ক'জনা ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। আগের মতো বই ফিরি ক'রে কেনা-বেচা শুরু করেছিল সে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু বই ঘাড়ে নিয়ে ওপর-নিচ করবার আর তার শক্তি ছিল না। সবাই বুঝতে পারল, সে কপর্দকশূন্য হ'য়ে গিয়েছে। বাইরের রেস্তোঁরা থেকে দুপুরের খাবার আসত তার। এখন সেটা বন্ধ হ'য়ে গেল। কাফে গ্লুক-এ ব'সে একটু আধটু যা খেত তারও দাম বাকি পড়তে লাগল। একবার তো তিন সপ্তাহেরটাই বাকি প'ড়ে গিয়েছিল। এই কারণে হেড-ওয়েটার গুর্টনেরকে বলেছিল, মেণ্ডেলকে যেন তিনি তাড়িয়ে দেন। কিন্তু মিসেস স্পরশিল্ বাধা দিল। মেণ্ডেলের বাকি পয়সার জন্যে জামিন দাঁড়াল সে। নিজের মাইনে থেকে ঋণের টাকা কেটে নিতেও পারবে।

কয়েকটা দিনের জন্যে বিপদ কাটল। কিন্তু পরে যা ঘটল তা সত্যিই সাংঘাতিক। হেড-ওয়েটার ক'দিন থেকে দেখছিল যে, খাবারের হিসেব মিলছে না। কিছু কিছু খাবার উধাও হ'য়ে যাচ্ছে। মেণ্ডেলকেই সে সন্দেহ করল। মেণ্ডেলের আর্থিক দুরবস্থা তখন চরমে উঠেছে। মিসেস স্পরশিলের কাছে ছ' মাসের টাকা বাকি প'ড়ে গিয়েছে। দু'দিন পরে হেড-ওয়েটার লুকিয়ে রইল উনোনের পেছনে। তারপর মেণ্ডেলকে একেবারে হাতেনাতে ধ'রে ফেলল সে। কাফে গ্লুক-এর অযাচিত অতিথিটি হামাগুড়ি দিয়ে চ'লে গেল পেছনের ঘরে। রুটির বাক্স থেকে দু'খণ্ড রুটি চুরি ক'রে আবার সে ফিরে এল নিজের জায়গায়। খিদের জ্বালায় গোগ্রাসে খেয়ে ফেলল রুটি দুটো। রাত্রে যখন হিসেবনিকেশ হচ্ছিল তখন সে বলল, "শুধু কফি খেয়েছি, রুটি খাইনি।" মালিকের কাছে ব্যাপারটা রিপোর্ট করল হেড-ওয়েটার।

এমন একটি স্বর্ণ-সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করছিল গুর্টনের। গরম মেজাজ দেখিয়ে সে একটা নাটকীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি করল। মুখের ওপর ব'লে দিল যে, এটা সোজাসুজি চুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। পুলিশে ধরিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল। তবে নিজে সে ভালো মানুষ ব'লে এ যাত্রায় মেণ্ডেলকে ক্ষমা করল সে। ফ্লোরিয়ান বলল, "এর পর আর যেন তোমার মুখ এখানে আমরা দেখতে না পাই।"

যাকোব মেণ্ডেলের দেহটা কাঁপতে লাগল, কিন্তু জবাব কিছু দিল না। যে কটা সামান্য পার্থিব জিনিস তার ছিল সে কটা ফেলে রেখে নিঃশব্দে সে বেরিয়ে গেল কাফে গ্লুক থেকে।

মিসেস স্পর্নশিল বলতে লাগল, "এমন একটা ভয়ংকর দৃশ্য ভোলবার নয়। দাঁড়িয়ে পড়ল মেণ্ডেল। ভাঙাচোরা চশমাটা কপালের ওপর তোলাই ছিল। মুখটা একেবারে সাদা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। জানুয়ারী মাস, দারুণ ঠাণ্ডা। তবুও সে কোটটা ফেলে রেখে গেল। তোমার তো নিশ্চয়ই মনে আছে, যুদ্ধ থেমে যাওয়ার ঠিক পরেই কি সাংঘাতিক শীত পড়েছিল সেবার। ফ্লোরিয়ান যখন তাকে অভিযুক্ত করল তখন সে একটা বই পড়ছিল। ভয়ে কাঁপতে লাগল মেণ্ডেল। যাওয়ার সময় বইটা নিয়ে গেল না, টেবিলের ওপর খোলাই প'ড়ে রইল। প্রথমে আমি দেখতে পাইনি। তারপর যখন বইটা হাতে নিয়ে আমি তার পিছুপিছু ছুটে গেলাম, তখন সে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। ভেবেছিলাম রাস্তায় গিয়ে তাকে ধরি। কিন্তু ভয় পেলাম। মিস্টার গুর্টনের তখন দরজা আগলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। চেঁচামেচি ক'রে মেণ্ডেলকে ধমকাচ্ছিলেন। রাস্তায় লোক জড়ো হ'য়ে গেল। লজ্জায় আমার অন্তরাত্মা কেঁদে উঠল। পুরনো মালিকের আমলে এমন ব্যাপার কিছুতেই ঘটত না। খিদের জ্বালায় দু'-এক টুকরো রুটি না চেয়ে খেয়েছে ব'লে মিস্টার স্ট্যাণ্ডহার্টনের কিছুতেই তাকে তাড়িয়ে দিতেন না। উপরন্তু তিনি তাকে আরও বেশি রুটি দিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এইখানে ধ'রে রাখতেন। যুদ্ধের সময় থেকে মানুষ দেখছি অত্যন্ত নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠেছে। কি ভীষণ পরিবর্তন। যে মানুষটা এত দীর্ঘদিন থেকে এখানে আসা-যাওয়া করে, তাকে তাড়িয়ে দেওয়া কি নিষ্ঠুরতা নয়? কি লজ্জা বলো তো। এমন নিষ্ঠুরতার জন্যে আমায় কোনোদিনও ভগবানের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না।"

এই ভদ্রমহিলাটি বাববার ক'রে সেই একই কথা বলতে লাগল যে, মিস্টার স্ট্যাণ্ডহার্টনের মালিক থাকলে এমন লজ্জাব ব্যাপাবটা কখনই ঘটতে পারত না। খুবই উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল মিসেস স্পবশিল। মুখ দিয়ে যেন খই ফুটছিল। শেষ পর্যন্ত তাব কথাব স্রোত বন্ধ কবলুম আমি। জিজ্ঞাসা কবলাম, মেণ্ডেলের কি হ'ল। তাবপবে আর দেখা হয়েছে কিনা তাব সঙ্গে। প্রশ্ন শুনে আবও তার উৎসাহ বাড়ল।

সে পুনবায় বলতে আবম্ভ কবল, "প্রত্যেক দিন যখনই আমি তাব টেবিলেব পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা কবতাম তখনই শবীবটা আমাব শিবশির ক'রে উঠত। প্রতিবাবই নিজেব মনে ভাবতুম, 'আহা বেচাবী মেণ্ডেল এখন কোথায় আছে!' তাব ঠিকানা জানলে আমি নিজেই গিয়ে সেখানে উপস্থিত হতুম। সঙ্গে ক'রে কিছু গবম গবম খাবাব নিয়ে যেতে পাবতুম। হাতে তার পয়সা কই যে, খাবাব কিনবে? ঘবটাই বা গবম বাখবে কি ক'বে? যতদূব জানি, আত্মীয়স্বজন তাব কেউ নেই। অনেকদিন পযন্ত যখন তাব খবব পেলাম না, তখন বুঝলাম, বোধ হয় আব সে বেঁচে নেই। দেখাও হবে না আব। আমি ভাবলাম, তাব আত্মাব কল্যাণেব জন্যে গির্জাতে গিয়ে একদিন প্রার্থনা কবব। পঁচিশ বছবেব পবিচয়—আমি জানি, লোকটি অত্যন্ত সৎপ্রকৃতিব।

"একদিন এই ফেব্রুয়াবী মাসে সকালবেলা ঘবেব জানলা-দবজা ঝাড়পোঁছ কবছিলাম, এমন সময় দেখি দবজা দিয়ে ঘবে ঢুকল যাকোব মেণ্ডেল। আগে সে ঢুকত একপেশেভাবে, মনে হ'ত যেন লোকটি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। দেহটা এখানে আছে বটে, কিন্তু মনটা অন্য জায়গায়। এবাব দেখলুম, ঠিক তেমনটা আব নেই। অন্য বকমেব হাবভাব। তক্ষুনি আমি লক্ষ্য কবলুম, চোখেব দৃষ্টি তাব অদ্ভুত। চোখ দুটো জলজ্বল কবছে। এমনভাবে ঘোবাচ্ছে যেন একদৃষ্টিতে ঘরের সব কিছু দেখে নিতে চায়। শবীবেব যা অবস্থা তাতে মনে হ'ল, গায়ে শুধু একটু চামড়া ও ক'খানা হাড় ছাড়া আব কিছুই নেই। সহসা একটা কথা মনে পড়ল আমার। ভাবলুম, আগেব ঘটনাটা ভুলে গিয়েছে সে। ঘুমন্ত অবস্থায় হেঁটে বেড়ানো মেণ্ডেলের অভ্যাস। যখন হাঁটে তখন চাবদিকেব কোনো কিছুই দেখে না সে। সেদিন যে মিস্টাব গুর্টনেব রুটি চুরিব জন্যে তাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন

এবং পুলিশে ধরিয়ে দিতেও পারতেন সেসবও তার মনে নেই নিশ্চয়ই। ভাবলুম, যাক বাঁচা গেছে—মালিক এখনো এসে পৌছননি। হেড-ওয়েটারও সকালের কফি খাচ্ছে তার ঘরে ব'সে। আমি ছুটে গেলুম মিস্টার মেঙেলের কাছে। তাকে বলতে চেয়েছিলুম যে, এখানে তার না আসাই উচিত। কারণ সেই গুণ্ডা প্রকৃতির মালিকটি—" কথাটা অসমাপ্ত রেখে বৃদ্ধাটি চারদিকে দৃষ্টি ফেলতে লাগল। কেউ কোথা থেকে আমাদের আলোচনা শুনছে কিনা দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি ব'লে ফেলল, "গুণ্ডা নয় মিস্টার গুর্টনের। আমি বলতে চেয়েছিলুম যে, মিস্টার গুর্টনের দেখতে পেলে আবার তাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিতে পারেন। যাই হোক, তার কাছে এগিয়ে গিয়ে আমি শুধু বললুম, 'মিস্টার মেঙেল—' চমকে উঠে আমার দিকে চেয়ে রইল। ঠিক সেই মুহূর্তে পুরনো ঘটনাটা নিশ্চয়ই মনে পড়ল তার। সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম। মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো দেহটাই থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। তক্ষুনি সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রাস্তায় গিয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। আবর্জনার স্তূপের ওপর ভেঙে পড়ল মেঙেল। টেলিফোন ক'রে অ্যামবুলেন্স ডেকে আনা হ'ল। তারা একে হাসপাতালে নিয়ে গেল। যে নার্সটি অ্যামবুলেন্সের সঙ্গে এসেছিল, সে বললে যে, মেঙেলের গায়ে জ্বরের তাপ খুব বেশি। সেই রাত্রেই মারা গেল সে। ডাক্তার বললেন, 'ডবল নিমোনিয়া।' জ্ঞান ফিরে এল না আর। সত্যি কথা বলতে কি, যখন সে কাফে গ্লুক-এ এসে উপস্থিত হয়েছিল তখনই তার পুরোপুরি জ্ঞান ছিল না। জ্বরের উত্তাপে আচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল। যে টেবিলটার পাশে ব'সে ছত্রিশটা বছর কাটিয়ে গেছে মেঙেল, সেটাই ওকে এখানে টেনে এনেছিল শেষ মুহূর্তে। টেবিলখানাই ছিল তার নিঃসঙ্গ জীবনের নবনির্মিত বাস্তু।"

আমরা অনেকক্ষণ ধ'রে তার সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। আমরা দু'জনেই শুধু 'বুথ্মেঙেল' নামে এই অদ্ভুত মানুষটিকে মনে ক'রে রেখেছি। প্রথম জীবনে গেলিশিয়া প্রদেশের এই ফিরিওয়ালাটির কাছ থেকেই আমি সন্ধান পেয়েছিলাম যে, দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে আরও একটা জগৎ আছে যেখানে মানুষ শুধু আত্মিক চিন্তায় ডুবে থাকতে পারে। কিন্তু এই বৃদ্ধাটিই বা তাকে মনে রাখল কি ক'রে? সে তো লেখাপড়া জানত

না, সারা জীবনে বই পড়েনি একটাও। কাফে গ্লুক-এর একটা সামান্য চাকরি করে—চাকরানীর কাজ বললেই হয়। তবুও সে মেণ্ডেলকে মনে রেখেছে। পঁচিশটা বছর মেণ্ডেলের ওভারকোটটা ঝেড়েপুঁছে পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে, ছেঁড়া বোতাম সেলাই করেছে সে। তার সঙ্গে মিসেস স্পরশিলের শুধু এই বন্ধনটুকুই ছিল। আমাদের দু'জনের মধ্যেও সাদৃশ্য কিছু ছিল না, দুটো আলাদা জগতের মানুষ আমরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বৃদ্ধাটির সঙ্গে আমার বনিবনাও হয়ে গেল। আমাদের দু'জনের যোগাযোগের সূত্রটা জড়িয়ে রয়েছে এই পরিত্যক্ত টেবিলটার গায়। সেই একই লোকের স্মৃতিচিহ্ন আমাদের সজাগ ক'রে রেখেছে। সবচেয়ে বড় কথা পূর্বস্মৃতি যদি প্রীতি ও অনুরাগপূর্ণ হয় তাহ'লে পরস্পরের বন্ধন কখনো ছিঁড়ে যায় না। কথা বলতে বলতে বৃদ্ধাটি সহসা অনুশোচনার স্বরে চেচিয়ে উঠল, "হায় ভগবান, আমার কি ভোলা মন। মিস্টার গুর্টনের যেদিন তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেদিন একটা বই সে ফেলে গিয়েছিল এখানে। বইটার কথা তো তোমায় আগেই বলেছিলুম। সেই বইটা এখনো আমার কাছে আছে। এটা নিয়ে কি যে আমি করব বুঝতে পারিনি। যখন দেখলুম, বইটা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে কেউ এল না তখন আমি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এটা নিজের কাছে রেখে দিলুম। আমি কি অন্যায় করেছি?"

বৃদ্ধাটি উঠে গিয়ে দেরাজের চাবি খুলল। দু-চারটে আজেবাজে জিনিসের মধ্যে থেকে বইটা বার ক'রে এনে আমাকে দেখতে দিল। হাসি সংবরণ করতে কষ্টই হ'ল আমার। একে আমি ভাগ্যের বিদ্রূপাত্মক হাসি ছাড়া কি বলব? এটা একটা অত্যন্ত দরকারী এবং অতিপ্রসিদ্ধ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। গ্রন্থ-সংগ্রাহকরা সবাই এর নাম জানে। হাতে পেলে তাদের স্বর্গ পাওয়ার মতো উল্লাস হ'ত। মৃত যাদুকরের সম্পত্তিটা এখন এসে এমন একজনের হাতে পড়ল যে কখনো বাইবেল ছাড়া অন্য কোনো মুদ্রিত পুস্তক হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেনি। হয়তো হাসি আমি সত্যি সত্যি সংবরণ করতে পারিনি। সেই-জন্যে বৃদ্ধাটি অপ্রস্তুত বোধ করল নিশ্চয়ই। আবার আমায় সে জিজ্ঞাসা করল, "বইটা নিজের কাছে রেখে দিয়ে আমি কি অন্যায় করলুম?"

সাদরে আমি তার করমর্দন ক'রে বললুম, "কোনো অন্যায় তুমি করোনি। এটা রেখে দাও। আমাদের পুরনো বন্ধু যাকোব মেণ্ডেল নিশ্চয়ই খুশি

হবে। সে ভাববে, যেসব হাজার হাজার লোককে বই দিয়ে সে সাহায্য করেছে তাদের মধ্যে কেউ একজন আজও তার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।”

এর পরে বিদায় নিলুম আমি। বৃদ্ধাটির সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে গিয়ে লজ্জাই পেলুম একটু। স্ত্রীলোকটি অশিক্ষিতা বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মৃত পণ্ডিত ব্যক্তিটির স্মৃতিচিহ্ন একটা ধ'রে রাখতে পেরেছে। ভুলে যায়নি তাকে। অথচ আমি শিক্ষিত এবং স্বনামধন্য লেখক হ'য়েও এতগুলো বছর বুখ্‌মেণ্ডেলকে ভুলে ব'সে ছিলুম। আমার অন্তত জানা উচিত ছিল যে, মৃত্যুর পরে মানবসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার উদ্দেশ্যেও বই লেখেন লেখকরা। বিস্মরণশীল মানবমনে বেঁচে থাকবার এইটুকুই তো আমাদের সর্বশেষ প্রয়াস।

হাতসাফাই

১৯৩১ সালের এক সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাত। এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, কিন্তু বাতাস তখন পর্যন্ত আর্দ্রতা, শীতলতা ও মমতায় মাখানো, নবোদিত সূর্য-কিরণে দশ দিক আবার ঝলমল ক'রে হেসে উঠেছে। বসন্ত যেন পৃথিবীর বুকে সশরীরে অবতীর্ণ। বায়ুস্তর তরল ও লঘু স্বচ্ছ। প্যারীসের প্রাণকেন্দ্রে, এমনকি বুল্‌ভার সেবাস্তপল-এ ব'সে আমি যেন বাতাসে প্রান্তরের ও সাগর-সৈকতের ঘ্রাণ অনুভব করছি। বিলম্বিত মধুমাস কখনো কখনো মলয়-মোদিত মেঘমন্দ্রে তার আসন্ন আবির্ভাব-বার্তা ঘোষণা করে, এই ইন্দ্রজাল-মোহ সেই ঘোষণারই নিজস্ব রচনা। এক ঘণ্টা পূর্বে আমাদের এক্‌সপ্রেস্‌ ট্রেন যখন পশ্চিম মুখে রাজধানীর দিকে ছুটে আসছিল, দিগন্তসীমায় তখন ঘনিয়ে উঠেছে প্রলয়গর্ভ কালো মেঘের ঘনঘটা। গাড়ি যখন এপানের কাছাকাছি, নিগৃহীত প্রান্তরের বুকে মহানগরীর বিজ্ঞাপন শ্রেণীর সন্নিবেশ তখন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায়। বর্ষীয়সী ইংরাজ মহিলা বিপরীত দিকের কোণে ব'সে নিজের জিনিসপত্র ও বাসনকোসন ক্ষিপ্র হস্তে অ্যাটাচী কেসে ভরতে ব্যস্ত। যে ঘনঘটার সঙ্গে ভিংরি ল্য-ফ্রাঁসোয়ায় আমাদের প্রথম দেখা এবং মার্নে উপত্যকার ওপর দিয়ে, যে-মেঘ এতক্ষণ আমাদের ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে আসছিল, এইবারে তার বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে বড় বড় ফোঁটায় নেমে এল প্রচণ্ড বর্ষণ। বিদ্যুতের পাণ্ডুর ছটায় বিজ্ঞাপিত হয়েছিল আসন্ন বিপদ সংকেত এবং তার পরেই ভেরীনিনাদে নেমে এল বৃষ্টি-ধারা, মনে হল, আমাদের এক্‌সপ্রেস গাড়িকে লক্ষ্য ক'রে অজস্র ধারায় বর্ষিত হচ্ছে ঝাঁকে ঝাকে গুলি। জানলাগুলো ঝন্‌ঝন শব্দে প্রতিবাদ জানাল সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে, প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে নতি স্বীকার ক'রে ট্রেন তার ধূসর বর্ণের পতাকা অবনমিত ক'রল মৃত্তিকা স্পর্শ করবার জন্য। শিলাবৃষ্টি ও বর্ষণধারা অশ্রান্ত বেগে এসে আছড়ে পড়ছে কাঁচের ওপরে। সে শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শোনা যায় না, সে দৃশ্য ব্যতীত অন্য কোনো দৃশ্য চোখে পড়ে না, তারই মধ্য দিয়ে আমাদের গাড়ি বিপুল বেগে ছুটে চলেছে সম্মুখপানে, ঝড়কে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবার জন্যই তার যেন এই প্রাণান্ত প্রয়াস।

কিন্তু গার-দ্যু-লেস্ত্ স্টেশনে পৌছবাব পূর্বেই প্রকৃতির অন্ধবেগ প্রশমিত হ'যে এল। যাত্রীবা যখন মুটে ডাকাডাকি নিযে ব্যস্ত, অপম্রিয়মাণ মেঘাবরণের ফাঁক দিয়ে সূযকিরণ তখন ছডিযে পডেছে পৃথিবীব বুকে, সে আলোকে জল্‌জ্বল্ ক'বে হেসে উঠেছে বুল্‌ভাব। বাডিব সম্মুখভাগগুলো চকচক কবছে সদ্য পালিশ-কবা ধাতব বস্তুব মতো। ছিন্ন মেঘেব ফাঁক দিযে ইতস্তত উঁকি মারছে নীলাকাশেব বড বড টুকবোগুলো। দুযোগেব যে মেঘ-মেদুব অন্ধ আববণ এতক্ষণ নগবীকে আচ্ছন্ন ক'বে রেখেছিল, হিবণ্ময দ্যুতিতে মণ্ডিত হ'যে নগ্নসৌন্দযে তা হ'তে সে বেব হ যে এসেছে সদ্যঃস্নাতা সাগরোত্থিতা ভেনাসেব মতো। দক্ষিণ এবং বামে শত শত লোক তাদেব আশ্রযস্থল ছেডে পথে বেবিয়ে এসেছে দলে দলে, উচ্ছল হাসির শব্দে পথ মুখবিত ক'রে আবাব তাবা শুরু কবেছে পথ চলা, যেসব যানবাহন এতক্ষণ স্তব্ধ হ'যে দাঁডিযেছিল তাদেব চক্রনেমিতে বেজে উঠেছে চলাব গতিছন্দ—পুনরুদিত সূর্যালোক সবাবই প্রাণে ছুঁইযে দিয়েছে পুলকেব স্পর্শমণি। সামনের বুল্‌ভারে গাছগুলো জন্মগ্রহণ করেছে কঙ্করাকীর্ণ মৃত্তিকায, সবস মাটিব বুকে তাদের সূতিকাগাব নির্মিত নয় ব'লে শুষ্ক শীর্ণ তাদেব চেহাবা, বৃষ্টিধারায স্নাত ও সঞ্জীবিত হ'যে তাবাও তাদেব মুঞ্জবিত শাখাব অঙ্গুলি উত্তোলন কবেছে উর্ধ্বে নীল আকাশেব দিকে। অন্তবেব সঞ্চিত সৌবভ বাতাসে বিকীর্ণ ক'বে দেবাব জন্য সে কি প্রাণপণ আকুতি তাদেব। ঘটনাটা বিস্ময়জনক হ'লেও, কযেক মিনিট যেতে না যেতে তাদেব সে সাধনা সাফল্যমণ্ডিত হ'ল প্যারীসের কেন্দ্রস্থল এবং বুল্‌ভাব সেবাস্তপল দেখতে দেখতে ভ'রে উঠল 'হর্সচেস্টনাট' ফুলের সুমিষ্ট সৌরভে।

একে তো এপ্রিল-প্রভাতেব উচ্ছল আনন্দ-উৎসব, তাব ওপব সৌভাগ্য-বশত একটু সকাল সকালই এসে পৌঁছেছি এবং বিকেলবেলার আগে কোথাও যাবাব বা কারও সঙ্গে দেখাশোনা করবার পূর্বনির্ধাবিত কোনো কথাবাতা নেই। প্যাবীসের সার্ধ পঞ্চাশ লক্ষ দ্বিপদ জীবগুলির মধ্যে এমন একজনও নেই—যে আমাব আগমন-প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে ব'সে আছে; কাজেই নিজের খুশি-খেয়াল মাফিক কালক্ষেপ কববার পক্ষে অবাধ স্বাধীনতার আমি অধিকারী। বুল্‌ভাবে আমি যথেচ্ছ পায়চাবি কবব, খবরেব কাগজ পড়ব, ইচ্ছে হয় তো কোনো কাফেতে গিয়ে বসব, অকাবণ চেয়ে থাকব দোকানের

জানলাগুলোর দিকে, সীন নদীব ধাব ধ'রে চলতে থাকব মনোমতো বই-এব সন্ধানে। কখনও বা কোনো বন্ধুর সঙ্গে আলাপ কবব ফোনে, কিংবা এপ্রিল দিনেব মাদকতায় মেতে উঠব শুধু অকাবণ পুলকে। আমাব না আছে কোনো বন্ধন, না আছে কোনো বাধা, কাজেই উল্লিখিত কর্মতালিকার যে কোনো একটা কাজ আমি কবতে পাবি, অথবা এ ছাড়াও আরও একশোটা কাজ করাব পথেও আমাব কোনো অন্তবায় নেই। অদৃষ্ট আমাব প্রতি সুপ্রসন্ন ব'লেই হোক, অথবা সহজাত সংস্কাবেব নির্দেশবশেই হোক, আমি সবচেযে সুষ্ঠু পন্থাই বেছে নিলাম স্থিব কবলাম, বিশেষ কিছু না কবাই হবে আমাব আজকেব কর্মসূচী। আমাব সামনে না আছে কোনো পবিকল্পনা, না আছে নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্যস্থল; লক্ষ্যহীনভাবে আমি ঘুবে বেড়াচ্ছি পথে পথে ও গলিতে গলিতে, পদক্ষেপ একটু দ্রুততব কবছি শুধু বাস্তাব মোড়েব কাছাকাছি এসে। অবশেষে নিছক দৈবক্রমেই আমি এসে পৌঁছলাম প্রশস্ততব বুল্‌ভাবেব মধ্যে। বুল্‌ভাব-দ্য-ইতালিযান্স ও রুা-দ্রুযোব কোণে অবস্থিত কাফেব ছাদে এসে যখন আমি উঠলাম, তখন ক্লান্তিতে আমার দেহ প্রায অবসন্ন হ'যে পড়েছে।

আবামকেদারায দেহটা এলিযে দিযে একটা সিগাব ধবালাম, ভাবলাম, "যাক, আবাব এখানে আসা গেল। আব প্যাবীস—আমাব সেই পুবনো প্যাবীস, দুই বছব পবে আমাদেব দুই বন্ধুব মধ্যে এই দেখা-সাক্ষাৎ। এত-দিন পবে আবাব আমবা পবস্পবকে চোখ ভ'বে দেখে নেব। এগিয়ে এস বন্ধু, দেখাও আমাকে কি কি নতুন কলাকৌশল শিখলে এব মধ্যে। শুরু করো তোমার খেলা এই মুহূর্তে। খুলে ধরো বুল্‌ভাব-দ্য প্যাবীস, তোমাব সেই অতুলনীয় শব্দময় চিত্রপট—আলোকে, বর্ণবৈচিত্র্যে ও গতিভঙ্গিমায যাব তুলনা মেলে না তুলে ধবো তোমাব শত সহস্র অবৈতনিক নির্বাক অভিনেতাব দলকে। বাজিযে তোলো তোমার বথচক্রমুখব অনমুকবণীয সংগীত। ঢেলে দাও দবাজ হাতে তোমাব সেই অপূর্ব অবদান। ওঠো, তৎপব হও—দেখাও তোমাব কি দেখাবাব আছে। বাজিয়ে তোলো তোমাব বিপুল অর্কেস্ট্রা যন্ত্রে ঐক্য ও অনৈক্যতানেব সেই বিচিত্র সংগীত: সেই অন্ধবেগগতি-সম্পন্ন যন্ত্র-যান, সেই অসংখ্য ফেবিওযালাব অশ্রান্ত চিৎকাব, বর্ণোজ্জ্বল সেই প্রাচীবপত্র, কলের বাঁশীব সেই বিকট গর্জন, আলোকোজ্জ্বল সেই বিচিত্র

বিপণিশ্রেণী, দ্রুতগতিতে প্রবহমান সেই পথচারীরদল। এই আমি বসলাম এখানে আমার চিত্তের রুদ্ধ দ্বার সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে। অফুরন্ত অবকাশ আমার হাতে, মনে আমার জেগে রয়েছে জানবার ও শোনবার জন্য অতৃপ্ত আকাজ্ক্ষা। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কান পেতে ও চোখ মেলে ব'সে থাকব চোখ যতক্ষণ ধাঁধিয়ে না যায়, মাথা ঘুরে না ওঠে। চালাও—চালাও, অফুরন্ত ধারায় ধ্বনিত ক'রে তোলো নব নব চিৎকার, গর্জন আর বংশীনিনাদ। প্রত্যেকটি ঘটনা গ্রহণ করবার জন্য আমার সকল ইন্দ্রিয় আজ সজাগ। আর আমি এই অতি ক্ষুদ্র এক অপরিচিত কীটাণুকীট, আমি এখানে ব'সে আছি তোমার বিশাল দেহ হ'তে যতটুকু পারি শোণিত শুষে নেবার জন্যে। এস, এস, আমি যেমন তোমাকে উপভোগ করার জন্য উন্মুখ, তুমিও তেমনি আজ অকপটে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করো। দুর্জ্ঞেয় তোমার লীলারহস্য—হে দুর্জ্ঞেয় মহানগরী, তোমার অমর কুহকজাল মৃত্যু জানে না, প্রতি মুহূর্তে সে জন্ম পরিগ্রহ করছে নব নব কলেবর নিয়ে।"

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর প্রভাতের তৃতীয় বিস্ময় হ'ল এই যে, আমার শোণিত তখন উৎসাহের উত্তাপে টগবগ ক'রে ফুটতে শুরু করেছে। রক্তের সেই তপ্ত চাঞ্চল্যই আমাকে ব'লে দিচ্ছে, আজকের এই প্রভাত আমার জন্যে বহন ক'রে এনেছে এক অপূর্ব বিস্ময়। আমার সম্মুখে রয়েছে হয়তো পথ-চলার মাদকতা, হয়তো বা বিনিদ্র রাত্রি যাপন। এমন দিনে আমার সত্তা যেন দ্বৈত বা বহুবিচিত্র দেহ ধারণ করবে। আমার সংকীর্ণ একক সত্তা যেন আমার পক্ষে পর্যাপ্ত ব'লে মনে হয় না। গুটিপোকা যেমন তার বহিরাবরণ বিদীর্ণ ক'রে বেরিয়ে আসবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে, দুঃসহ অন্তর্গূঢ় উত্তেজনায় আমিও তেমনি ক'রে আমার সর্বাঙ্গ আঁচড়াতে থাকি। নৌ-যুদ্ধে নোঙর যেমন তার অসংখ্য আঁকশি বিস্তার ক'রে ব্যগ্র প্রতীক্ষায় ব'সে থাকে শত্রুপক্ষের জাহাজকে অকটোপাসের মতো বাহুবেষ্টনে আঁকড়ে ধরবার জন্য, আমার প্রতিটি শিরার অগ্রভাগও তেমনি অধীর হ'য়ে অপেক্ষা করছে বাইরের প্রতিটি আবেদন গ্রহণ করবার নিমিত্ত; আমার দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় অতি-মাত্রায় সজাগ হ'য়ে ওঠে এবং তার সঙ্গে এসে যুক্ত হয় মানসিক পরিমণ্ডলের এক অশুভসূচক স্বচ্ছতা। আমার এবং আমার চতুর্দিকস্থ বস্তুগুলির মধ্যে

কেমন যেন একটা নিবিড় সংযোগ আমি অনুভব করি, সে সংযোগ বৈদ্যুতিক বোতামের সঙ্গে তারের সংযোগের মতোই নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ এবং আমার মন এই সংযোগের সংখ্যা যেখানে যতটুকু সম্ভব বাড়াবার জন্য যে ব্যগ্রতা অনুভব করে তা বস্তুতই বেদনাদায়ক। যে কোনো বস্তুর ওপরেই আমার দৃষ্টি পড়ুক না কেন, সেই মুহূর্তে তা মণ্ডিত হ'য়ে ওঠে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে। যদি দেখি, কোনো যন্ত্র রাস্তার পাথর ভাঙার কাজে রত হয়েছে, সেই দিকে চেয়ে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারি, শ্রমনিরত যন্ত্রের সঙ্গে আমার আন্তরিক সহানুভূতির এমন এক নিবিড় সংযোগ সাধিত হয় যে, তার কাজ দেখতে দেখতে আমার নিজের ঘাড়ই ব্যথিত হয়ে ওঠে। কিংবা কোনো একটা খোলা জানলার দিকে চেয়ে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাড়িয়ে থাকতে পারি, সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সেই কক্ষমধ্যস্থ জীবগুলি সম্বন্ধে শত জিজ্ঞাসা আমার মনে জাগ্রত হয়ে ওঠে—উন্মুক্ত ওই বাতায়ন যে কক্ষের মধ্যে দিনের আলো বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে চলেছে হয়তো কোনো এক পথচারী, অহেতুক কৌতূহলের বশে আমি তার অনুসরণ করতে পারি মাইলের পর মাইল। আমি জানি, নিরপেক্ষ দর্শকের চোখে আমার আচরণ হয়তো দুর্বোধ্য ও নির্বোধোচিত ব'লে মনে হবে। তা সত্ত্বেও কোনো বই-এর বর্ণিত দুঃসাহসিকতাপূর্ণ ঘটনা অথবা নিপুণভাবে অভিনীত কোনো নাটক আমার যতখানি মনোযোগ আকর্ষণ করে, তুচ্ছ ঐ ঘটনাটি তদপেক্ষা বহুগুণ মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে আমার মনকে তাতিয়ে ও মাতিয়ে তুলবে। সুতীব্র এই অনুভূতি, আগামী ঘটনা সম্বন্ধে অগ্রিম এই সচেতনতা হয়তো আকস্মিক স্থান-পরিবর্তনজনিত, বায়ুমণ্ডলের চাপের ইতর-বিশেষ রক্তে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়, হয়তো বা এ তারই ফল। হেতু যাই হোক, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আবিষ্কার করতে কোনো দিনই চেষ্টা করিনি। কারণ যাই হোক না কেন, এই অবস্থা যখন আমি প্রাপ্ত হই, আমার দৈনন্দিন জীবন তখন আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয় পারমার্থিক জীবনের স্মৃতি পরিণত হয় অন্তঃসারবিহীন শূন্যতায়। এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেই আমি সম্পূর্ণরূপে খুঁজে পাই আমার সত্যকার সত্তাকে, আমি পরিপূর্ণরূপে সচেতন হই জীবনের বিস্ময়কর বহুত্ব ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে

দৈব আমার সম্মুখে যা-ই এনে হাজির করুক না কেন, সানন্দে তাকে গ্রহণ করবার জন্য উন্মুখ মন নিয়ে গণ-প্রবাহের তটপ্রান্তে এসে আমি আসন গ্রহণ করলাম—কার প্রতীক্ষায় কে জানে। মৎস্যশিকারীর দৃষ্টি যেমন একান্তভাবে নিবদ্ধ থাকে ছিপের ফাৎনার ওপর, আমার প্রতীক্ষাও তেমনি প্রত্যাশার আগ্রহভরে ঘন কম্পমান। পরিপূর্ণ এই বিশ্বাস ও পরম নিশ্চয়তায় আমার বুক বাঁধা ছিল যে, আমার কৌতূহল চরিতার্থ করবার মতো কোনো না কোনো ঘটনা অবশ্যই ঘটবে। এই অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল, অথচ কোনো কিছুই ঘটল না—প্রবহমান জনস্রোতের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দু'-চোখের দৃষ্টি আমার অবসাদভরে এমন ভারি হ'য়ে এল যে, স্পষ্ট ক'রে কোনো কিছুই আমার আর দৃষ্টিগোচর হয় না। বুলভার বরাবর সঞ্চরণশীল জনতাকে মনে হচ্ছে আকারহীন ও অবিন্যস্ত এমন সব ডিম্বাকৃতি জীব যাদের টুপির তলা থেকে উঁকি মারছে উৎসুক, আগ্রহ-ব্যাকুল বা আত্মস্থ কতগুলো মুখ মাত্র, আমার দৃষ্টি যতই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হ'য়ে আসে, কর্দমাক্ত ও আবর্তিত সেই জনস্রোত অস্পষ্ট ও আবছা হ'য়ে আসে সেই অনুপাতে। অপটু হাতের প্রযোজিত চিত্রনাট্যের আবছা ও অস্পষ্ট দৃশ্যাবলীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ যেমন ক্লান্ত হ'য়ে আসে, আমার দুটো চোখ ভ'রে নেমে এল ঠিক সেইরকম শ্রান্তি। আমি আসন ছেড়ে আবার পথে পা বাড়াতে উদ্যত হয়েছি, এমন সময় দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তাকে আবিষ্কার করলাম।

আগন্তুক বারবার আমার দৃষ্টিপথে এসে দাঁড়ায় কেন? এই তুচ্ছ ঘটনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই আধঘণ্টার মধ্যে হাজারে হাজারে ও কাতারে কাতারে আরও যারা ভেসে এসেছিল আমার দৃষ্টিপথে, যেন অদৃশ্য কোনো হাতের রজ্জু সঞ্চালনে তারা অপসৃত ও অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে। ক্বচিৎ একটা চেহারা, একখানা মুখ একটা ছায়ামূর্তি আমার চোখে পড়বামাত্র স্রোতের মুখে কুটোর মতোই কোথায় তারা ভেসে গেছে। আমার লক্ষ্যের মধ্যে আর তারা ফিরে আসেনি। কিন্তু এই লোকটা পুনঃপুনঃ ফিরে এসেছে সেই একই জায়গায়। শুধু এর জন্যেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল তার দিকে। সাগরতরঙ্গ যেমন বারবার একই জলজ গুল্মের গুচ্ছকে নিতান্ত একগুঁয়ের মতো একই জায়গায় টেনে এনে ফেলে দিয়ে যায়

পরক্ষণে তাদের সিক্ত জিব দিয়ে তার দেহ লেহন করবার জন্যে, ঠিক তেমনিভাবে সেই একই মূর্তি বিপুল জন-প্রবাহের ঘূর্ণাবর্ত হ'তে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে বারবার ঘুরতে ঘুরতে এসে অসহায়ভাবে ছিটকে পড়তে লাগল একই জায়গায়

বারবার সোলার ছিপির মতো জন-সমুদ্রে ওঠা-ডোবা ছাড়া তার মধ্যে লক্ষ্য করবার মতো আর কোনো কিছুই ছিল না, ক্ষুৎপীড়িত শীর্ণ চেহারা, হ্যাংলা দেহটা ক্যানারী রঙের এমন একটা কোটে ঢাকা যা তার গায়ের মাপ মাফিক তৈরি হয়নি, কাজেই হাত দুখানা কোটের হাতার দৈর্ঘ্যের মধ্যে হারিয়ে গেছে। হলদে রঙের সেকেলে ধরনের পোশাকটা তার দেহের পক্ষে এত বড় যে, তার গায়ে সেটা মোটেই মানায়নি। ধূর্ত ইঁদুরের মতো ছুঁচলো তার মুখটা, পাতলা ঠোঁটের ওপর দাঁতমাজা বুরুশের মতো এক জোড়া গোঁফ আর থুতনির নিচে গজানো এক গোছা দাড়ি সমস্ত মুখাবয়বকে বিকৃত ও বীভৎস ক'রে তুলেছে। তার চলা-ফেরার মধ্যেও এমন একটা অদ্ভুত ভঙ্গি যা হাসির উদ্রেক করে, কারণ হাঁটুর নিচে অবধি ঝোলানো হলদে রঙের কোটটা একটা বিশীর্ণ মানবদেহকে কেন্দ্র ক'রে পর্যায়ক্রমে দোল খাচ্ছে ডাইনে হ'তে বাঁয়ে, বাম হ'তে দক্ষিণে। যতবার সে জনসমুদ্রের উপরিভাগে ভেসে ভেসে উঠেছে ততবারই উঠেছে এমন ভীরুতায় ভরা মুখ নিয়ে, যা দেখলে মনে হয় যেন একটা খরগোশ সদ্য বেরিয়ে আসছে যবের খেত থেকে। নাক উঁচু ক'রে বাতাসে শুঁকছে কিসের যেন গন্ধ। বিনয়বশে মাথা নত করেছে প্রতিবারই এবং তার পরে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে জনারণ্যের মাঝখানে।

কিম্ভূতকিমাকার পোশাক পরিহিত লোকটাকে দেখবামাত্র আকৃতিগত সামঞ্জস্যের বিচিত্র সূত্র ধ'রে মনে ভেসে আসে গোগল রচিত 'দি ইনসপেক্টর জেনারেল' নামক নাটকের মধ্যে কোনো একজন নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারীর চেহারা। তার মধ্যে দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হ'ল এই যে, লোকটা হয় চোখে খুবই কম দেখে, নয় বিশ্রী রকমের বেযাড়া; কারণ আমি দেখেছি যেসব পথচারী নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্যস্থল লক্ষ্য ক'রে পথ চলছে তাদের সঙ্গে বারবার ধাক্কা খাচ্ছে এবং ভাসমান এই মানবমূর্তিটি সে ধাক্কার চোটে উল্টে যেতে যেতে বেঁচে যাচ্ছে কোনক্রমে। ধাক্কা খাওয়ার

জন্যে মনে তার একটুও ক্ষোভ নেই, বরঞ্চ সবিনয়ে এক পাশে স'রে দাঁড়াচ্ছে। এই অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে, এই আবার ভেসে উঠছে দৃষ্টিপথে। কাফের সামনে আমি প্রায় আধ ঘণ্টাকাল ব'সে আছি এবং এইটুকু সময়ের মধ্যে তাকে তলিয়ে যেতে ও ভেসে উঠতে দেখলাম এই নিয়ে দশম বা দ্বাদশ বার।

আমাকে কৌতূহলী ক'রে তুলল এই বিচিত্র আচরণ। শেষকালে আমার নিজের ওপরেই আমি কিছুটা বিরক্ত হ'য়ে উঠলাম এই কারণে যে, তীব্র কৌতূহল ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না—লোকটা করতে চায় কি—যেতে চায় কোথায়? কথাটা নিয়ে আমি যতবার মাথা ঘামাই, আমার অপরিতৃপ্ত কৌতূহল ততই আমাকে উত্ত্যক্ত ক'রে তোলে। মনে মনে বললাম, কি করতে চাও তুমি বলো তো! ঘুরে-ফিরে ওই একই কোণে বুদ্‌বুদের মতো ভেসে উঠছ কেন? তুমি নিশ্চয়ই ভিক্ষুক নও, কারণ পেশাদার ভিখিরী যারা, দাঁড়াবার জন্য তারা এমন জায়গা কখনই বেছে নেবে না—যেখানে প্রত্যেকেই এত ব্যস্ত যে, পয়সা আছে কিনা পকেটে হাত দিয়ে তা দেখবার তার ফুরসত নেই। তুমি নিশ্চয় কারিগর নও, কারণ অপব্যয় করবার মতো এত সময় কোনো কাজের লোকের হাতে থাকে না। কোনো তরুণীর জন্যও প্রতীক্ষা করছ না তুমি, কারণ, অত্যন্ত বুড়ি ও বিশ্রী চেহারার মেয়েও তোমার মতো ভীতিপ্রদ জীবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসবে না। তোমার কারবারটা কি? অথবা তুমি তাদেরই একজন—যেসব বদমায়েসের দল নিজেদের 'গাইড' ব'লে পরিচয় দেয়. কিন্তু আসলে যাদের কাজ হ'ল প্যারীস নগরীর ক্লেদাক্ত কদর্য জীবনের কুৎসিত ছবি বিক্রি করা। না, সে কথাও তো তোমার সম্বন্ধে খাটে না, কেননা. এখন পর্যন্ত কোনো প্রাণীর সম্মুখীন হ'তে তোমাকে দেখিনি। লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে ও বাক্যালাপের সম্ভাবনা এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে চলাই তোমার আসল উদ্দেশ্য ব'লে মনে হয়। জনতার এই জঙ্গলের মধ্যে কি খুঁজছ তুমি, সন্ধান করছ কিসের? অতঃপর ক্রমবর্ধমান মনোযোগের সঙ্গে আমি তাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। ক্যানারী রঙের কোট পরিহিত ওই লোকটা বুল্‌ভারে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছে. কিসের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই প্রশ্নের মীমাংসা মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আমার পক্ষে জীবন্ত ও জরুরী হ'য়ে উঠল। এমন সময় সমাধান সহসা এসে দাঁড়াল আমার সম্মুখে ... লোকটা গোয়েন্দা!

ঠিক তাই, লোকটা সাদা পোশাক পরা গোয়েন্দা কর্মচারী না হ'য়ে যায় না। যেরকম বাঁকা চোখে ও চকিত চাউনিতে সে পথচারীদের মুখ লক্ষ্য করছে তা দেখে আমার অনুমান আরও স্পষ্টতর হ'য়ে উঠল। শিক্ষানবিসির প্রথম বছরে পুলিশদের শিক্ষা দেওয়া হয়, অন্য কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রে কি উপায়ে জ্ঞাতব্য বিষয়টুকু এক লহমায় দেখে নেওয়া যায়। কাজটা মোটেই সোজা নয়। যে আমার লক্ষ্যবস্তু, এক নজরে তার পূর্ণাঙ্গ ছবিটা আমার মনের প্লেটে ছেপে নিতে হবে, দেখে নিতে হবে তার পোশাক-পরিচ্ছদ ও হাব-ভাব, এবং মনে মনে হিসেব ক'রে নিতে হবে দাগী আসামীদের চেহারার সঙ্গে তার অবয়বের একটা তুলনামূলক বিচার। কিন্তু আবার বলছি পরীক্ষা-কার্যটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ক'রে নিতে হবে যাকে লক্ষ্য করছি তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। আমি যে লোকটাকে এতক্ষণ ধ'রে লক্ষ্য করছিলাম, সে তার নিজের কারবারের কলাকৌশল বেশ আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে। পারিপার্শ্বিকের প্রতি দার্শনিক ঔদাসীন্যের ভান ক'রে সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলেছে, লোকে যত খুশি তাকে ধাক্কা মারুক না কেন সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই কিন্তু তার অর্ধ-উন্মীলিত চোখের দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যেকটি লোকের সঠিক চিত্র নিয়ে চলেছে সে। অথচ তার লক্ষ্য করবার কলাকৌশল অন্য কারও লক্ষীভূত হচ্ছে না। অন্য যে কোনো দিন হ'লে তার আচরণ কি আমার নজরেই পড়ত? লক্ষ্য করার বাতিক সেদিন আমাকে বিশেষভাবে পেয়ে বসেছিল ব'লেই ব্যাপারটা আমার দৃষ্টিপথে এসেছে।

সাদা পোশাক পরা লোকটা তার নিজের পেশার কলাকৌশলে একজন পারদর্শী ব্যক্তি, কারণ সে যে শুধু ভবঘুরেদের কেবলমাত্র পোশাক পরিচ্ছদই অনুকরণ করেছে তা নয়, পরন্তু তাদের চাল-চলন পর্যন্ত এমন অবিকল নকল ক'রে নিয়েছে যে, তার ভয়াবহ পেশার আভাস পর্যন্ত পাবার উপায় নেই। সাধারণত এক শো হাত দূর থেকেও যে কোনো সাদা পোশাক পরিহিত পুলিশকে চেনা যায় এবং তা যায় এই কারণে যে, তার চলার ভঙ্গিতে ড্রিলে অভ্যস্ত লোকের গতিছন্দ বেজে ওঠে এবং তার চেহারায় ফুটে ওঠে এমন একটা আত্মম্ভরিতার ভাব—যা দেখবামাত্র মনে হয় লোকটা মুফতী পরিহিত পুলিশ না হ'য়ে যায় না। তার ঋজু মেরুদণ্ড নত হ'তে জানে না, বছরের পর বছর ধ'রে যারা দৈন্যপীড়িত দুর্বহ জীবন যাপন করছে তাদের আচরণে

সাধারণত যে কুণ্ঠা ও নমনীয়তার ভাব ফুটে ওটে, এর অবয়বে তার চিহ্ন মাত্র প্রকাশ পায় না। এ লোকটা কিন্তু ছন্নছাড়া ভবঘুরের যে ভূমিকা অভিনয় করছে তা একেবারে নিখুঁত। ক্যানারী রঙের ওই কোটখানা এবং মাথার এক পাশে ঝুঁকে-পড়া বাদামী রঙের ওই টুপিটা এখন পর্যন্ত তার পূর্ব-মালিকের আভিজাত্যের মুমূর্ষু স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে, অন্য দিকে তার জরাজীর্ণ ট্রাউজারের পা দুখানা এবং কোটের ছেঁড়া কলারটা ব্যক্ত করছে নিদারুণ দৈন্য। দক্ষ মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টি দিয়ে সে লক্ষ্য করেছে দৈন্য কেমন ক'রে অনশনক্লিষ্ট মুষিকের মতো পরিচ্ছদের প্রান্তভাগ থেকে প্রথমে খেতে আরম্ভ করে। তার এই জরাজীর্ণ পরিচ্ছদের সঙ্গে অপূর্ব সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে তার ক্ষীণ শীর্ণ চেহারা এবং সম্ভবত আঠা দিয়ে সাঁটানো তার লোমবিরল গোঁফদাড়ি। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে যে কেউ তার অবিন্যস্ত ও এলোমেলো চুলের দিকে চাইবে, এই ধারণা তার মনে হ'তে বাধ্য যে, বেচারা নিশ্চয় গোটা রাত্রিটা হাজতের বেঞ্চে বা তক্তায় শুয়ে কাটিয়েছে। তার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে পাঁজর-ভাঙা কাশির ঝাকুনি। বসন্তকালের বাতাসে যে শৈত্য আছে, তার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যই যেন সে বারবার দু' হাত দিয়ে কোটটাকে গায়ে জড়িয়ে নিতে চাচ্ছে। এইসব এবং তার ওপর দুর্বল পদবিক্ষেপ লক্ষ্য করলে স্বতই মনে হবে, লোকটার শ্বাসযন্ত্র ক্ষয়রোগের দ্বারা আক্রান্ত।

নিঃসংকোচে স্বীকার করছি যে, এই আবিষ্কারের জন্য আমি গর্বিত। নিজে অলক্ষিত থেকে গোয়েন্দার ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে পেরেছি ব'লে আমার আনন্দের অবধি নাই। পক্ষান্তরে আমার মনের অপর দিকে তখন চলেছে আর এক চিন্তার খেলা। সমাসন্ন এপ্রিলের এমন এক দীপ্ত করোজ্জ্বল প্রভাতে বিধাতার দান সূর্য যখন সমগ্র পৃথিবীকে তার ময়ূখমালার মধু-মমতায় মণ্ডিত ক'রে তুলেছে—সেই সময়ে সরকারের বেতনভুক এক কর্মচারী বেরিয়ে পড়েছে হতভাগ্য কোনো এক সন্দেহভাজন ব্যক্তির সন্ধানে এই আশায় যে, ধরতে পারলে টেনে নিয়ে গিয়ে তাকে সে ভরবে জেলখানায়। এ কথা ভাবতে আমার মন বিষাদে বিষিয়ে উঠল। নীতিবোধ শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করল কৌতূহলের কাছে আর লোকটার প্রত্যেকটি গতিবিধি আমি লক্ষ্য ক'রে যেতে লাগলাম অবিমিশ্র আনন্দের সঙ্গে।

রোদ এসে সূর্যকে ঢাকলে রোদ পোয়াবার আনন্দ যেমন সহসা স্তব্ধ হ'য়ে যায়, আমার আবিষ্কারের আনন্দও তেমনি অকস্মাৎ আছড়ে প'ড়ে ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল। হঠাৎ আমার ধারণা হ'ল, আমার নিরাকরণে কোথাও কোনো ভুল হয়েছে, কোথাও অসংগতি ঘটেছে আমার অনুমান ও বাস্তব ঘটনার মধ্যে। আমার মনে আবার দেখা দিল অনিশ্চয়তা। লোকটা কি সত্য-সত্যই গোয়েন্দা? যতই অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলাম ততই আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হ'তে লাগল যে, লোকটার সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের যে চিহ্ন পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে তা এত স্থূল—এমন প্রত্যক্ষ যে, গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষে তার ছদ্ম ভূমিকা অভিনয় করা কার্যত অসম্ভব। শার্টের ওই নোংরা কলারটা। পরবার মতো অন্য কোনো কিছু যার আছে —এ হেন বস্তু গলায় জড়ানো কি তার পক্ষে সম্ভব? তারপরে ধরা যাক জুতো নামধারী ঐ জিনিস জোড়ার কথা, ডান পায়ের জুতোয় ফিতেরূপে যেটা পরানো আছে আসলে সেটা ফিতেই নয়, এক টুকরো দড়ি, আর বাঁ পায়ের জুতোর গোড়ালি এমন আল্‌গা যে, প্রতি পদক্ষেপে ব্যাঙের মতো সেটা ডেকে চলেছে। ভান ক'রেও এমন ভেকরূপী পাদুকা পায়ে পরা কি কারও পক্ষে সম্ভব? সার্কাস পার্টির সঙের মতো চলমান ওই জীবটি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে ধারণা আমি মনে মনে গ'ড়ে নিয়েছিলাম, তা অক্ষুণ্ণ রাখা আমার পক্ষে আর সম্ভব হ'ল না। কিন্তু তা যদি না হয়, তবে লোকটা কি, ও কে? অনবরত তার এই আনাগোনা কেন? সব কিছুর দিকে কেন তার এই চঞ্চল ও চকিত দৃষ্টি? সমস্যার সমাধান করতে না পেরে আমার রাগ ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। ইচ্ছে হ'ল ছুটে গিয়ে লোকটার ঘাড় চেপে ধ'রে বলি, ওহে, কি করছ তুমি এখানে, কি কাজ এখানে তোমার?

অন্তরের প্রেরণা আর একবার ঝিলিক দিয়ে উঠল এবং এইবারে আমি বুঝতে পারলাম, আমার অনুমান অকাট্য। আমার সিদ্ধান্তের শর ঠিক লক্ষ্যভেদ করেছে। লোকটা নিশ্চয়ই গোয়েন্দা নয়। এমন নির্বোধের মতো ভুল আমি করলাম কি ক'রে? সে বরঞ্চ গোয়েন্দা পুলিশের ঠিক বিপরীত বস্তু। সে একটা দুর্বৃত্ত, পকেটমার— পশাদার পাকা পকেটমার বুল্‌ভারে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, নোটকেস, ঘড়ি, ভ্যানিটি ব্যাগ ওই ধরনের ছোটখাট যে কোনো

জিনিস মারবার তালে। জনতা যেখানে সবচেয়ে ঘন হ'য়ে জ'মে উঠেছে সেইখানে তাকে ঠেলে ঢুকতে দেখে এ ধারণা আমার দৃঢ়তর হ'ল। তার লোক-দেখানো অপরিচ্ছন্নতা, পথচারীদের সঙ্গে তার হামেশাই ঠোকাঠুকি, এসব যে তার কারবারের পক্ষে প্রয়োজনীয় কলাকৌশল সে তত্ত্ব আমার চোখে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। তার আচরণের অন্তর্নিহিত অর্থ-বোধ ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠতে দেরি হ'ল না। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, রাস্তার মোড়ে কাফের সম্মুখে কেন সে তার বিচরণ-ক্ষেত্র বেছে নিয়েছে। ঠিক ওই জায়গাটাতেই ভিড় সবচেয়ে বেশি জ'মে উঠেছে এবং সেটা উঠেছে আশেপাশের দোকানদারদের কারসাজির গুণে। বিক্রির জন্যে যেসব জিনিস সামনে সাজানো হয়েছে তার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুমাত্র নেই সেখানে সাজানো ছিল নারকেল, টার্কিশ এবং আরও অন্যান্য রকমের গাঢ় রঙের চকলেট। দোকানের মালিক কয়েকটা পামগাছ এবং গোটা কয়েক বিদেশী ছবি টাঙিয়ে তার দোকানকে যে শুধু প্রাচ্যদেশীয় চেহারা দিতে চেষ্টা করেছে তাই নয়, তার ওপরে তাকে আরও জমকালো ক'রে তোলার জন্য একটা বিরাট খাঁচায় পুরে রেখেছে তিনটে বড় বড় বাঁদর। বাঁদরের যেটা সহজাত ধর্ম তাই পালন ক'রে চলেছে তারা অবিরাম দাঁত খিঁচোনো আর তার সঙ্গে লম্ফঝম্ফের হরেক রকম কসরত।

ফন্দি ফলপ্রসূ হয়েছে কারণ, জানলার সামনে ভিড় জ'মেই আছে সব সময়ের জন্যে। মহিলাদের সকৌতুক কলরব এই কথাই প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে যে, চার হাত ও লেজবিশিষ্ট এই জীবদের পুরুষজাতির ভাবভঙ্গি ও চাল-চলন অনুকরণ করতে দেখে তাঁরা বেশ আমোদই উপভোগ করছেন।

যখনই কিছু লোক জানলার সামনে জড়ো হ'য়ে সবিস্ময়ে হাঁ ক'রে তামাশা দেখছে, ক্যানারী রঙের কোট পরিহিত আমার বন্ধুটি তখনই এসে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ছেন—সুট সুট ক'রে। 'দি টুন্টার্স টেল' কিংবা 'অলিভার টুইস্ট' প্রভৃতি গ্রন্থে পকেটমারদের হাতসাফাই সম্বন্ধে অনেক মনোরম বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আরও অনেক কথাই আজ পর্যন্ত বলা হয়নি। আমি জানি, সুচতুর পকেটমারের পক্ষে লোকের ভিড় ঠিক তেমনিই অপরিহার্য, ডিম পাড়বার সময় হেরিং মাছের পক্ষে ঝাঁকবন্দী হ'য়ে থাকা যেমন অবশ্য-প্রয়োজনীয়; কারণ, ভিড় যখন ঘন হ'য়ে জ'মে ওঠে তখনই

লোকের পক্ষে টের পাওয়া অসম্ভব হয় যে, একখানা অদৃশ্য হাত অসাড়ে এসে তার মনিব্যাগ বা পকেট-ঘড়ি নিয়ে নিঃশব্দে স'রে পড়েছে। তা ছাড়া, চোরের রাজ্যে সবাই নিজের জিনিসপত্র সম্বন্ধে কিছু না কিছু পরিমাণ সতর্ক থাকেই, সে ক্ষেত্রে পকেট যার মারতে হবে—সাময়িকভাবে অন্তত তার সতর্কতাকে সম্মোহিত করা যদি সম্ভব না হয় তাহ'লে হাতসাফাইয়ের কেরামতি দেখানো কষ্টকর হ'য়ে ওঠে। পথের ধারে যেখানে অগ্নিকাণ্ড ঘটে, পকেট মারার পক্ষে তা হ'য়ে ওঠে প্রশস্ততম স্থান, এখানে অগ্নিকাণ্ডের স্থান গ্রহণ করেছে বাঁদরদের হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি। তাদের মুখ ভ্যা চানো, দাঁত খিঁচোনো অজান্তেই আমার পকেটমার বন্ধুর ভুক্কাযে সহযোগী হ'য়ে উঠল।

আমি যদি বলি, নিজের আবিষ্কারের দরুন আমি নিজেই উৎসাহে উদ্দীপিত হ'য়ে উঠেছিলাম, আশা করি তার জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গ আমাকে মার্জনা করবেন। পকেটমার জীবনে আমি এই প্রথম দেখলাম, এবং নতুন দেখা জিনিস মাত্রই কৌতূহলজনক। না, ব্যাপারটা ঠিক • •য় আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, পকেটমারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ এই দ্বিতীয়বার। আমার ছাত্রাবস্থায় লণ্ডনে অবস্থানকালে ইংরেজী কথ্যভাষাটা আরও ভালোভাবে আয়ত্ত করবার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে পুলিশ কোর্টে আমি যেতাম সেখানকার কার্যপদ্ধতি দেখবার ও শোনবার জন্যে। সেখানে একবার দেখেছিলাম দু জন বিরাটকায় পুলিশ কনস্টেবল একজন ছোকরাকে ধ'রে নিয়ে কাঠগড়ায় তুলছে। ছোকরার মাথার চুল শালগম রঙের তার গাল দুটো টোল-পড়া। টেবিলের ওপর প'ড়ে আছে একটা চামড়ার থলে। সাক্ষী শপথ ক'রে এজাহার দিল, এবং বিচারক কয়েকটি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা লহমার মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। যতদূর বুঝলাম, সে দণ্ডিত হয়েছে ছ' মাসের কারাদণ্ডে।

পকেটমার দেখা সেই আমার সর্বপ্রথম, কিন্তু সেবারের সঙ্গে এবারের পার্থক্য প্রচুর। সেবারে আমি সত্যিকার পকেটমার দেখিনি, দেখেছিলাম এমন একজন লোককে যে পকেটমারার অপরাধে অভিযুক্ত হ'য়ে বিচারের জন্যে আদালতে আনীত হয়েছে আর দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে যার অপরাধ সম্বন্ধে। আমি তাকে হাতে হাতিয়ারে পকেট মারতে দেখিনি, দেখেছি শুধু বিচার বিভাগীয় বিধিব্যবস্থা। আমি দেখলাম একটা লোক

অভিযুক্ত হ'ল আর সে দণ্ডিত হ'ল। পকেট যখন সে মারছে, তেমন অবস্থায় তাকে চোখে দেখিনি। চুরি যখন সে করছে তখনই সে চোর, তারপরে নিজের আচরণ সম্বন্ধে জবাবদিহি করবার জন্য যখন সে আদালতে আসে প্রকৃতপক্ষে তখন সে চোর নয়। ঠিক যেমন কবি বলতে কোনো একজন লোককে তখনই বোঝায় যখন সে কাব্য-সৃষ্টি করছে, তারপর হয়তো কয়েক বৎসর পরে সে যখন বেতারযোগে কবিতা আবৃত্তি করে তখন সে কবি নয়। শিল্পী সম্পর্কে সেই একই কথা শিল্প যখন সে সৃষ্টিরত তখনই সে শিল্পী। যে কোনো কাজে যে কেউ যতক্ষণ রত ততক্ষণই সে কাজের সে কর্তা। এতদিন পরে সত্যিকার পকেটমার দেখবার ইন্দ্রজাল সম্মোহের সম্ভাবনাপূর্ণ মুহূর্ত আমার জীবনে এল। আমি এবার পকেটমারকে দেখব কার্যরত অবস্থায়, হাতে-নাতে চুরি করতে গিয়ে যখন সে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে, তার স্বভাবজ সত্যকার সত্তাকে বিকশিত ক'রে তুলছে। সন্তানের জন্মদান-ক্ষণের মতই দুর্লভ সে মুহূর্ত ক্বচিৎ-কখনও জনসাধারণের সামনে প্রতিভাত হয়। সে সম্ভাবনা আমার শিরায় স্নায়ুতে জাগিয়ে তুলল পুলকের রোমাঞ্চকম্পন।

বলা বাহুল্য, সুযোগের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করতে আমি সচেষ্ট হলাম। প্রাথমিক উদ্যোগপর্বের একটি দফাও আমি হারাতে রাজি নই, মধ্য এবং চরম মুহূর্ত তো নয়ই। হাতসাফাইয়ের এই খেলার মধ্যে যে রহস্যবাজি লুকোনো রয়েছে আমি চাই তাকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত ক'রে দিতে। কাফের যে জায়গাটাতে আমি বসেছিলাম, পর্যবেক্ষণের কাজ চালাবার তা বিশেষ উপযোগী নয় ব'লে আমি তখনই সে জায়গা ছেড়ে চ'লে এলাম। আমার দরকার এমন একটা জায়গার, সুবিধাজনক যে স্থানে ব'সে ওস্তাদ খেলোয়াড়ের হাতের খেলা আমি দেখব, অথচ সে আমাকে ধরতে পারবে না। প্যারীসে তখন যেসব নাটকের অভিনয় চলছে, বিচিত্রব[illegible] তারই বিজ্ঞাপন সাঁটাবার জন্য একটা বোর্ড ছিল, আমি দেখলাম, পাকা পকেটমারের কার্যক্রম লক্ষ্য করবার পক্ষে জুতসই যায়গা সেইটেই। যেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিজ্ঞাপনগুলো পড়ছি এইরকম ভাব দেখিয়ে আমি বোর্ডটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। অথচ আসলে আমার বন্ধুর সুদক্ষ আঙুলের প্রত্যেকটি কারিগরি আমি লক্ষ্য করছি। এমনিভাবে প্রায় এক ঘণ্টার অধিক কাল আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম প্রহরারত অবস্থায়। এই সময়ের মধ্যে ধূর্ত ও সুন্দর সেই লোকটা তার

কঠিন কারবার ও বিপজ্জনক ব্যবসা চালু করবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে চলেছে। আমি যে গভীরতর মনোযোগ ও ব্যগ্রতার কৌতূহলের সঙ্গে তার গতিবিধি লক্ষ্য করছি, কোনো নাম-করা নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনীতে, অথবা বহুবিঘোষিত কোনো চিত্রনাট্য দেখবার সময় তেমন করেছি ব'লে মনে হয় না ; কারণ, জমাট ও জীবন্ত বাস্তব রোমাঞ্চ সৃষ্টির সমকক্ষতার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ শিল্পকে হার মানায়।

এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত এই এক ঘণ্টা সময় আমার বুল্ভাবে কেটে গেল বিদ্যুৎগতিতে, কারণ স্বল্পপরিমিত এই সময়ের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ এবং অসংখ্য ঘটনা ও সিদ্ধান্তে ভরা। এই এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ঘ'টে যাওয়া পর পর ঘটনাগুলো আমার স্নায়ুকেন্দ্রের ওপর এমন প্রচণ্ড আঘাত হেনে গেছে যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে আমি তার বর্ণনা বিবৃত ক'রে যেতে পারি। প্রকাশ্য দিবালোকে সদর রাস্তার ওপর পকেটমারা যে কি দুরূহ, কি জটিল ও ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ কাজ সে কথা ইতিপূর্বে আমার কখনও ধারণাতেই আসেনি। এর আগে পর্যন্ত পকেটমারদের সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল যে, তারা নিশ্চয় খুব দুঃসাহসী এবং হাতসাফাইয়ের দিক থেকে বাজিকরদের মতো কুশলী।

"অলিভার টুইস্টে"র কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। ফ্যাগিন তার নিজের আস্তানায় কেমন ক'রে শিক্ষানবিসদের রুমাল চুরি করতে শেখায়, ডিকেন্স তার বইয়ে তারই বর্ণনা দিয়েছেন। পথচলতি একজন সাধারণ লোক যে কোটখানা গায়ে দিয়ে চলেছে তার পকেটে আছে একটা রুমাল এবং পকেটের সামনের দিকে লাগানো রয়েছে একটা ঘণ্টা, শিক্ষানবিসকে শিখতে হবে সেই কলাকৌশল, যার সাহায্যে পকেট থেকে রুমালটা এমন লঘু হাতে তুলে নেওয়া যাবে যে, ঘণ্টাটা একটু আওয়াজ পর্যন্ত করবে না। আমার মনে হয়, ডিকেন্স সাহেব হাতসাফাইয়ের ওপরই জোর দিয়েছেন বেশি। আমি যেমন আজ পকেটমারকে কার্যরত অবস্থায় দেখছি তিনি সম্ভবত তেমন অবস্থায় কাউকে দেখেননি কাজেই তিনি কোনোদিন ধারণাও করেননি যে, চুরির কারবার চালাতে হ'লে পকেটমারকে হাতসাফাই ছাড়াও আরও নানা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হয়। আত্মসংযম ও উপস্থিত বুদ্ধির মানসিক উৎকর্ষ তার থাকাই চাই। তা ছাড়া আরও থাকা চাই স্থির মস্তিষ্কে দ্রুত চিন্তা

কববাব শক্তি আব সব চাইতে বেশি দবকাব দুর্জয় সাহস। মাত্র কুড়ি মিনিটের জন্যে তাব কাযপদ্ধতি লক্ষ্য ক'বে আমি নিঃসংশয়ে বুঝতে পাবলাম যে, পকেটমারেব লক্ষ্য ও সিদ্ধান্ত হওয়া চাই অস্ত্রোপচাবে পাবদর্শী সার্জেনেব মতোই অভ্রান্ত। আহত হৃদ্‌যন্ত্র জোড়া দেবাব সময মুহূর্তেব বিলম্ব হযতো বোগীব পক্ষে মাবাত্মক হতে পাবে। এই ধবনেব অস্ত্রোপচাবেব ক্ষেত্রে বোগীকে অচেতন কবা হয। কাজেই তার নড়বাব কি বা প্রতিবোধ কববাব ক্ষমতা থাকে না, কিন্তু পকেটমাবকে যাব ওপব হাত চালাতে হয সে সম্পূর্ণরূপে সচেতন এবং বুক পকেটেব যেখানে নোট বইটা থাকে সে স্থানটা প্রখব অনুভূতিসম্পন্ন।

পকেটমাবকে যখন যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতাব সঙ্গে নিবাতিশয উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে তাব হাত চালিযে যেতে হবে, তখন মুখে তাকে ফুটিযে তুলতে হবে এক প্রশান্ত উদাসীন ভাব। কোনো কাবণেই উত্তেজনাব লেশমাত্র তাব প্রকাশ কবা চলবে না, কি বা ছুবি চালাবাব ঠিক পবমুহূর্তে খুনীব চোখে য আগুন জ্ব'লে ওঠে তাব আভাস পর্যন্ত তাব চোখে প্রকাশ পাবে না। চোব যখন মাল মাববাব জন্য তাব হাত বাড়াচ্ছে, তখন ধাক্কা যদি কাবও গাযে লাগেও, সাধাবণ ভদ্রতাসুলভ বিনয় সহকাবে তাকে বলতে হবে 'মাফ করুন'। কেবল কাজেব সময়ই সতর্ক ও কুশলী হলেই যথেষ্ট হবে না। মানবচবিত্র পাঠ কববাব মতো তাব যে জ্ঞানবুদ্ধি আছে তাব প্রমাণ তাকে পবাক্ষেই দিতে হবে, যাকে শিকাব হিসাবে সে বেছে নিযেছে সে শিকাব হবাব পক্ষে যোগ্য পাত্র কিনা তা স্থিব কববাব জন্য তাকে প্রযোগ কবতে হবে দৈহিক আব মনস্তাত্ত্বিক বিচাব-বিশ্লেষণ শক্তিব। যাবা অসন্দিগ্ধ ও অসতর্ক, এ মৃগয়াব তাবাই সেবা শিকাব এব তাদেব মধ্যেও আবাব যাবা ওভাবকোটেব বোতাম আঁটে না অথবা জোব কদমে দ্রুত পাযে চলে না ব'লে সহজে পাল্লাব মধ্যে পাওয়া যায, তাবা সর্বোৎকৃষ্ট। গভীব মনোযোগেব সঙ্গে লক্ষ্য কববাব ফলে আমাব মনে হল, পকেটমাবেব দৃষ্টিকোণ হ'তে দেখলে এক শো কিংবা পাঁচ শো পথচাবীব মধ্যে ভালো শিকাবরূপে গণ্য হবাব যোগ্য লোকেব সংখ্যা দু'-একটিব বেশি নয। দুঃসাহসী পকেটমাবকে হাত চালাতে হবে এই ধরনেব দু'-একটি ব্যতিক্রমেব ওপবেই এবং তা সত্ত্বেও তার অকৃতকার্য হবাব সম্ভাবনাই বেশি, কাবণ, কৃতকার্যতা লভ্য হয অসংখ্য

ঘটনার অনুকূল যোগাযোগের ফলেই। পকেটমার যখন নিজের কাজের ওপর গভীর অভিনিবেশ নিবদ্ধ করেছে, এমনকি, তখনও তাকে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে—কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা। এই একটা মাত্র ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, কতখানি অভিজ্ঞতা সচেতনতা ও আত্মসংযম থাকা দরকার। যে কোনো একটা কোণে দাড়িয়ে হয়তো কোনো পুলিশ কনস্টেবল অথবা গোয়েন্দা গুপ্তচর তাকে লক্ষ্য করছে। এইসব পেশাদার চোরধরা লোকগুলো ছাড়াও আমার মতো এমন বহু ব্যক্তি পথে গিজ্‌গিজ করছে, অপরের সম্বন্ধে নিজেদের কৌতূহল চরিতার্থ করা ছাড়া আর অন্য কিছু তাদের করবার নেই। তা ছাড়া দোকানগুলোর সামনে বড় বড় আয়না সাজানো রয়েছে, সেগুলোর ওপর তার ক্রিয়াকলাপের ছায়া প্রতিফলিত হতে পারে, ফলে, যে লোকটা তার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে, সেও হয়তো আয়নার মধ্যে তাকে লক্ষ্য করছে তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। আয়নার কথা বাদ দিলেও, দোকানের জানালাগুলোও অত্যন্ত বিপজ্জনক স্থান, কারণ, গ্রাহক এবং দোকান-কর্মচারিদের দৃষ্টি জানালার কাচের ভেতর দিয়ে তাকে লক্ষ্য করতে পারে। উদ্দীপনার চাপ প্রচণ্ড, বিপদের ঝুঁকি প্রবল। একটুমাত্র ভুলের জন্য তিন চার বছরের কারাবাস অবশ্যম্ভাবী, আঙুল একটু কাঁপলে, পকেট টান একটু জোরে লাগলে গ্রেপ্তার অনিবার্য।

প্রকাশ্য দিবালোকে বুলভারে পকেটমারা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তার জন্য প্রয়োজন দুর্জয় সাহসিকতার। সেদিন সেই এপ্রিলের সকাল থেকে আমার মনে এই বোধ জন্মেছে যে, খবরের কাগজগুলো যখন পকেটমার সম্বন্ধে খবর পরিবেশন করতে গিয়ে মাত্র দু' এক লাইনেই তাদের বক্তব্য শেষ করে দেয়, তখন পকেটমারের প্রতি তারা অবিচারই করে থাকে, তারা ভাবে, অন্যান্য অপরাধের মতো পকেটমারাও যেন একটা অতি তুচ্ছ ও নগণ্য অপরাধ। বেলুনে চেপে মহাকাশ যাত্রার জন্য যতখানি সাহস দরকার, এইরকম পরিস্থিতির মধ্যে ঘড়ি বা মনিব্যাগ চুরি করতে সাহসিকতার প্রয়োজন প্রায় তার সমপরিমাণ, অথচ বেলুন ওড়ার খবর বড় বড় হরফে ছেপে ছড়িয়ে দেওয়া হয় বিশ্বময়। কারিগরি, কলাকৌশলের ক্ষেত্রে বিজয় অর্জন করবার জন্য যতখানি উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজন, এর বেলায় তার চেয়েও ঢের বেশি চিন্তাশীলতার দরকার হয়, বেশির ভাগ রাজনৈতিক ও সামরিক

কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে মনোবলের যতখানি দৃঢ়তা দরকার হয়, এ ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন তার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। কোনো সফলতার পরিমাপ করতে গিয়ে লোকে যদি শেষ ফলাফলের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ না ক'রে হিসাব করত—সে সাফল্য অর্জন করতে কি পরিমাণ স্নায়ুশক্তি ব্যয়িত হয়েছে, তাহ'লে নৈতিক ঘৃণা সত্ত্বেও পকেটমারার ঘটনাকে এমন লঘুভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ক'রে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হ'ত না। মর্যাদাকর হোক অথবা অমর্যাদাজনকই হোক, হাতের কাজ যত রকমের আছে, আমার মনে হয় আমাদের আলোচনাধীন কাজটিই তাদের সবচেয়ে কঠিন এবং বিপজ্জনক, এ কৌশল পরিপূর্ণভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হ'লে প্রায় সূক্ষ্ম শিল্পের কোঠায় গিয়ে পৌছয়। প্যারীসের সেই এপ্রিল দিনের অর্জিত অভিজ্ঞতা আমার মনে চিরদিনের জন্য এই ধারণা বদ্ধমূল ক'রে দিয়েছে।

এ শুধু অভিজ্ঞতার কথা নয়, নিরীক্ষার কথাও নয়, সত্য কথা বলতে গেলে, এ যেন আমার সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথা। মাত্র প্রথম কয়েক মিনিটের জন্য ক্যানারী রং কোটওয়ালা আমার বন্ধুটিকে বৈজ্ঞানিকোচিত অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করতে পেরেছিলাম। কোনো বিষয়ের ধ্যানের সঙ্গে যখন নিবিড় ও গভীর ভাবাবেগ যোগ হয়, তখন তা হ'তে জন্ম নেয় সহানুভূতি। এই কারণে নিজের অনিচ্ছায় আর অজ্ঞাতেই চোরের সঙ্গে আমার একাত্মতা অনুভব করতে লাগলাম, তার দেহযন্ত্রের ভেতরে ঢুকে পড়ে তারই প্রত্যেকটি নড়াচড়ার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে লাগলাম। আমি তখন আর দর্শক নই, আমি তখন মনের দিক থেকে হয়ে উঠেছি তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। অবাক কাণ্ড! পনের মিনিট যেতে না যেতেই দেখি যে, আমি রীতিমতো পরীক্ষা করা শুরু ক'রে দিয়েছি, পথচারীদের মধ্যে আজকের এই মৃগয়ায় শিকারের পক্ষে যোগ্য পাত্র কে? আমি লক্ষ্য করছি, ওদের কোটের বোতাম খোলা বা আঁটা, তারা অন্যমনস্ক, না সম্পূর্ণরূপে সচেতন, কোন্ লোকটার চং বা দেখে মনে হয় তার পকেটে এমন একটা মোটা নোটের তাড়া থাকা সম্ভব—যা নিলে বন্ধুর আমার হাতসাফাইয়ের খেলা দেখবার মজুরি পোষাবে। এত অল্প সময়ের মধ্যে পরিষ্কারভাবে এও আমার বোধগম্য হ'ল যে, যে সংগ্রাম চলেছে আমি তার নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র নই, আমি তখন একান্তভাবে মনে মনে এই

কামনাই করছি যে, আমার বন্ধুর অভিযান যেন সাফল্যমণ্ডিত হয়। তাকে তার কাজে সাহায্য কববার আগ্রহ আমাব মনে এমন প্রবল হ'য়ে উঠল যে, তাকে সংযত করতে আমাকে বিশেষ বেগই পেতে হ'ল। অবশেষে একটা সুযোগ যখন সে হাবাতে বসেছে তখন এই কথাটা ইশারায় জানিয়ে দেবার জন্য এক অদম্য আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসল যে, "ওই দেখ ওই যে মোটাসোটা লোকটা বগলে একরাশ ফুল নিয়ে যাচ্ছে—সেই আজকেব খেলায় তোমাব নির্বাচিত শিকাব।"

একবাব লোকটা যখন ভিড়েব ভেতরে আবাব ঠেলে ঢুকেছে, এমন সময় পথেব বাঁকে দেখা গেল একজন পুলিশকে। এই দেখে আমাব পা দুটো এমন থবথব ক'বে কাঁপতে লাগল, যেন আমিই নিজে ধবা পড়তে বসেছি আব কি! মনে হ'ল একখানা ভাবি হাত এসে যেন আমারই ঘাড়ে পড়েছে, ওব নয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পকেটমাবটা সেবাব চুরি কবতে চেষ্টা না ক'বে চুপচাপ ভিড়েব ভেতর স'বে পড়েছে, কাজেই আইনেব আদবেব দুলালেব দৃষ্টি সে বেমালুম এড়িয়েই গেল। এসবই বিশেষ উত্তেজনাকব সন্দেহ নেই, কিন্তু সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত তখন পর্যন্ত আসেনি। চোবেব সঙ্গে আমাব একাত্মবোধ যতই নিবিড় হ'য়ে আসে, আমি ততই অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠি এই কথা ভেবে যে, কোনো শিকাব এখন পর্যন্ত লোকটাব হাতে এল না কেন? তাব অন্তহীন দ্বিধা-সংকোচ শেষ পর্যন্ত আমাকে রুষ্ট ক'বে তুলল। "আহাম্মক! সাহস ক'বে কাজে লেগে পড়ছ না কেন? হয় এটা, নয় ওটা, যেটা হোক একটা সুযোগ নিলেই তো হয়। যা হোক একটা কিছু ক'বে দেখাও যে, নিজেব কারবারে তোমার হাত কাঁচা নয়।"

তার কাজেব সঙ্গে মনের দিক দিয়ে আমি যে এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছি—ভাগ্যে সে কথা সে টেব পায়নি, তাই আমাব অসহিষ্ণুতা চাঞ্চল্য আনেনি তাব মনে। সুদক্ষ শিল্পীও সৌখীন শিল্পবিলাসীব মধ্যে মূলগত পার্থক্যটা হ'ল এই যে, পাকা ও পাবদর্শী শিল্পী এ কথা ভালোভাবেই জানে যে, বহু ব্যর্থ প্রচেষ্টাব পর প্রয়াস তাব পুরস্কৃত হয় চূড়ান্ত সাফল্যের দ্বাবা, এ সম্বন্ধে সে সচেতন ব'লেই ধৈর্য ধ'বে সব শেষ সুযোগেব জন্যে অপেক্ষা করতে সে অভ্যস্ত। কোনো নিপুণ কবি যখন মনেব কোনো ভাবকে কবিতায় রূপদান করতে বসেন, হয়তো হাজারো ছাঁচ ও ছক তাঁর মনের ওপর দিয়ে আসা-

যাওয়া করে, কোনো সৌখীন বা শিক্ষানবিস কবি হ'লে তার যে কোনো একটাকেই হয়তো সে তখনই সাগ্রহে লুফে নিত, কিন্তু সত্যকার রূপকার যিনি, "এইসব লোভনীয় অতিথিদের উপেক্ষা ক'রে সেই সুষ্ঠুতম প্রকাশভঙ্গির জন্য ধৈর্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা করতে তিনি জানেন—তার ধ্যানের ধন যার মধ্যে কাম্য কলেবর লাভ করবে। ঠিক তেমনিভাবে যেসব মুহূর্ত আমার মতো কাঁচা চোখের কাছে স্বর্ণ সুযোগ ব'লে মনে হয়েছিল পাকা পকেটমার সেটা ছেড়ে দিল পরম উপেক্ষাভরে, এবং এই সময়ের মধ্যে অন্ততপক্ষে এক শো পকেটের গায়ে সে হাত বুলিয়ে থাকবে, কিন্তু একটা সুযোগও তার পছন্দসই হ'ল না। কাজেই অক্লান্ত ধৈর্য ও অলীক ঔদাসীন্যের সঙ্গে দোকানের জানলার গোড়া থেকে ত্রিশ পা মতন জমি মাড়িয়ে সে বারবার যাওয়া-আসা করতে লাগল। সে যায় আর আসে, আসে আর যায় আর আনাগোনার পথে প্রত্যেকটা সম্ভাবনা, প্রত্যেকটা সুযোগকে সূক্ষ্মভাবে সে পরীক্ষা ক'রে দেখে,—এমন এক সম্ভাবিত বিপদের পানে চেয়ে যার অস্তিত্ব অন্তত আমার চোখে ধরা পড়ে না। তার শান্ত ও অবিচলিত অধ্যবসায় শ্রদ্ধায় আমার মন ভ'রে তুলল আর নিজের অসহিষ্ণুতা সত্ত্বেও আমার মনে এই নিশ্চিত প্রত্যয় এনে দিল যে শেষ পর্যন্ত সাধনা তার সাফল্যমণ্ডিত হবেই। আমার দিক থেকে আমিও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, যতক্ষণ না তার চেষ্টা ফলবতী হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর নজর রাখা থেকে আমি বিরত হব না—তাতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত যদি আমাকে এই জায়গায় ব'সে থাকতে হয় সেও স্বীকার।

এখন ঠিক দুপুর। প্যারীসের রাজপথগুলোতে জনস্রোতের প্লাবন বইতে শুরু হয় এই সময়ে, এই সময়েই অসংখ্য অলিগলি, উঠোন ও সোপানশ্রেণী থেকে জনতার ছোট ছোট স্রোতস্বিনী বেরিয়ে এসে বুলভারসমূহের প্রশস্ত নদীবক্ষে তাদের প্রবাহ ঢেলে দেয়। কল আর কারখানা থেকে, অফিস, স্কুল ও দোকানগুলো থেকে দলে দলে স্ত্রী ও পুরুষ কর্মীরা ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল, শ্রমিকরা এল সাদা কিংবা নীল রঙের ওভারঅল্ গায়ে দিয়ে, মহিলা কর্মীরা এল চুলে ভায়লেট ফুলের গুচ্ছ প'রে, যারা নিম্নপদস্থ কর্মচারী তাদের পরনে ঝকঝকে ফ্রককোট, প্রত্যেকের হাতে ঝুলছে অপরিহার্য সেই ফোলিও ব্যাগ, যে কোনো রকম হস্তর কারিগর যারা তারাও

বেরিয়ে এল। এক কথায় বলতে গেলে, যাদের অদৃশ্য হাত মহানগরীর কাজকর্ম অলক্ষ্যে ক'রে চলেছে—মুক্ত আকাশের তলায় বেরিয়ে আসতে তাদের কেউ বাদ পড়ল না। অনেকক্ষণ তারা রুদ্ধ কক্ষের বদ্ধ হাওয়ায় আটকানো ছিল, এইবারে তারা হাত-পা মেলে বসতে পারবে, যথেচ্ছ রসনা সঞ্চালন করতে পারবে আর দম ভরে মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নিতে পারবে। তারা ইতস্তত গুঞ্জন ক'রে বেড়াচ্ছে ব'কে চলেছে নিজেদের খুশি-খেয়ালমতো, সিগারেট টান দিয়ে ধোঁয়া উদ্গিরণ করছে, দেখতে দেখতে মাখন তৈরির কারখানা, কাফে আর মদের দোকানগুলো ভ'রে উঠল অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্যে। স্বাধীনতার মেয়াদ মাত্র এক ঘণ্টা। সে সময়টুকু উত্তীর্ণ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তারা সংকীর্ণ কক্ষের রুদ্ধ বাতায়নের পাশে যেয়ে আসন গ্রহণ করবে কেউ বসবে অফিসের বেঞ্চে, কেউ বা দেবে ছুঁচের কাজে হাত আবার অন্য কেউ হাত লাগাবে সেদ মেশিনে, কেউ করবে দরজীর কাজ, কেউ বা করবে জুতো সেলাই, আরও কত রকমের কাজে যে তারা লেগে পড়বে কে তার ইয়ত্তা রাখে। এ কথা জানে বলেই এক ঘণ্টার স্বাধীনতার তারা পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চায়। সুযোগ যখন মিলেছে, তখন অবসন্ন পেশী-শিরাকে সঞ্জীবিত ও অবসাদগ্রস্ত চিত্তকে বিনোদিত ক'রে তুলবে না কেন? স্বাধীনতার স্থায়িত্বকাল যে এক ঘণ্টা মাত্র সে কথা জানে বলেই তারা চায় আলো, চায় আনন্দ, চায় নূতনত্ব ও অবসর বিনোদন। স্পষ্টই বোঝা যায়, তাদের চিত্ত বিনোদনের বিনিময়ে লাভবান হবে ওই দোকানের মালিক যে মর্কট প্রদর্শনী খুলে বসে আছে নিজের দোকানের সামনে। আকর্ষণীয় জীবগুলো যে জানলার সামনে ব'সে রয়েছে, ভিড় সেখানে জ'মে উঠল ক্রমে ঘনতর হয়ে। এক ঝাঁক পাখির মতো কাকলীমুখর নারী কর্মীরা রয়েছে সব আগের সারিতে, তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে মজুর আর ভবঘুরের দল, হালকা রসিকতায় তাদের রসনা মুখর। ভিড় যত ঘন হ'য়ে জমে ওঠে, কানারী রঙের কোট পরা লোকটা ততই ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করে। তার গতি-বিধি দেখে মনে হয় একটা 'গোল্ড ফিশ' যেন ভেসে বেড়াচ্ছে এক বাটি জলের মধ্যে।

আমি মনে মনে বললাম, যদি কাজে সে আদৌ নামে তবে এখুনি, নইলে

কখনো না। যে জায়গাটায় বসে আমি এতক্ষণ তার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলাম, সে স্থানটা বেশ জুতসই ব'লে আমার মনে হল না। কর্মক্ষেত্রের কাছাকাছি এমন জায়গা আমার দরকার যেখান থেকে হাতসাফাইয়ের খেলা স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। কিন্তু পছন্দমতো তেমন জায়গা খুঁজে পাওয়া কঠিন। লোকটা পাঁকাল মাছের মতো পিছল ব'লে ভিড়ের যে কোনো ফুটো ফাটল দিয়ে সে স্বচ্ছন্দে ঢুকে পড়তে পারে। এক মুহূর্ত আগে সে আমার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, এরই মধ্যে দেখি, জানলার কাচের গায়ে নাক ঠেকিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে, কাজেই নিমেষের মধ্যে দর্শকদের পাঁচ ছটা সারি ভেদ ক'রে যে এগোতে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

আমি তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম তার চেয়েও ধীর পদে, তার চেয়েও সতর্কতার সঙ্গে, আমার দৃষ্টি সর্বক্ষণ নিবদ্ধ রয়েছে তার ওপর যাতে ক'রে আমি জানালার কাছে পৌঁছবার আগেই সে ডাইনে কি বা বাঁয়ে সট্ ক'রে স'রে পড়তে না পারে। চলতে চলতে হঠাৎ সে মাঝপথে থমকে দাঁড়াল। কাজেই উৎকণ্ঠিত হবার কোনো হেতু ছিল না। অবস্থার পরিবর্তনের নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে এই ভেবে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে যারা তার সবচেয়ে কাছাকাছি তাদের ওপর নজর রাখতে উদ্যত হলাম। তাদের মধ্যে একজন একটি হৃষ্টপুষ্ট স্ত্রীলোক। দেখেই মনে হয় অত্যন্ত দুঃস্থ অবস্থাপন্ন মেয়ে সে। সে ডান হাত দিয়ে ধ'রে আছে বছর এগারো বয়সের একটি পিটে বাচ্চা মেয়ের হাত আর বাঁ হাতের অয়েল ক্লথের তৈরি থলের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে খাঁটি ফরাসী কায়দায় তৈরি একটা বাণ্ডিল। পরিষ্কার বোঝা যায় পারিবারিক মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন আছে ওর মধ্যে। তার মাথায় টুপি নেই, গায়ে প'রে আছে সস্তা দামের চেক ডোরা কাপড়ের তৈরি একটা গাউন। জনসাধারণের এই যোগ্য প্রতিনিধি বাঁদরদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো। হাসির চোটে স্থূল দেহখানা তার এমন প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি খাচ্ছে যে, তার থলের বাণ্ডিলগুলো পর্যন্ত নড়ছে এদিকে ওদিকে। তার এই অসংযত অট্টহাস্য দর্শকদের আনন্দদানের ক্ষেত্রে বাঁদরগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়াল। চারিদিকে যারা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তারা এমনভাবে দেখছে তাকে যেন বানরগুলোর চেয়েও বিচিত্র জীব সে। ট্যাঁকে যার টাকা নেই, তার ভাগ্যে তামাশা দেখবার সুযোগই বা ক'টা, কতটুকু। তাই

যেটুকু সুযোগ সে পেয়েছে, সেটুকু উপভোগ ক'রে নিচ্ছে প্রাণখোলা আনন্দের সঙ্গে। বিনা পয়সায় তামাশা দেখবার সুযোগ কাঙ্গালের ভাগ্যে নেমে আসে দেবতার দানরূপে, তাই তার মধ্যে তারা মন-মাতানো আনন্দের খোরাক খুঁজে পায়। সে স্বার্থপরের মতো একা নিজেই উপভোগ করছে না, বারবার তার মেয়েটির দিকে ঝুঁকে প'ড়ে পুলকোচ্ছল কণ্ঠে সে বলছে, মারগারিত, দেখছ তামাশা? তামাশার একটি দফাও যাতে সেই রুগ্ন পাণ্ডুর ও লাজভীরু মেয়েটার দৃষ্টি না এড়ায় সে দিকে তার লক্ষ্য সব সময়ে সজাগ। চমৎকার দেখতে মেয়েটি, অটুট স্বাস্থ্য যেন তার সর্বাঙ্গ দিয়ে ফেটে পড়ছে। তাকে দেখবামাত্র মনে প'ড়ে যায় ধরিত্রীর মূর্তিময়ী প্রতীক গ্রীক দেবতা 'জিয়া'র কথা। আমার ইচ্ছে হ'ল তাকে দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে আমি জানাই যে, তার আনন্দের আমিও অংশভাগী। কিন্তু হঠাৎ আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। অসতর্কতা গরিবদের সহজাত স্বভাবধর্ম এবং সেই ধর্মবশেই মেয়েটির বাজারের থলেটা মুখ-খোলা অবস্থায় অত্যন্ত বেসামালভাবেই ঝুলে রয়েছে। হঠাৎ দেখি, সেই ক্যানারী রঙের কোট পরা লোকটার জামার হাতাটা ক্রমেই এগিয়ে চলেছে সেই থলেটার দিকে।

এই মরেছে! আনন্দে মাতোয়ারা ওই মেয়েটার থলের মধ্যে যে মনি-ব্যাগটা আছে তারই মধ্যে রাখা পয়সা কয়টা ও চুরি করবে নাকি! মনে করবামাত্র আমার আত্মা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল সে ধারণার বিরুদ্ধে। এতক্ষণ পর্যন্ত পকেটমার সম্বন্ধে আমার মনোভাব ছিল কিছুটা শিকারীসুলভ। আগেই বলেছি, আমি তার সঙ্গে নিজেকে একাকার ক'রে ফেলেছি, আমি আশা করেছি এবং কামনা করেছি, তার এই দুঃসাধ্য সাধনা যেন শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়, একটা মোটা কোনো শিকার যেন তার হাতে আসে। কিন্তু যখন দেখলাম, যে মেয়েটির সবস্ব সে অপহরণ করতে উদ্যত হয়েছে সে হয়তো তার জীবিকার্জনের জন্য ক'টি টাকার বিনিময়ে, কয়েক ঘণ্টার জন্য কারও ঘরের মেঝে ঘষে, তখন হাস্যময়ী ও আনন্দমুখর সরলচিত্ত মেয়েটির দিকে চেয়ে সেই প্রথম ইচ্ছে হ'ল, চিৎকার ক'রে বলি, হাত হটাও বদমায়েস! গরিব বেচারীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কারও ওপর তোমার হাতের কসরত দেখাও। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বাজারের থলে আর লোকটার মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। যেই না দাঁড়ানো, অমনি ক্যানারী রঙের কোট পরা লোকটা

ফিরে দাঁড়াল এবং আমার গায়ে ধাক্কা মেরে চ'লে যেতে যেতে ক্ষীণ ও বিনীত কণ্ঠে ব'লে গেল, মাফ্ করবেন মশাই। পকেটমারদের এই অভ্যস্ত বুলি সুস্পষ্টভাবে নিজের কানে আমি এই প্রথম শুনলাম। নিমেষের মধ্যে ক্যানারী কোটকে দেখি ভিড়ের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কি জানি কেন, আমার মনে হ'ল, হয়তো আমি এসে পৌঁছেছি একটু দেরিতে, হয়তো তার আগেই সে কাজ সেরে নিয়েছে।

বেশ, তাই যদি ক'রে থাকে, আমি তাকে নজরের বাইরে যেতে দিচ্ছি না। তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে একজন লোকের পা মাড়িয়ে দিলাম। লোকটা প্রাণ ভরে আমাকে গালাগালি দিল, কিন্তু সেদিকে কান না দিয়ে আমি সোজা লোকটার অনুসরণ করলাম। সামনেই দেখি ক্যানারী রঙের ওভার-কোটটা অদূরে একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে। পা একটু দ্রুততর চালাতে লাগলাম। আবার যখন সে আমার দৃষ্টিপথে এল, তখন নিজের চোখকেই বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারলাম না। প্রায় এক ঘণ্টার অধিক কাল ধরে বেটেখাটো যে লোকটাকে আমি লক্ষ্য ক'রে আসছি, হঠাৎ দেখি, সে লোকটা তার চেহারা বদলে ফেলেছে। এতক্ষণ হাঁটতে গিয়ে তার পা ঠকঠক ক'রে কাঁপছিল ঠিক তালে পড়ছিল না, মনে হচ্ছিল কতই যেন দুর্বল আর শক্তিহীন সে, আর এখন দেয়ালের গা ঘেঁষে ছুটে চলেছে বনবিড়ালের মতো ক্ষিপ্র পায়ে, সে যেন অফিসের কেরানী, হঠাৎ ট্রেন ফেল ক'রে বসেছে, অথচ ঠিক সময়ে পৌঁছুতে না পারলে চাকরি যায়—এই ভয়ে ছুটে চলেছে অফিসের পথে। এখন আর আগের মতো ডাইনে-বাঁয়ে নজর দিচ্ছে না, মাথা গোঁজ ক'রে এগিয়ে চলেছে সোজা সম্মুখের দিকে। এই দেখে আমার বিশ্বাস দৃঢ়তর হ'ল কাজ সারবার পর চোরদের চলার ভঙ্গি এইরকমই হ'য়ে থাকে। দু' নম্বর এই চলনভঙ্গির সাহায্যে সে যত শীঘ্রি সম্ভব আর সকলের অজ্ঞাতে অকুস্থল থেকে স'রে পড়তে পারবে। বদমায়েসটা যে গরিব মেয়েটার বাজার-করা থলের ভেতর থেকে মনিব্যাগটা কেটে বের ক'রে নিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

ক্রোধে ক্ষিপ্ত হ'য়ে চিৎকার ক'রে উঠতে উদ্যত হলাম চোর—চোর—পাকড়াও চোরকে। কিন্তু সাহসে কুলিয়ে উঠল না। যাই হোক, তাকে

চুরি করতে তো আমি স্বচক্ষে দেখিনি, সে যে চোর সেটা আমার অনুমান মাত্র। কাউকে চোর ব'লে চেপে ধরবার আগে সে যে চোর সে সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ আত্মপ্রত্যয় অর্জন করা চাই, যখন বিচারে বসব তখন এ কথা ভুললে চলবে না যে, বিচারকের আসনে আমি বসেছি ভগবানের প্রতিনিধিরূপে। সেরকম আত্মপ্রত্যয়ের লেশমাত্র আমার মনে ছিল না। আমাদের বিচারবুদ্ধি কি পরিমাণ ভ্রান্ত তা আমি ভালোভাবেই জানি এবং হতাশা ও বিভ্রান্তিপূর্ণ এই যুগে দু'-একটা ঘটনার নজির তুলে ধ'রে যাঁরা ন্যায়বিচারের ধ্বজাধারী হ'তে চান, তাঁদের আত্মম্ভরিতা যে কতখানি অন্তঃসারশূন্য তাও আমার অজানা নয়।

লোকটার ওপর নজর রেখে এইসব কথা ভাবতে ভাবতে আমি যখন পথ চলছি, এমন সময়ে আর এক বিস্ময় এসে আমার পথ রোধ করল। দু'-একটা রাস্তা পার হ'তে না হ'তেই অদ্ভুত সেই লোকটা নতুন আর এক মূর্তি ধারণ করল। আর সে মাথা নিচু ক'রে দ্রুত পায়ে চলছে না। উপরন্তু অন্য যে কোনো নাগরিকের মতোই স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে সে চলাফেরা শুরু করেছে। এখন বিপজ্জনক এলাকার বাইরে এসে পৌঁছেছে সে, এখানে কেউ তাকে অনুসরণ করছে না, কাজেই কোনোরকম গোলযোগের কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই, এখানে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। এখন সে হাতে-হাতিয়ারে কারবারী পকেটমার নয়, প্যারীসের আর পঞ্চাশ লক্ষ অধিবাসীর মতোই সে একজন স্বাধীন নাগরিক, পরম নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ধীরভাবে পায়চারি ক'রে বেড়াবে। যেন কিছুই জানে না, নির্দোষের মতো এমনিধারা চেহারা ক'রে ধীর মন্থর স্বচ্ছন্দ গতিতে সে দ্যা-র্ত্যা এ্যাভিন্যু পার হয়ে গেল। এই প্রথম আমি লক্ষ্য করলাম, সত্যিকার ভ্রমণবিলাসীদের চোখে পায়চারি করবার সময় যে দৃষ্টি ফুটে ওঠে সেই দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যেকটি নারীর চেহারা ও চালচলন সে লক্ষ্য করছে।

চিরবিস্ময়ের রহস্যমণ্ডিত লোকটি এবার চলেছে কোথায়? ট্রিনিটি গির্জার সামনে যে ছোট্ট পার্কটা আছে, আমরা এখন সেইখানে এসে পৌঁছেছি। পার্কের গাছগুলোয় এরই মধ্যে সবুজ পাতা গজাতে শুরু করেছে। কিন্তু লোকটা চলেছে কোথায়? এতক্ষণে বুঝতে পারলাম. একটা বেঞ্চিতে ব'সে সে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতে চায়। চাওয়া তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক,

কেননা, সারা সকাল ব্যাপী পরিশ্রমের পর তার শরীর ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু কই, চিরবিস্ময়ের আকর সেই লোকটা তো বেঞ্চিতে বসল না? তার বদলে সে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলল অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ও ছোট্ট আকারের এমন একটা বাড়ির দিকে—যেখানে গুহ্যতম এক মানবিক প্রয়োজন সিদ্ধ হ'য়ে থাকে। একটা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল সে।

হাসির চোটে পেটে আমার খিল ধরে আর কি! শিল্পী মাত্রই বুঝি একই মানবধর্মের অনুশাসনের অধীন এবং চোর পর্যন্ত দেখছি তার আওতা থেকে বাদ পড়ে না। কে না জানে, ভয়ের চোটে পেটে মোচড় লাগে। যুদ্ধক্ষেত্রের নিঃসংকোচ বিবরণে সে ঘটনার সত্যতা লিপিবদ্ধ আছে। ক্যানারী রঙের কোট পরা লোকটার অবস্থা দেখে মনে হয়, সে যেন যুদ্ধ-ক্ষেত্রের অগ্নিবৃষ্টি থেকে সদ্য ফিরে-আসা সৈনিক। কিন্তু কল্পনার উদ্ভটতম আবিষ্কার অপেক্ষা বাস্তবতার রূঢ় বিদ্রূপ যে অনেক বেশি চমকপ্রদ সে তত্ত্ব আর একবার আমাকে নূতন ক'রে শিখতে হ'ল। চমকপ্রদ ঘটনার পাশে চটুলতাকে, অস্বাভাবিকতার পাশে এনে নিত্যনৈমিত্তিকতাকে স্থাপন করতে বাস্তবতা কোনোদিন ইতস্তত করে না। আমি এমন জায়গার একটা বেঞ্চির ওপর গিয়ে বসলাম যেখান থেকে বের হবার পথটা আমার নজরে পড়ে। সেইখানে ব'সে ব'সে আমার মনে হ'ল, পাকা পকেটমার তার নিজের পেশা-সুলভ কায়দা-কানুন অনুযায়ী কাজ ক'রে চলেছে।' চুরিবিদ্যায় দীক্ষিত লোক ছাড়া অন্য কেউ এ কথা ভাবতে পারে না যে, এইমাত্র পকেট মেরেছে এমন একধারা পেশাদার চোরের পক্ষে এ হেন একটা নির্জন স্থানের প্রয়োজন যেখানে ব'সে সে বামালগুলো বাছাই ক'রে দেখবে এবং যেসব বস্তুর জন্য ধরা পড়বার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে সেগুলো ফেলে দিয়ে ভারমুক্ত হবে। কিন্তু মহানগরীর বুকে যেখানে লক্ষ লক্ষ চোখ তার দিকে চেয়ে আছে সেখানে দেয়াল দিয়ে ঘেরা এমন জায়গা খুঁজে বের করা অসম্ভব। ফৌজদারী মামলার বিবরণ পড়তে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরা জানেন, অতি তুচ্ছ ঘটনা লক্ষ্য করবার জন্য কেমন ক'রে বহু লোক হাতের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে এবং প্রত্যক্ষদর্শী সে সাক্ষীদের স্মরণশক্তি কি রকম বিস্ময়জনকভাবে প্রখর।

তুমি হয়তো একখানা চিঠি পড়লে আর পড়বার পর টুকরো টুকরো ক'রে রাস্তার ধারের নর্দমায় ছিঁড়ে ফেলে দিলে। পথ-চলতি ডজনখানেক লোক

হয়তো ব্যাপাবটা দেখল এবং নিছক কৌতুহলবশেই কোনো একজন নিষ্কর্মা ছোকরা হয়তো ছেঁড়া টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে জোড়া দিতে লাগল। তুমি হয়তো কোনো বাড়িতে ঢোকবাব আগে দবজাব সামনে দাঁড়িয়ে তোমার পকেটবইটা ভালো ক'বে দেখে নিচ্ছ। পবেব দিন সকালবেলায় হয়তো সেই ধবনেব একটা জিনিস হাবানোব বিজ্ঞাপন বেরুল। তুমি যখন নোট-বইটা দেখছিলে সেই সময়ে তোমাব সম্পূর্ণ অপবিচিত একটি মেয়ে চোবা চাউনি দিয়ে তোমাকে লক্ষ্য কবছিল, বিজ্ঞাপন বেবোবাব সঙ্গে সঙ্গে থানায় গিয়ে তোমাব চেহাবাব বিস্তৃত বিবরণ সমেত এজাহাব দাখিল কবল। লাঞ্চেব জন্য ঢোকো গিয়ে কোনো বেস্তোবাঁয়, তুমি হয়তো কখনও চোখেই দেখনি অথবা দেখে থাকলেও আবও হাজাবজন লোকেব সঙ্গে তাব চেহাবা-গত কোনো পার্থক্যই তোমাব চোখে পড়েনি, হোটেলেব এইবকম একজন চাকব হয়তো মনোযোগেব সঙ্গে লক্ষ্য কবছে তোমাব সাজপোশাক, জুতো ও টুপি, তোমাব চুলেব বং, তোমাব হাতেব নখ কাটা হয়েছে অথবা হয়নি। প্রতিটি জানালা ও দোকান, প্রতিটি ফুলদানী আব পর্দাব আড়াল থেকে এক জোড়া চোখ সব সময়ই তোমাকে লক্ষ্য কবছে। তুমি হয়তো ভাবছ, বাস্তা দিয়ে তুমি চলেছ এবং কেউ তোমাব দিকে চেয়েও দেখছে না। কিন্তু সে ধাবণা একেবাবেই ভুল যাদেব সম্বন্ধে তুমি বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ কবো না এমনতব হাজাবো লোক তোমাকে গভীব অভিনিবেশেব সঙ্গে লক্ষ্য কবছে আব তোমাব দৈনন্দিন জীবন প্রতিদিন মণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে নিত্য নব বহস্যেব আববণে। এরূপ ক্ষেত্রে মাত্র কয়েকটা টাকাব বিনিময়ে অন্তত কয়েক মিনিটেব জন্য পবিপূর্ণ গোপনীয়তা ক্রয় কববাব মতলব নিঃসন্দেহে সুচতুব শিল্পীজনোচিত। এই সময়েব মধ্যে সে স্বচ্ছন্দে বামাল অন্য জায়গায় সবিয়ে ফেলতে পাববে। চোরাই টাকাপয়সা সে যেখানে ব'সে গুনে নেবে সেটা একটা বাঁধা-ঘেবা জায়গা। আমি হেন লোক—যে এতক্ষণ ধ'রে প্রতি পদে তাকে অনুসবণ ক রে আসছে আব আশা ও হতাশাব মিশ্র ভাবাবেগ বুকে নিয়ে বাইবে দাঁড়িয়ে আছে, এমনকি, সে পর্যন্ত জানতে পারবে না তাব অপহৃত অর্থেব পরিমাণ কত।

আমি এই ধবনেবই কোনো একটা ঘটনা ঘটবে ব'লে আশা কবেছিলাম, কিন্তু অবস্থাটা দাঁড়াল অন্য একরকম। সাধাবণ শৌচাগার থেকে সে

বেবিযে আসবামাত্র আমি বুঝলাম যে, তাব প্রাপ্তিযোগ বিশেষ লাভজনক হযনি। এ ধাবণা আমাব অবশ্য হ'ল তাব মুখেব হাবভাব দেখে, কিন্তু সে ধাবণা এমনি অভ্রান্ত যে, মনে হ'ল, আমি যেন টাকাপযসাগুলো নিজে হাতে গুনে দেখেছি। তাব বিষণ্ণ মুখ, অবসন্ন চেহাবা এব ক্লান্ত ও ভাবাক্রান্ত চলাব ভঙ্গি দেখে আমি স্পষ্টই বুঝতে পাবলাম যে, আজ সকালেব বোজগাবেব পবিমাণটা হযেছে নিতান্তই অল্প। হাতানো ব্যাগটাব মধ্যে হযতো সে পেযে থাকবে একটা পাউডাবেব খুপি, একটা ফাটা আযনা, একটা দবজাব চাবি, একখানা রুমাল ও একটা পেন্সিল আব তাব ওপব দশ ফ্ঁা দামেব বড জোব দুটো কি তিনটে মযলা নোট। এই দিযে কি কযেক ঘণ্টাব মেহনত ও ঝুঁকি স্বীকাবেব মজুবি পোষায? হতভাগিনী সেই মেযেটাব পক্ষে এইটেই হযতো একটা মস্ত লোকসান। সে হযতো এতক্ষণ বেলভিল অথবা শহবেব উপকণ্ঠবর্তী ওইবকম কোনো অঞ্চলে নিজেব বাসায গিযে পৌঁছেছে। চোখেব জলে বুক ভাসিযে নিজেব দুর্ভাগ্যেব কাহিনী বাববাব ব্যক্ত কবেছে, কথায কথায প্রতিবেশীদেব সামনে তুলে ধবেছে তাব সেই বাজাব কবা ব্যাগটা—যাব ভেতব থেকে তাব যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিত। চোবটা যদিও মেযেটাব মতোই দবিদ্র, তবু এক নজবে দেখবামাত্র তাব মনে হ'ল, যা সে পেযেছে তাব প্রযোজনেব পক্ষে সেটা পর্যাপ্ত নয। তা যে নয, তাব প্রমাণ পেতে আমাব খুব বেশি দেবি হ'ল না। আহা বেচাবী! দৈন্য ও দুববস্থাব সর্বনিম্ন স্তবে এসে পৌঁছেছে সে। প্রায শ'খানেক গজ কোনোক্রমে হেঁটে গিযে একটা জুতোব দোকানেব সামনে এসে দাঁডাল এব সাজানো জুতোগুলোব দিকে চেযে মনে মনে হিসেব কবতে লাগল, সবচেযে সস্তা দামে এমন কোন জুতো পাওযা যায, যাব বদলে পাযেব শতছিন্ন ও জবাজীর্ণ জুতোকে বেহাই দেওযা সম্ভব হয। আবও শত সহস্র লোক যাদেব ববাব সোলওযালা পোক্ত চামডাব জুতো সববে বা নীববে প্যাবীসেব ফুটপাথ মাডিযে চলেছে, তাদেব সকলেব চাইতে এই লোকটিব জুতোব প্রযোজন সবচেযে জরুবী। নিজেব কাববাব যদি তাকে চালিযে যেতে হয তাহ'লে নূতন জুতো তাকে কিনতেই হবে। কিন্তু তাব মুখেব ব্যগ্র ও হতাশাব্যঞ্জক দৃষ্টি দেখে বোঝা গেল যে, সেদিনেব উপার্জন দিযে সবচেযে কম দামী জুতোও হযতো কেনা যাবে না। তাব দোকানে

যেসব মাল সাজানো ছিল তাদের মধ্যে চুয়ান্ন ফ্রাঁ মূল্যের পাদুকাই সর্বনিম্ন দরের জুতো। হতাশার ভঙ্গি ক'রে শেষ পযন্ত ক্যানারী কোট আবার পথ চলতে শুরু করল।

কিন্তু চলছে কোথায়? সে কি আবার শিকারের সন্ধানে চলল নাকি? সামান্য লাভের বিনিময়ে নিজের স্বাধীনতা বিপন্ন কবতে আবার সে উদ্যত হবে নাকি? না, না, হতভাগ্য জীব, ও কাজ ক'রো না! তার চেয়ে বরং একটু বিশ্রাম নাও। আমার মনের ভাব সে যেন বুঝতে পারল, আমার চিন্তার তড়িৎপ্রবাহ যেন আঘাত করল তার মনেব বেতারযন্ত্রে। মোড় ফিরে ঢুকে পডল একটা সংকীর্ণ গলির ভেতরে। একটা সস্তা রেস্তোরাঁর সামনে চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল দামের তালিকাগুলোর ওপরে, দাম না জেনে ভেতরে ঢোকা কোনো কাজের কথা নয়। অদম্য কৌতূহলের তাডনায় আমাব ধমনী স্পন্দিত হচ্ছে; সেই অবস্থায় দুটি ঘণ্টা ধ'রে যে লোকটাব গতিবিধি আমি লক্ষ্য ক'রে আসছি তাব রহস্য আমি উদ্ঘাটন করবই এই সংকল্প নিয়ে আমি তার অনুসরণ ক'রে চললাম। নিজেকে আডাল কববার জন্যে একখানা খবরেব কাগজ কিনে নিলাম আব টুপিটা একটু সামনেব দিকে টেনে নিয়ে অদূরে একটা টেবিলে একটু জায়গা ক'রে নিলাম। এত সতর্কতা অবলম্বনের কোনো দরকার ছিল না, কারণ পকেটমারেব পেটে তখন বৈশ্বানর জ্ব'লে উঠেছে এমন প্রচণ্ডভাবে যে, নিজের দিক ছাড়া অন্য কারও দিকে মনোযোগ দেবার অবসর তার নেই। টেবিল-ঢাকা কাপড়ের বদলে আছে কাগজ, লোকটা বোকার মতো অর্থহীন দৃষ্টিতে সেই কাগজটার দিকে চেয়ে আছে এমন সময়ে তার সামনে এসে পৌছল খানিকটা রুটি। সরু লিক্‌লিকে হাত দিয়ে সে একটা টুকরো তুলে নিল আর গিলতে লাগল ক্ষুধিত নেকডেব মতো। সে যে বুভুক্ষু তাতে কোনো সন্দেহ নাই, আজ সকাল থেকে, কিংবা এমনও হ'তে পারে গতকাল থেকে তার ভাগ্যে খাবার জোটেনি। হোটেলের চাকরটা যখন তার সামনে এনে ধরল এক গ্লাস দুধ, তখন লোকটার সম্বন্ধে কৌতূহলের আমার আর অবধি রইল না··· অবাক কাণ্ড!···প্যারীসের চোরেরাও তাহ'লে দুধ খায়!

এই ধবনের অতি তুচ্ছ ঘটনা কখনও কখনও আগুনের ফুলকির মতো উড়ে এসে শুক্‌নো খড়ের গাদায় প'ড়ে যে অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি করে তারই

আলোতে মনের অন্ধকার রাজ্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পকেটমার মাত্রই দুর্বৃত্ত শ্রেণীর লোক। অথচ সেই পকেটমারকে যখন দেখলাম শিশুদের পেয় অত্যন্ত নির্দোষ পানীয় ঢোকে ঢোকে গিলছে, তখন সে লোকটা আমার চোখে আর চোর রইল না। ভিক্টর হুগো যাদের 'লা মিজারেবলস' আখ্যায় অভিহিত করে গেছেন, তখন সে আমার চোখে তাদেরই একজন, এই পোড়া পৃথিবীর বুকে যে সংখ্যাতীত দুঃস্থ, দুর্দশা... ও হতভাগ্যের দল শিকারের পশুর মতো স্থান হতে স্থানান্তরে তাড়িত হয়ে বেড়াচ্ছে, এই লোকটা সেই বিড়ম্বিত ও নিগৃহীত মানবগোষ্ঠীরই অন্যতম সদস্য। এতক্ষণ লোকটি সম্পর্কে আমি কৌতূহলই পোষণ ক'রে আসছিলাম। কিন্তু এখন তার সম্বন্ধে যে ভাব আমার মনে জাগল, নিছক কৌতূহলের চেয়েও তা মৌলিক। আমাদের বিশ্বজনীন মানবিকতার প্রত্যেকটি প্রকাশের ক্ষেত্রে, আমাদের রক্তমাংস দিয়ে গড়া দেহের প্রতিটি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মানুষ এবং মানুষের মধ্যে রচিত কৃত্রিম বিভেদকে এমন এক একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়, যাকে আশ্রয় করে মানুষকে ভালো এবং মন্দ, বিখ্যাত ও কুখ্যাত, সৎ এবং অসৎ এই দুটো আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। কৃত্রিম এই বিভেদ রেখা বিলুপ্ত হ'লে পড়ে থাকে সেইসব হতভাগ্য জীব, যারা ভোগ করে ক্ষুৎপিপাসার দুঃসহ যন্ত্রণা, ঠিক তোমার আমার মতোই যাদের প্রয়োজন নিদ্রার ও বিশ্রামের।

দুধের শেষ বিন্দু পর্যন্ত চুমুক দিয়ে নিল, গলাধঃকরণ করল রুটির শেষ টুকরো অবধি। আমি অভিভূতের মতো তার খাওয়া দেখছি আর মনে মনে লজ্জা পাচ্ছি তার ওপর গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যে। আহা বেচারী! অতি কষ্টে সে যখন নিজের ক্লান্ত দেহটা টেনে নিয়ে চলেছে, তখন দুটো পয়সা দিয়ে তাকে সাহায্য করা দূরে থাক, শিকারী কুকুরের মতো তার পায়ের দাগ অনুসরণ ক'রে আসছি। ইচ্ছে হল, এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে দুটো কথা বলি, দুটো পয়সা তার হাতে তুলে দিই। কিন্তু কি ছুতো ধ'রে তার কাছে এগিয়ে যাই, দুটো পয়সা দিই তার হাতে আমি কিছুতেই ভেবে পেলাম না। কি জটিল এবং বিচিত্র জীব আমরা। যখনই কোনো চূড়ান্ত ও সক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার সময় উপস্থিত হয়, তখনই উপায় উদ্ভাবনের জন্য আমরা এমন ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি, যা সত্যি সত্যিই ধিক্কারজনক,

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একটা লোক অসহায়ভাবে সাহায্যের প্রত্যাশী, কিন্তু তবু লঘু স্বচ্ছ যে বায়ুস্তর তার আর আমাদের মধ্যে ব্যবধান রচনা ক'রে রেখেছে সেটা ঠেলে এগিয়ে যাবার মতো সাহস আমরা সঞ্চয় ক'রে উঠতে পারি না। সাহায্য যে মুখ ফুটে চায় না তাকে সাহায্য করা যে কি কঠিন কাজ তা আমরা সবাই জানি, আমরা জানি যে, এই না চাওয়াটাই তার গর্বের শেষ সম্বল। পেশাদার ভিখিরিরা নিঃসংকোচে হাত পাতে ব'লে তাদের কিছু দেওয়া সোজা, এবং দানের সুযোগ হ'তে তারা আমাদের বঞ্চিত করে না ব'লে তারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু যে লোকটার কথা বলতে বসেছি, তার নিজস্ব একটা সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধ আছে। বরঞ্চ নিজের জীবন ও স্বাধীনতা সে বিপন্ন করবে, তবু কারও কাছে হাত সে পাতবে না। যেহেতু সে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ না ক'রে চৌর্যকেই বৃত্তি হিসাবে বেছে নিয়েছে তার জন্য তাকে ঘৃণা করবার কোনো অধিকার আমাদের আছে কি?

আমি যদি আহাম্মকের মতো কিছু দান ক'রতে চাই তাহ'লে সে হয়তো ভীষণ ভয় পেয়ে যাবে, হয়তো আঁৎকে উঠবে আশঙ্কায়। তা ছাড়া, এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে যে, এ সময়ে তাকে ব্যস্ত করা অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হবে। আরও একটু আরাম ক'রে বসবার জন্য সে চেয়ারটা দেয়ালের দিকে একটু ঠেলে দিল যাতে ক'রে দেহটা চেয়ারে হেলানো থাকলেও, মাথাটা ঠেকে থাকবে দেয়ালে। তার ধূসর রঙের চোখের পাতাটা বুজে গেছে, মনে হয়, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার গায়ের রং জেলখানার কলি করা কক্ষের মতোই পাণ্ডুর। তার জামার হাতাটা হাতের নড়াচড়ার তালে তালে হাওয়ায় পত্‌পত্‌ ক'রে উড়ছে। জামার হাতায় একটা বড় রকমের ছিদ্র দেখে অনুমান হয়, ঘরে তার স্ত্রী বা নারীসুলভ স্নেহ দিয়ে সেবা যত্ন করবার মতো অন্য কেউ নেই। তার বাসের ঘরের ছবি আমার মনশ্চক্ষুর সামনে ভেসে উঠল. চুল্লী ও উত্তাপহীন একখানা ঘরে পুরনো মরচে-ধরা একটা লোহার খাট হাত ধোবার জন্যে একটা ফাটা ও ভাঙা টুকরো বেসিন, আর ছোট একটা ট্রাঙ্ক—এইমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি দিয়ে ঘরখানা সাজানো, যে ঘরে ভয় এসে চিরস্থায়ী বাসা বেঁধে আছে, তারই মধ্যে সর্বদা শঙ্কান্বিত হ'য়ে বাস করা ঐ বুঝি শোনা যাচ্ছে কড়া

নাড়ার আওয়াজ। ক্ষীণ ও দুর্বল দেহটা চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে এবং কাঁচা পাকা চুলে ভরা মাথাটা দেয়ালে হেলান দিয়ে সে শুয়েছিল মাত্র দু'-তিন মিনিটের জন্য এবং এইটুকু সময়ের মধ্যেই তার বাসগৃহের ছবি চলচ্চিত্রের মতো আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেল।

কিন্তু রেস্তোরাঁর চাকরটা এসে এরই মধ্যে টেবিল সাফ করতে লেগে পড়েছে, থালা, ছুরি ও কাঁটায় বেজে উঠেছে ঝন্‌ঝনা শব্দ। এমন ব্যয়কুণ্ঠ ব্যক্তিকে বেশিক্ষণ ব'সে থাকতে উৎসাহিত করা উচিত হবে না। আমি এবার পয়সা চুকিয়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। আমার দিকে দৃকপাত পর্যন্ত না ক'রে অচিরেই ক্যানারী কোটও এসে সেখানে আবির্ভূত হ'ল। সে পথ চলেছে কি যেন এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হ'য়ে এবং আমিও তার পিছু নিয়েছি বটে, কিন্তু এবারে আর নিছক কৌতূহলের বশে বা অচেনা কোনো হাতের কাজের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য নয়। এবার আমি উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলুম তাকে আবার বড় রাস্তার দিকে মোড় ঘুরতে দেখে।

এই মরেছে! যে দোকানের সামনে খাচায় বাদর বসেছিল, নির্বোধের মতো আবার লোকটা সেইখানে তার আগেকার জায়গায় ফিরে চলল নাকি? সেই মেয়েটা যে মুহূর্তে টের পেয়েছে যে তার মনিব্যাগ খোয়া গেছে তৎক্ষণাৎ খবরটা সে নিশ্চয়ই পুলিশকে জানিয়েছে এবং পুলিশ কর্মচারীরা হয়তো এতক্ষণ সেখানে এসে অপেক্ষা করছে তাকে ধরবার জন্যে। এরকম বিপদের আশঙ্কা তো আছেই, তা ছাড়াও আজ আর অন্য কোনো কাজে হাত দেওয়া তার পক্ষে সংগত হবে না। আমি কায়মনোবাক্যে কামনা করি, সে যেন আজ আর অন্য কোনো দুঃসাহসের কাজ করতে না যায়। কেননা, সেরকম কোনো কাজ করবার মতো দৈহিক অবস্থা আজ আর তার নেই। সে আজ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত, এবং যে কোনো সূক্ষ্ম হাতের কাজ ঠিকমতো করবার পথে চিন্তা ও শ্রান্তিক্লিষ্ট মন একটা মস্ত অন্তরায়। তার দরকার এখন বিশ্রামের, তাই নতুন কোনো কাজে হাত না দিয়ে শয্যায় আশ্রয় নেওয়াই তার পক্ষে এখন আশু কর্তব্য।

কি জানি কেমন ক'রে এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার মনে বদ্ধমূল হ'ল যে, কোনো কিছু করবার জন্যে যদি সে প্রয়াস পায় তাহ'লে চেষ্টার শুরুতেই সে ধরা পড়ে যাবে। এমন ক্লান্ত সে যে, গোড়াতেই একটা গোলমাল না বাধিয়ে

সে পারবে না। বুল্‌ভারের যত কাছাকাছি আমরা এসে পড়তে লাগলাম, আমার দুশ্চিন্তার মাত্রা ততই বাড়তে লাগল। 'আর যাই করো বাবা, ওই হনুমান প্রদর্শনীর ধারে-কাছে যেও না। কথাটা সবেমাত্র মনে মনে বলেছি এমন সময় দেখি, রাস্তা পার হ'যে ঠিক সেই জায়গাতেই যেতে সে উদ্যত হয়েছে - একটু আগে যেখানে স্থূলাঙ্গী মেয়েটির সে পকেট মেরেছিল। তার জামার কলারটা চেপে ধরবার জন্য আমার হাত নিসপিস্‌ করছে, কিন্তু না, সেদিকে সে পা বাড়াল না। সম্ভবত এবারও আমার মনের ইচ্ছে তার মনকে স্পর্শ করেছে। সেদিকে না গিয়ে সে হঠাৎ রুয়্য-দ্রুয়োর দিকে মোড় ফিরল এবং এমন দৃঢ় পদে সে একটা বাড়িতে ঢুকল, যেন সেটা তার নিজের বাড়ি। ঐ বাড়িটা আমি চিনতাম। তার নাম হোটেল দ্রুয়ো, প্যারীসের সবচেয়ে বড় নিলামের দোকান আছে সেখানে।

দুর্জ্ঞেয় রহস্যপূর্ণ সেই লোকটার আচরণে এই নিয়ে কতবার যে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হলাম তার ইয়ত্তা নেই। লোকটাকে জানবার আর বোঝবার জন্যে আমার যেমন কৌতূহল আছে, তেমনি আবার তার মধ্যে এমন একটা কিছু আছেই আছে-- যার সঙ্গে আমার ইচ্ছাগত একটা মিল দেখতে পাই। প্যারীস শহরে শত সহস্র বাড়ি আছে কিন্তু তাদের মধ্যে এই বাড়িটাতেই আসবার ইচ্ছা সকালবেলায় আমার মনে জেগেছিল। এইখানে ব'সে কত আনন্দের দিন আমি কাটিয়েছি, কত শিক্ষা আমি লাভ করেছি এবং অতিবাহিত করেছি কত উৎসাহ আর উদ্দীপনাময় সময়। এই বাড়িটা যাদুঘরের চেয়েও আকর্ষণীয় আর যাদুঘরের চেয়েও দামী ধনরত্নের ভাণ্ডার। ক্ষণে ক্ষণে সেটা নতুন নতুন বৈচিত্র্যে মণ্ডিত হয়ে উঠছে। তবুও সে যেন শাশ্বত ও সনাতন। হোটেল দ্রুয়ো যেন ফরাসী নাগরিক জীবনের জীবন্ত প্রতীক। তাই প্যারীসের অন্যতম দ্রষ্টব্য হিসাবে সে আমার এত প্রিয়। সাধারণত বাসের ঘরে যেসব জিনিস আমরা সাজানো-গোছানো অবস্থায় দেখতে পাই, এখানে সেগুলো আছে এখানে-ওখানে ছড়ানো এলোমেলো ও অগোছালোভাবে, ঠিক কসাইয়ের দোকানে যেমন ছড়িয়ে প'ড়ে থাকে এমন একটা প্রাণিদেহের খণ্ড খণ্ড টুকরোগুলো, দু'-তিন দিন আগেও যা ছিল একটা গোটা দেহধারী জীব আর দিব্যি চ'লে-ফিরে বেড়াত আস্ত এবং আনকোরা দেহ নিয়ে। এখানে পবিত্র আর অপবিত্র, সস্তা আর সুদুর্লভ

সামগ্রীর মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য হরেক রকম দ্রব্যের বিচিত্র সমাবেশ। হোটেল ড্রুয়োয় যা কিছু সাজানো রয়েছে সেটা প্রতীক্ষা করছে পরমুহূর্তেই টাকায় রূপান্তরিত হবার জন্যে। বিছানা, ক্রুশ, টুপি, গালিচা, ঘড়ি, হাত ধোবার গামলা, সিগারেটের কৌটা, পুরনো সাইকেল আর পল্ ভেলেরীর গ্রন্থাবলীর প্রথম সংস্করণ, ভ্যানডাইকের ছবি এর তার সঙ্গে বীভৎস আকারের অয়েল পেন্টিং, বীঠোফেনের সোনেটা আর ভাঙা স্টোভ, দরকারী এবং অদরকারী কিম্ভূতকিমাকার বস্তু আর মূল্যবান আশ্চর্য জিনিস, ছোট, বড, খাঁটি আর জাল, পুরনো, নতুন সব কিছুই এক জায়গায় স্তূপাকার ক'রে রাখা হয়েছে দেশীয় মুদ্রায় তাদের রূপান্তরিত করবার জন্যে। সুন্দর সুমহানের পাশেই এখানে পড়ে রয়েছে কুৎসিত এবং জঘন্য, এই ঘরখানা বিশাল মহানগরীর বুক থেকে এইসব কুরে কুরে খাচ্ছে আর তারপরে তার ভুক্ত বস্তু আবার উগরে দিচ্ছে। এ যেন এমন একটা বিরাট মুচি যার মধ্যে যা কিছু পড়ছে তাই গ'লে জল হ'য়ে যাচ্ছে। এখানে ব্যবসা চলেছে মানুষের দম্ভ এবং তার দৈনন্দিন প্রয়োজনের মধ্যে। সংমিশ্রণের এই ভয়াবহ কারখানার সম্মুখে এসে দাড়ালে আমরা বিশেষভাবে বুঝতে পারি কি বিচিত্র হট্টগোল-ভরা এই ভবের হাট।

এইসব প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও গ্রন্থাগার ভবন ছাড়া মানুষের দৃষ্টি ও বুদ্ধি বিকশিত হবার পক্ষে প্রশস্ততর স্থান আর কোথায়? বিচিত্র বস্তু-সম্ভার যেমন এখানে আসে মাত্র হাত বদলাবার জন্যে এবং এখানে এসে যেমন তারা স্বল্প সময়ের জন্য মানুষের মালিকানা স্বত্বের স্বৈরাচারিতা হ'তে মুক্তি লাভ করে, তেমনি আবার তাদের সঙ্গে দরদস্তুরির জন্য দোকানঘরে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়ায় বিভিন্ন জাতি এবং শ্রেণীর লোক—তাদের চোখে জ্ব'লে ওঠে আহরণের অদম্য লালসা। বিপুল ধনী ব্যবসায়ীরা পশুলোমের তৈরি কোট প'রে ও বাওলার হ্যাট মাথায় দিয়ে সব ছোটখাট ও অপরিষ্কার ব্যবসায়ীদের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়, যারা নিজেদের দোকানপত্র সাজাবার জন্য সস্তায় জিনিস কিনতে এসেছে। তাদেরই মধ্যে আছে যুদ্ধক্ষেত্রের হায়নারূপী দালালের দল, এজেন্ট ও ব্রোকার। একটা কোনো জিনিস সস্তায় বেরিয়ে যাচ্ছে দেখলেই তারা তখুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। কিংবা যদি বুঝতে পারে বিশেষ দুর্লভ কোনো বস্তু বিখ্যাত কোনো মহাজনের চোখে ধরেছে,

অমনি ঘাড় নেড়ে চোখের ইশারার মধ্যে তাদের পরস্পরের ভাব বিনিময় হ'য়ে যায় আর ডাকের পর ডাক দিয়ে নিলামের দর তারা চড়িয়ে চলে।

যাদের নিজেদের গায়ের চামড়া শুকিয়ে চিমসে মেরে গেছে—এমনকি, সেই-সব গ্রন্থাগারিকদেরও পর্যন্ত আবির্ভাব ঘটেছে, আর জীববিশেষের মতো ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে তারা মোটা কাঁচের চশমার ভেতর দিয়ে মুদ্রণযন্ত্রের আদিম যুগে ছাপা বইগুলো নিরীক্ষণ করছে। অভিজাত শ্রেণীর মহিলারা মহামূল্য মুক্তোর কণ্ঠহার ও ময়ূরপুচ্ছের মতো বিচিত্র বর্ণের সাজপোশাক প'রে সামনের সারিতে এসে স্থান গ্রহণ করেছেন। এক কোণে বকধার্মিকের মতো চুপচাপ খাড়া দাঁড়িয়ে আছে সেইসব জহুরীর দল—বড় বড় ব্যবসাদারদের পক্ষ থেকে যারা ফাটকাবাজারের দালালির কাজ করে। এইসব বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনের জীবদের ফাঁকে ফাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে সাধারণ লোকের দল। বলা বাহুল্য কোনো রকম ব্যবসাবুদ্ধির বশে অথবা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার উদ্দেশ্যে বা শিল্পের প্রতি অনুরাগের আকর্ষণে তারা হোটেল ক্রুয়োতে আসেনি; তারা এসেছে নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হ'য়ে, কি বা আরও সোজা ক'রে বলতে গেলে বিনা খরচায় আরামপ্রদ গরম ঘরে কিছুক্ষণ কাটিয়ে দেবার জন্যে, নয়তো নিলাম-ডাকের মোটা টাকার অঙ্কটার পরিমাণ শুনবার কৌতূহল চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে।

হোটেল ক্রুয়োতে সমাগত 'বিচিত্র ও বিমিশ্র জনতার' লোকেদের বহু বিভিন্ন দৈহিক আকার ও প্রকার লক্ষ্য করলেই তাদের উদ্দেশ্যগত বৈচিত্র্য সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু এক শ্রেণীর লোককে যে এখানে দেখতে পাব—কোনো দিন কল্পনাও করিনি। আমি বলছি, পকেটমারের কথা: আমি যখন দেখলাম, বন্ধু আমার নিছক সংস্কারবশেই তাদের ভিড় ভেদ ক'রে ঠেলে ঢুকেছে—গ্রাহক হবার সম্ভাবনাই যাদের মধ্যে বিদ্যমান, আমার বুঝতে বাকী রইল না যে তার হাতের খেলা দেখাবার পক্ষে এর চেয়ে যোগ্যতর স্থান গোটা প্যারীস শহরে আর নেই। তার মতো শিকারীর পক্ষে এই জনতার জঙ্গলই প্রশস্ততম স্থান। প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে এখানে. লোকজনের দুঃসহ ভিড় আছে—আর আছে অন্যমনস্কতা—প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রাহকদের ডাক-জনিত উত্তেজনা ও কি হয় কি হয় এই উদ্বেগের ক্ষেত্রে যার জন্ম। তা ছাড়া, ঘোড়দৌড়ের মাঠ আর রেল-স্টেশন

বাদ দিলে, নিলামের ঘরই সম্ভবত একমাত্র স্থান যেখানে নগদ লেনদেনের ব্যবস্থা কঠোরভাবেই বলবৎ, উপরন্তু টাকার পরিমাণটাও বেশ মোটা রকমের। কাজেই সবগুলো কোটের পকেট থেকে নোট ভর্তি মনিব্যাগগুলো ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। হালকা আঙুলের হাতসাফাই দেখাবার মতো কোথায়ও কোনো জায়গা থেকে থাকে তো সেটা এখানেই। আজ সকালে বন্ধু আমার যে কারবার করেছেন সেটা দিয়ে কোনো রকমে অভ্যাসটা বজায় রাখা যায়—হাতটাকে চালু রাখা যায়। কিন্তু এইটে হচ্ছে এমন এক জায়গা, যেখানে সে তার ওস্তাদ হাতের মোটা মুনাফার খেল দেখাতে পারে।

এই সেরেছে! লোকটা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছে যে! ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে ওর জামার হাতটা চেপে ধ'রে বলি তিন তিনটে ভাষায় লেখা বিজ্ঞাপন যে সামনে জলজ্বল করছে, সেটা কি তোমার নজরে পড়ে না? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না বিজ্ঞাপনগুলো বলছে, "পকেটমার হতে সাবধান!" তুমি অন্ধ, না অর্বাচীন? এখানে তোমার মতো জীবদের ওপর নজর রাখবার জন্যে লোকের অভাব নেই। খুব কম ক'রে অন্তত এক ডজন গোয়েন্দা হয়তো ঘুরে ঘোরা ফেরা করছে। তা ছাড়া আমি বলছি, আজকের দিনটা তোমার পক্ষে বিশেষ শুভ নয়।

সে স্থির দৃষ্টিতে একবার বিজ্ঞাপনটার দিকে চাইল, তারপর আমার চিন্তা-তরঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে ব্যানারী কোটটা সোজা দোতলার দিকে এগিয়ে চলল, কর্মক্ষেত্র হিসাবে এমন স্থান বেছে নেবার তাৎপর্য বুঝতে বেগ পেতে হয় না। একতলায় বিক্রি হয় কার্পেট, টেবিলের দেরাজ ইত্যাদি যত সব পুরনো জিনিস। পুরনো আসবাবপত্র যারা কেনে তারা খুচরো মালের কারবারী, তা ছাড়া নিজেদের টাকাপয়সার ব্যাপারে খুবই হুশিয়ার ব'লে সেগুলো কোমরে জড়ানো থলের ভেতর ভরে রাখে। ছবি, বই, বিখ্যাত লোকেদের নাম-স্বাক্ষর করা জহরত প্রভৃতি দামী দামী জিনিস-পত্র বিক্রি হয় দোতলায়, তাই যারা মোটা মোটা নোটের তাড়া সঙ্গে ক'রে আনে সেইরকম গ্রাহকদেরই ভিড় সেখানে জ'মে ওঠে।

বন্ধু আমার এত তাড়াতাড়ি ঘর থেকে আর এক ঘরে ঢুকছে যে, তার সঙ্গে তাল রেখে চলাই আমার পক্ষে কষ্টকর। সে এ ঘর থেকে সে ঘরে যাচ্ছে আর যাবার পথে প্রত্যেকটা সুযোগ পরীক্ষা ক'রে নিচ্ছে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

দিয়ে, ভোজনবিলাসী ব্যক্তি যে লালসা-ভরা দৃষ্টি দিয়ে খাদ্যতালিকার দিকে চেয়ে থাকে—ঘরে লটকানো বিজ্ঞাপনগুলো সে পড়ছে ঠিক সেই দৃষ্টি দিয়ে। অবশেষে সে এসে দাড়াল সাত নম্বর ঘরে, চীন, জাপান দেশগুলোর পোর্সেলিনের তৈরি বিখ্যাত বিলাসসম্ভার এখানে নিলামে বিক্রি হয়। ঘরে লোকের অত্যধিক ভিড় দেখে মনে হয়, নিশ্চয় বহু মূল্যবান জিনিসপত্র সব জমা হয়ে আছে এ ঘরে। লোকের ভিড় যেন ধরে না, ভিড়ের চাপে ঢুকবার পথ তো প্রায়ই বন্ধ, তা ছাড়া যে টেবিলে নিলামের ডাক চলেছে, আমাদের মতো নবাগতের পক্ষে সেখানে পৌছনো দূরে থাক, জায়গাটা চোখে দেখাও অসম্ভব। আমাদের আর লক্ষ্যস্থলের মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কুড়ি থেকে ত্রিশটা মানুষের সারি দিয়ে তৈরি প্রাচীর। আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে মানুষের মাথার ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে কোনোক্রমে দেখতে পাওয়া যায় শুধু নিলামওয়ালার মূর্তিটা, একটা সাদা হাতুড়ি হাতে নিয়ে একটা উচু ডেস্কের ওপর সে বসে আছে, সেই হাতুড়ি দিয়ে ঠিক একই ভাবে সে নিলাম নিয়ন্ত্রণ করছে—কোনো অর্কেস্ট্রা পার্টির পরিচালক যেমন ক'রে বাদ্যযন্ত্রের অনুষ্ঠান পরিচালনা ক'রে থাকে। আর চাঞ্চল্যকর এক পরিসমাপ্তির কাছাকাছি এসে নিলাম-ডাক থমকে দাড়াচ্ছে।

প্রাত্যহিক জীবনে নিলামওয়ালা হয়তো একজন সামান্য বেতনের কর্মচারী মাত্র, মেনিলমন্তা অথবা ওই ধরনের কোনো শহরতলিতে দু'খানা ঘর নিয়ে থাকে। তার জানলার টবে সাজানো রয়েছে হয়তো দু-একটা ফুল গাছের চারা। ঘরের সাজসজ্জা বলতে এর অতিরিক্ত আর কিছুই নেই। কিন্তু এখানে সে একজন শক্তিশালী পুরুষ, সে এমন একজন লোক যে আর সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার গায়ে আছে একটা চমৎকার কোট, পমেড মাখানো মাথার চুলগুলো চক্চক করছে। তাকে চারধার থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অবস্থাপন্ন গ্রাহকের দল। সেই অবস্থায় ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ঐসব মহামূল্যবান দ্রব্যসম্ভারকে সে নগদ টাকায় রূপান্তরিত ক'রে চলেছে তার হাতের সেই সাদা হাতুড়ির ঘা মেরে—নিজের শক্তি ও স্বাধিকারের যা একমাত্র জীবন্ত প্রতীক। বাজিকর যেমন মুখে ছদ্ম অমায়িকতার ভাব নিয়ে হাত দিয়ে একই সঙ্গে অনেকগুলো বল নিয়ে খেলা করে, সেও তেমনি ডান ও বাঁ দিক থেকে যত ডাক আসছে তার

সবগুলোই লুফে নিচ্ছে হাসি মুখে ডাক চলেছে, ছ' শো—ছ' শো পাঁচ—ছ' শো দশ। প্রতিবার সে ডেকে চলেছে স্পষ্টতর কণ্ঠে এবং সে-ডাক ভিড় ভেদ ক'রে ভেসে চলেছে সুরে ও ছন্দে লীলায়িত হ'য়ে।

ডাকে যেই কিছুক্ষণের জন্য ভাঁটা পড়েছে, অমনি লোকজনকে প্রলুব্ধ ও উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে বলে, "ডান দিক থেকে কেউ আর ডাকবেন না? বাঁ দিক থেকে কারও ডাক নেই?" তার কণ্ঠস্বর ও চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে বিস্ময়ের ভাব। হাতির দাঁতের হাতুড়িটা নিয়ে সে এমনভাবে নাড়া-চাড়া করছে—যেন সর্বোচ্চ ডাকের মাথায় সে হাতুড়ির ঘা মারল ব'লে। কখনও বা মৃদু হেসে জনতাকে সম্বোধন ক'রে সে বলছে, "ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ, সর্বোচ্চ দামে আমরা এখনও এসে পৌঁছইনি। চমৎকার এই জিনিসটার দাম ছ' শো ফ্রাঁর চেয়ে নিশ্চয় বেশি", আবার কখনও বা সদ্য সমাগত চেনা কোনো গ্রাহককে মৃদু হাসিতে সংবর্ধিত করছে, নয়তো সম্ভাবিত কোনো ডাকিয়ের দিকে নিরীক্ষণ করছে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। পরক্ষণে টেবিলের ওপর নতুন মালের একটা থাক নামিয়ে সে বলে, "এইবারে আমরা তেত্রিশ নম্বর লটে এসে পৌঁছলাম।" তার কণ্ঠস্বরে বেজে ওঠে দৃঢ়তার অভিব্যক্তি। ডাক যেই তার মনোমতো পর্যায়ে উঠল, তার একঘেয়ে গম্ভীর কণ্ঠস্বর হ'য়ে এল মৃদু ও মোলায়েম। প্রায় তিন-চার শো লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে তার মুখের কথা লুফে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে থাকে, আগ্রহব্যাকুল দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করে তার হাতুড়ির ওঠানামা। এ দৃশ্য দেখে সে পরিতৃপ্ত না হ'য়ে পারে না। আসলে যদিও সে দৈবের হাতের খেলার পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়, তবু সে মনে করে—এই ব্যাপারে শেষ কথা বলবার অধিকার বুঝি একমাত্র তারই হাতে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস তাকে তাতিয়ে ও মাতিয়ে তোলে আত্মতুষ্টির মাদকতায়। তার কণ্ঠস্বরের কারসাজি দেখে মনে হয়, আমার দৃষ্টির সম্মুখে ময়ূর যেন পেখম মেলেছে। কিন্তু সকালের স্বরূপের কথা যেই মনে পড়ে, অমনি সে ধারণা আমার পালটে যায়, আমি তখন ভাবি, যাদের ক্রীড়া-কসরত জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বন্ধুকে আমার পকেট-মারার সুযোগ দিয়েছিল—দোকানের জানালার সামনে ব'সে-থাকা সেই বাঁদরগুলোরই সমপর্যায়ভুক্ত জীব যেন সে।

নিলামওয়ালাও যদিও তেমনি নিজের অজ্ঞাতসারে পকেটমারদের

সহযোগিতা ক'রে চলেছে, তবু গুণী মানী বন্ধুর পক্ষে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে তার সুযোগ নেওয়া সম্ভব হ'য়ে উঠল না। কারণ জনতা যেভাবে দরজা আটকে দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয়, ভিড় ঠেলে নিলামের টেবিলের কাছে পৌছনোর আপাতত কোনো সম্ভাবনা নেই। আমি যে এই হাতসাফাইয়ের খেলায় কাঁচা শিক্ষানবিস মাত্র সে পাঠ আর একবার আমাকে নতুন ক'রে শিখতে হ'ল। সুচতুর অভিজ্ঞ শিল্পী হিসাবে বন্ধু কিন্তু আমার ভালো-ভাবেই জানেন যে, হাতুড়ির শেষ ঘা যেই পড়বে, অমনি মনুষ্য-প্রাচীরের ঘন সন্নিবিষ্ট গাত্রে দেখা দেবে ফাটল। ভাবতে না ভাবতেই হাতুড়ির শেষ ঘা সজোরে নেমে এল আর সেই সঙ্গে লোকটা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করল: গেল গেল—চিরদিনের মতো চলে যায় মাত্র ৭২৬০ ফাঁতে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমবেত জনতার মাথা নুয়ে পড়ল। ব্যবসায়ীরা ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল মূল্য-তালিকায় দাম দেখবার জন্যে, পরিতৃপ্ত কৌতূহল নিয়ে দু-একজন স্থানত্যাগ করল, ফলে সেই সঙ্গে ফাটল ধরল নিবিড়ভাবে মানুষ-পাঁচিলের নিরেট গায়ে। পকেটমার সুযোগ নিল সেটার তখুনি। সাহসের সঙ্গে ভিড় ঠেলে ও তিন-চারটে সারি ভেদ ক'রে সে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল আর আমিও পণ ক'রে এসেছিলাম যে, লোকটার পিছু কিছুতেই ছাড়ব না, তবু ভিড়ের সীমান্তরেখার শেষ প্রান্তে আমাকে আটকে প'ড়ে থাকতে হ'ল।

এগিয়ে যেতে আমিও যে চেষ্টা করলাম না তা নয়, কিন্তু নিলামওয়ালা তখন আর এক দফা নতুন লটের কথা ঘোষণা করতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে আর দেবার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচিলের ফাটল আবার জুড়ে গেল আগেকার মতোই। আমি অসহায়ের মতো সেই ভিড়ের চাপে চ্যাপটা হ'য়ে রইলাম। ডাইনে আর বাঁয়ে, সামনে ও পিছনে ভিড়ের চাপ এমন দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে যে, ধারে-কাছে কেউ একটু কাশলেই সেই কাশির চোটে দুলে দুলে ওঠে আমার গোটা শরীরটা। ঘরের ভেতরের বাতাস তখন ধুলোয় আর ঘামের গন্ধে ভ'রে উঠেছে। আমি নিজেও তখন ঘেমে উঠে ওভার-কোটের বোতাম খুলে দেখতে যাচ্ছি আমার পকেট-বইটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা। এর মধ্যে জোর ক'রে ভিড় ঠেলে আমি দু-একটা সারি এগিয়েও এসেছি; কিন্তু বৃথাই, ক্যানারী কোট ইতিমধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। কিন্তু যাবে

কোথায়? এই ঘরের মধ্যেই কোথাও সে নিশ্চয়ই আছে। ঘরের মধ্যে আমিই একমাত্র লোক তার বিপজ্জনক উপস্থিতির কথা যে জানে। আমার স্নায়ু-শিরা দুশ্চিন্তায় কাঁপছে—এই বুঝি সে ধরা পড়ল। আমার মনে কি জানি এই ধারণাই বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে যে, আজকের এই মিনিটটা তার পক্ষে বিশেষ শুভ নয়। প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমি আশঙ্কা করছি, এই বুঝি চোর-চোর রব উঠল, এই বুঝি পকেট মারতে গিয়ে সে ধরা পড়েছে দু'জন তার দু'হাত চেপে ধ'রে আছে, আর কেউ না কেউ ছুটে গেছে পুলিশ ডাকতে। বিপদ তার প্রতীক্ষায় আজ অদূরে ব'সে আছে—এই বিশ্বাস যে কেন আমার মনে জাগল, আজও তা আমার কাছে এক দুর্বোধ্য প্রহেলিকার মতো। সম্ভবত তার লক্ষণ ফুটে উঠেছিল লোকটির মুখে।

কিন্তু সেরকম কোনো কিছুই ঘটল না, কেউ চেঁচাল না চোর-চোর বলে। হট্টগোলের বদলে ঘরের মধ্যে নেমে এল এমন এক নিস্তব্ধতা যে মনে হয় ঘরের ভেতরকার তিন-চার শো লোক যেন সহসা নিশ্বাস বন্ধ ক'রে রেখেছে। তারা সকলেই চেয়ে আছে নিলামদারের মুখের দিকে। সে তখন দু'এক পা এগিয়ে আসার দরুন আলোর ছটাটা সোজা এসে পড়েছে তার মুখের ওপর। নিস্তব্ধতার হেতু বুঝতে দেরি হ'ল না। দ্রব্যতালিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি এইবারে নিলামে উঠতে চলেছে। সেটা হচ্ছে একটা অতিকায় ফুলদানি, প্রায় তিন শো বছর আগে চীন সম্রাটের জনৈক বিশেষ প্রতিনিধি সেটা বহন ক'রে এনেছিলেন ফ্রান্সের রাজাকে উপহার দেবার জন্য। ফরাসী বিপ্লবের আরও অন্য শিল্প-সম্পদের সঙ্গে এটিও রাজদরবার থেকে অপসারিত হয়—আর নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের পর অবশেষে সেটা আশ্রয় লাভ করে এক ধনী মহিলার ঘরে। বিশেষ যত্ন আর সতর্কতার সঙ্গে চারজন ইউনিফর্ম পরা কুলি সেটাকে টেবিলের ওপর এনে রাখল। তার সাদা ধবধবে গায়ে যেন ফুটে উঠেছে নীল রঙের শিরা উপশিরা। নিলামওয়ালা গম্ভীরভাবে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে ঘোষণা করল যে, একটা বিশেষ মূল্যবান বস্তু হিসাবে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার যাঁর নিচে কোনো ডাকই দেওয়া চলবে না এবং দিলেও সেটা গ্রাহ্য হবে না। এক লক্ষ ত্রিশ হাজার! এতগুলো 'না' এর নামাবলী গায়ে দিয়ে যে আতঙ্কটা জনতার সামনে এসে দাড়াল, লোক সশ্রদ্ধ নীরবতার সঙ্গে তাকে সংবর্ধিত না ক'রে পারল

না। কারও সাহসে কুলাল না যে, একটা ডাক দেয় এক পা নড়ে বা একটা শব্দ উচ্চারণ করে, শ্রোতারা যেন মৌন, বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে জমাট পাথরে পরিণত হয়ে গেছে। অবশেষে একজন খর্বাকৃতি লোক মাথায় এক গাদা সাদা চুল নিয়ে টেবিলের বাঁ দিকে উঠে দাঁড়াল এবং চাপা গলায় বলল, এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার। সঙ্গে সঙ্গে আর এক কোণ থেকে অন্য আর একজন লোক তার জবাবে জানাল, এক লাখ চল্লিশ হাজার। ডাক তখন দ্রুত চড়তে আরম্ভ করেছে। কোনো একটা আমেরিকান নিলামী ফার্মের জনৈক প্রতিনিধি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি মুখে কোনো ডাক না দিয়ে প্রতিবার আঙুলের ইশারায় জানিয়ে দিতে লাগলেন যে, চলতি ডাকের চেয়ে তার ডাক রইল পাঁচ হাজার করে বেশি। অন্য আর এক প্রান্ত থেকে কোনো একটি নামজাদা ফার্মের লোক মুখ ফুটে ডাক দিয়ে তার জবাব দিতে লাগলেন। দেখতে দেখতে দু'জনাই অবতীর্ণ হয়ে পড়লেন নিলামের দ্বৈরথ যুদ্ধে। তারা যদিও পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তবু কেউ কারও মুখের দিকে চোখ তুলে চাইছেন না। তাদের ডাক গ্রহণ করা হ'ল। শেষকালে বিখ্যাত ফার্মের সেক্রেটারি যখন হেঁকে বসলেন দু' লাখ ষাট হাজার আর নিলামদার যখন ফিরে চাইল মার্কিন ফার্মের প্রতিনিধির দিকে, তিনি আর আঙুল তুললেন না এবং দু লাখ ষাট হাজারের ডাকই তখন বাতাসে দুলতে লাগল স্তব্ধীভূত শব্দতরঙ্গের মতো। ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে নিলামদার চারবার উচ্চারণ করল ডাকবেন না আর কেউ? কণ্ঠস্বর হতাশাপীড়িত। আওয়াজ তোলার জন্যে যতটুকু কম্পন দরকার—কাঁপনের পরিমাণ তার চেয়ে কম হলে কোনো বাদ্যযন্ত্রের তারে যেমন ক্ষীণ প্রতিধ্বনি জাগে কক্ষের নীরবতা তেমনিভাবে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। নিলামদার হাতির দাঁতের হাতুড়িখানা যেই না আরও উঁচুতে তুলে ধরেছে মনে হল তিন শো হৃদপিণ্ডের স্পন্দন যেন সহসা বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর পর পর তিনবার সে হাঁকল—যাচ্ছে—চলে যাচ্ছে মাত্র দু লক্ষ ষাট হাজার টাকায়। তবু কোনো দিক থেকে কোনো জবাব নেই। অবশেষে হাতুড়ি সশব্দে নেমে এল টেবিলের ওপর আর আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষিত হল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। নিলাম শেষ।

দুই লক্ষ ষাট হাজার। মানুষের দেহ দিয়ে গড়া জমাট-বাঁধা দেয়াল

দেখতে দেখতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে তৈরি হল কতকগুলো চলমান জীবন্ত মনুষ্যমূর্তিতে। ঘরময় জেগে উঠল নড়া-চড়া, নিশ্বাস প্রশ্বাস ও গলা-খাঁকানির শব্দ। ঘনসন্নিবদ্ধ মনুষ্যসারির সমষ্টিগত দেহ যেন মুহূর্তের মধ্যে ভেঙেচুরে পরিণত হল কতগুলো আন্দোলিত ব্যষ্টি তরঙ্গে। একই প্রাণ-স্পন্দের দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে একই দিকে যেন তারা এগিয়ে চলেছে।

সে আন্দোলনের আঘাত আমার গায়েও এসে পড়ল, জনৈক অপরিচিত ব্যক্তির কনুইয়ের খোঁচা এসে লাগল আমার বুকে। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় গুঞ্জন করে উঠল, মাপ করবেন মশাই। আমি চমকে উঠলাম, সেই কণ্ঠস্বর। ঠিক এ তো সেই লোকটাই বটে। সৌভাগ্যক্রমে ভেঙে-পড়া ব্যষ্টি-তরঙ্গের আঘাত তাকে আমার কাছে এনে ফেলে দিয়েছে। আমার সঙ্গছাড়া হ'য়ে যাওয়ার পর তাকে আমি কাছে পেলাম এই সর্বপ্রথম। এখন আমি ওর ওপরে নজর রাখতে পারব, ওকে রক্ষা করতে পারব। আমি অবশ্য তার মুখের দিকে একবারও সোজাসুজি চাইলাম না। বাঁকা চোখে মাঝে মাঝে আমি তার হাত দুখানার দিকে তাকাচ্ছি। সেই দুটোই তার কারবার চালাবার প্রধান যন্ত্র। কিন্তু কোথায় হাত। জাদুমন্ত্রবলে সে দুটো যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার কোটের হাতা দুটো দু'পাশে ঝুলে পড়েছে, যেন শীতে সে কষ্ট করছে, এইরকম ভাব দেখিয়ে হাত দুটো সে গুটিয়ে নিয়েছে হাতার মধ্যে। এখন কারও পকেট সে যদি মারতেও যায়, সে স্পর্শ অনুভব করবে নির্দোষ একটা কাপড়ের টুকরোর। বিপজ্জনক আঙুলগুলো ঠিক তেমনিভাবেই হাতার আড়ালে আত্মগোপন করেছে—বেড়ালের নখ যেমন লুকিয়ে থাকে থাবার মধ্যে। খাসা মতলব এঁটেছে কিন্তু। কিন্তু সাফাইয়ের খেলা সে দেখাবে কার ওপর? এদিক ওদিক চাইতে চাইতে হঠাৎ আমার নজর পড়ল ডান দিকে দাঁড়ানো রোগাপটকা এক ভদ্রলোকের ওপর তার কোটের বোতামগুলো সতর্কতার সঙ্গে আঁটা। তারই সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মোটাসোটা গোলগাল একজন লোক—তার দুর্ভেদ্য পৃষ্ঠদেশ আমার দিকে প্রদর্শন করে। এদের দুজনের মধ্যে কারও ওপর হাত চালানো সম্ভব হবে ব'লে আমার মনে হল না। তারপর আমার হাঁটুর কাছে হঠাৎ একটা স্পর্শ অনুভব করে আমি শিউরে উঠলাম, ভাবলাম, তবে কি আমিই তার শিকার হ'তে চলেছি?

এই ঘরের মধ্যে আমিই একমাত্র লোক, যে তার লীলাখেলা সম্বন্ধে সব কথাই জানে, সে ক্ষেত্রে আমারই ওপর হাত চালাবার মতো নির্বুদ্ধিতা কি হবে? ওর গতিবিধি ও কলাকৌশলের সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ আমার ছিল। সত্যি, কিন্তু সে কৌতূহল কি আমার নিজের ওপর দিয়েই আমাকে শেষ পর্যন্ত পরিতৃপ্ত করতে হবে! কিন্তু ক্রমশ এই ধারণাই আমার মনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগল যে, শিকার হিসাবে হতভাগা আজ আমাকেই বেছে নিয়েছে অথচ আমি তার নাড়ীনক্ষত্র জানি আর আমার সহানুভূতি সব সময়েই জেগে রয়েছে তারই সপক্ষে। পকেটমারের কনুই যে ক্রমেই আমার দিকে আসছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ রইল না। তার কুশলী হাতখানা জামার যে হাতের আড়ালে ঢাকা তা একটু একটু ক'রে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আমার কোট আর ওয়েস্টকোটের মাঝখানে দংশন করবার জন্যে সাপের জিবের মতো তার আঙুলগুলো আগ্রহে যেন লকলক করছে।

আত্মরক্ষার পক্ষে পর্যাপ্ত সময় আমার হাতে আছে। তার দিকে একবার ফিরে চাইলে কিংবা কোটের বোতামটা ভালো ক'রে এঁটে দিলেই তো হ'য়ে যায়। কিন্তু প্রত্যাশায় ও উত্তেজনায় আমার সমস্ত দেহটা এমন সম্মোহিত হ'য়ে পড়েছে যে, ঐ দুটো কাজের কোনোটাই আমি ক'রে উঠতে পারলাম না। আমার মনে হ'ল উত্তেজনার সম্মোহে অভিভূত হ'য়ে আমার পেশী, স্নায়ু ও শিরা যেন জ'মে অসাড় হ'য়ে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি মনে মনে গুনে নিতে চেষ্টা করলাম নোট-বুকে কত টাকা আমার আছে। দাঁত, হাতের আঙুল অথবা পায়ের আঙুল—দেহের যে কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধেই যখন অতিমাত্রায় সচেতন হই, তখনই তা হ'য়ে ওঠে তীক্ষ্ণ ও তীব্র অনুভূতি-সম্পন্ন। সেই অনুভবশক্তি দিয়েই আমি বুঝতে পারলাম, নোট-বইটা তখন পর্যন্ত আমার বুক-পকেটেই আছে। তার উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হ'য়ে প্রশান্ত চিত্তে আক্রমণের জন্য আমি প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু অবাক কাণ্ড! আমি তখন পর্যন্ত বুঝেই উঠতে পারছি না—আক্রমণ আসুক আমি চাই অথবা না আসাই আমার কাম্য। আমার মন যেন একটা ঘূর্ণিতে প'ড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। আন্দোলিত হচ্ছে একই সরলরেখার দুটো বিপরীত প্রান্ত স্পর্শ ক'রে। তার কল্যাণের কথা ভেবে আমি কামনা করছি,

আমার গায়ে সে যেন হাত না দেয়, পক্ষান্তরে কোনো দন্তচিকিৎসকের দোকানে বসে দন্ত-উৎপাটন যন্ত্রকে মুখের কাছাকাছি এগিয়ে আসতে দেখলে আসন্ন আক্রমণ সম্বন্ধে যে আশঙ্কায় মন আন্দোলিত হয়, অবিকল সেই আশঙ্কা ও অনুভূতি নিয়ে আমি আক্রমণের প্রতীক্ষা করছি। কিন্তু আমার কৌতূহল-আতিশয্যের জন্য আমাকে দণ্ডদানের উদ্দেশ্যে ক্যানারী কোর্ট যেন ব্যস্ততার কোনো লক্ষণ দেখাল না, অথচ সে আমার এত গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে যে, তার দেহের উত্তাপ আমি অনুভব করছি আমার দেহ দিয়ে। সে আরও কাছে এগিয়ে আসছে একটু একটু ক'রে। আমার অনুভব-শক্তি যখন এই স্পর্শ নিয়ে বিভোর, তখন অন্য ইন্দ্রিয় দিয়ে আমি নিলামের টেবিলের ঘটনা নিরীক্ষণ করছি। তিন হাজার সাত শো পঞ্চাশ। আর ডাকবেন কেউ? ধন্যবাদ। তিন হাজার সাত শো ষাট। তিন হাজার সাত শো সত্তর—তিন হাজার সাত শো—তিন হাজার সাত শো আশী—তিন হাজার সাত শো নব্বই। আর ডাকবেন কেউ? চার হাজার—চার হাজার। চার হাজার এক, চার হাজার দুই চার হাজার তিন। সঙ্গে সঙ্গে হাতুড়ি নেমে এল সশব্দে।

জনতার জোয়ারে ভাটা পড়ল আর একবার। হাতুড়ি নামবার ঠিক চূড়ান্ত মুহূর্তে সঞ্চিত উত্তেজনার কিছুটা প্রশমন পরিলক্ষিত হয়। ঠিক সেই সময়ে আমি অনুভব করলাম, ঢেউগুলো যেন আমার বুকের তটেই ভেঙে পড়ছে। তেমন জোর ধাক্কা নয়, ঠিক চলমান সরীসৃপের স্পর্শের মতোই লঘু। মনে হ'ল, সাপের দেহের মতো কি যেন একটা পিচ্ছিল পদার্থ আমার বুকের ওপর লঘু স্পর্শ বুলিয়ে চ'লে গেল। সে স্পর্শ এত সূক্ষ্ম—এমন লঘু যে, উত্তেজনায় সমস্ত ইন্দ্রিয় আমার এইরকম সম্পূর্ণরূপে সজাগ হ'য়ে না থাকলে সে ছোঁয়া আমি অনুভব করতেই পারতাম না। ঠিক যেন একটা দমকা হাওয়া এসে আমার বুকে হাত বুলিয়ে গেল, এক আমার ছোঁয়া দিয়ে গেল যেন একটা উড়ন্ত চড়াইয়ের ডানা।

অবাক কাণ্ড। যে লিকলিকে আঙুলগুলো আমার কোটের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল, দেখি কি, আমার নিজের হাত লাফিয়ে উঠে সেই আঙুলগুলো চেপে ধরেছে। আত্মরক্ষামূলক এই ব্যবস্থা আমার পূর্বপরিকল্পিত নয়। আমার স্বয়ংসক্রিয় সংস্কার-জীবনের ক্ষেত্রে যে ভাবটি নৈতিক ইচ্ছারূপেই

বিরাজ করছিল, ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ারূপে রক্ষাব্যবস্থার আকারে আত্ম-প্রকাশ ক'রে তাই আমাকে সচকিত ক'রে তুলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সবিস্ময়ে আমি দেখি যে, আমার হাত একখানা কম্পমান ঠাণ্ডা কব্জি চেপে ধরেছে। এত ক্ষিপ্রতা ও এমন কৃতকার্যতার সঙ্গে কাজটা আমি ক'রে ফেলেছি যে, সচেতন মনের পক্ষে সে অসাধ্য সাধন করা কখনও সম্ভব নয়, সে কাজ আমার অনিচ্ছাকৃত।

সেই মুহূর্তের অনুভূতি অবর্ণনীয়। একজন লোকের হাত চেপে ধরেছি বলে আমার হাত ভয়ে ও বিস্ময়ে যেন অসাড় হ'য়ে গেছে। তার দেহও তেমনি আতঙ্কে অবশপ্রায়। তার হাত ছেড়ে দেবার মতো সামর্থ্য ও উপস্থিত বুদ্ধি আমি যেমন সঞ্চয় ক'রে উঠতে পারছি না, সেও তেমনি হাত ছাড়িয়ে নেবার শক্তি অথবা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রদর্শন করতে পারছে না। নিলামের টেবিল থেকে যখন ডাকের পর ডাক চ'ড়ে চলেছে, আমি তখন কিন্তু কম্পমান হাতখানা সবলে চেপে ধ'রে আছি। ডাক পর্দায় পর্দায় যখন ক্রমশ উঁচুতে উঠছে, তখন আমার আর পকেটমারের মধ্যে যে পাঞ্জা কষাকষি চলেছে তার আভাস পর্যন্ত কেউ টেরও পাচ্ছে না, কেউ জানতেও পারছে না যে, ঘরের মধ্যে দুটো মানুষের সঙ্গে চলেছে এমন একটা সংগ্রাম—যার পরিণতি এক অভূতপূর্ব সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে লেগেছে মাত্র দশ থেকে কুড়ি সেকেণ্ড, আর এর পরেই আমি স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ পেলাম। হাতের মুঠি একটু শিথিল করলাম আর করবামাত্র আগন্তুকের হাত অদৃশ্য হ'য়ে গেল ক্যানারী কোটের মধ্যে।

নিলামদার তখন পর্যন্ত ডাকের পর ডাক দিয়েই চলেছে আর আমি ও পকেটমার তখন পর্যন্ত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি; রহস্যজনক এই কারবারের যৌথ অংশীদার আমরা দু'জনেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত। দু'জনেরই বুকে একই অনুভূতির চাঞ্চল্য স্পন্দিত হচ্ছে। আমি তখন পর্যন্ত তার গায়ের উত্তাপ অনুভব করছি আমার শরীরে। উত্তেজনা যখন ক'মে এল তখন দেখি, আমার হাঁটু দুটো ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে আর অনুভব করতে লাগলাম তার হাঁটুতেও উঠেছে ঠিক ঐরকম কাঁপন। ডাকের পালা তখন পর্যন্ত শেষ হয়নি। আমরা দুজনেই কিন্তু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি শঙ্কার শৃঙ্খলে আবদ্ধ দুটো অসহায় জীবের মতো। আমি এতক্ষণে তার দিকে

মুখ ফেরালাম, ভালো ক'রে দেখে নিলাম লোকটাকে, সেও আমার দিকে চাইল ঠিক সেই মুহূর্তে। আমাদের চারটে চোখের মিলন হবামাত্র তার চোখের ভাষা আমি পাঠ ক'রে নিলাম, সেখানে যেন নীরব মিনতি ফুটে উঠেছে দয়া ক'রে পুলিশের হাতে আমাকে ধরিয়ে দেবেন না। সেই ভয়কাতর দৃষ্টির মধ্যে আমি দেখতে পেলাম, এক নিপীড়িত আত্মার নীরব বাণীর বাঙ্ময় প্রকাশ। শিকারীর তাড়িত বন্য জন্তু-সুলভ আশঙ্কা ফুটে বেরুচ্ছে ওর সংকুচিত চক্ষুতারকায়, আতঙ্কে তার দাড়িভরা থুতনিটা থরথর ক'রে কাঁপছে। বিশেষভাবে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল ওর ভয়চকিত দৃষ্টি। সাধারণভাবে তার সমস্ত ব্যাপারে সেদিন যে আতঙ্কের অভিব্যক্তি দেখেছি সেটা তার আগে অথবা পরে আর কোনো দিন আমার চোখে পড়েনি। আমারই মতো একজন মানুষকে ক্রীতদাসের মতো ভয়ত্রস্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে আমি লজ্জিত না হয়ে পারলাম না। তার জীবনমরণের সব দায়িত্বই যেন আমার হাতে। তার সেই ভয়ব্যাকুল ভাব দেখে আমি নিজেকেই অপমানিত বোধ করছি। দুঃসহ এ অবস্থা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যেই আমি অন্য দিকে মুখ ফেরালাম।

সে আমার অভিপ্রায় টের পেয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে যে পুলিশের হাতে আমি তাকে তুলে দেব না। এ কথা বোঝবার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার হারানো শক্তি ফিরে পেল। গা টাকে একটু ঝাঁকিয়ে নিয়েই সে আমার কাছ থেকে দূরে স'রে যেতে লাগল। আমার সঙ্গে তার আর যেন দেখা না হয়—এই তখন তার একমাত্র কামনা। এখন আর তার গায়ের কাঁপন বা গায়ের উত্তাপ অনুভব করছি না। সে আবার সেই পাকা পকেটমার, পাঁকাল মাছের মতো সে তখনি নিঃশব্দে জনতার বাইরে চলে গেল।

তার গায়ের উত্তাপ যখন আমার স্পর্শগ্রাহ্য নয় বিবেকের দংশন আমি অনুভব করলাম মাত্র তখনই আমার মনে হল, আমার জন্যেই যে সংশয় ও শঙ্কা সে ভোগ করেছে তার জন্যে ক্ষতিপূরণ না দিয়ে এমনভাবে তাকে বিদায় দেওয়া উচিত হয়নি। তা ছাড়া হাতের সূক্ষ্ম খেলার যে শিক্ষা আজ আমাকে সে নিজের অজ্ঞাতসারে দিয়েছে তার জন্যও তার কাছে আমি ঋণী, আর এর জন্যই একটা মোটা রকমের দক্ষিণা সে নিশ্চয়ই দাবি করতে পারে। তাড়াতাড়ি আমি বেরিয়ে পড়লাম বাইরের দিকে। কিন্তু হতভাগা আমার

গতিবিধি লক্ষ্য করছে আর আমার উদ্দেশ্য ভুল বুঝছে। সে কি ভাবল, হঠাৎ আমি মন পবিবর্তন করেছি, স্থির করেছি তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে? আমি ঘর থেকে বারান্দায় বেরুবার আগেই বারান্দার ভিড় ঠেলে সে প্রায় অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। তার ওভার-কোটের হল্‌দে উজ্জ্বল আভা আমার দৃষ্টিপথে এল মাত্র মুহূর্তেব জন্যেই, তাব পবে তার মূর্তিটা মিলিয়ে গেল দৃষ্টির অন্তবালে। আমাব পথ-চলতি পাঠ গ্রহণের পালা শেষ হ'ল এইখানে।

বিরাট

কর্ম ত্যাগ করিলেই কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। এক মুহূর্তের জন্যেও কর্ম হইতে বিরত থাকা অসম্ভব।

কর্ম কাকে বলে? এবং নিষ্ক্রিয়তারই বা সংজ্ঞা কি? জ্ঞানী ঋষিরা আজও এইসব মৌল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারেন নাই। কর্ম সম্বন্ধে যেমন সচেতন থাকিতে হইবে, নিষিদ্ধ কর্ম সম্বন্ধেও তেমনি সচেতন থাকা প্রয়োজন। আবার নিষ্ক্রিয় অবস্থারও বিচার-বিশ্লেষণ অবশ্য কর্তব্য। কারণ কর্মের গতি দুর্বোধ্য।

[ভগবদ্গীতা]

মহাজ্ঞানী বুদ্ধের আগে, যখন পৃথিবীর মানুষ তাঁর জ্ঞানের আলোকে মহিমান্বিত হয়নি তখন রাজপুতানায় এক রাজার অধীনে বীরভাগে বিরাট নামে একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ন্যায়পরায়ণ লোক বাস করতেন। তরবারি চালনায় তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। যোদ্ধা হিসাবে সুনাম ছিল তাঁর। সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন বিরাট। শিকার করতে ভালবাসতেন। যখন তিনি তীর ছুঁড়তেন তখন কোনোদিনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ত না। হাতের বল্লম কেঁপে ওঠেনি কখনো। তরবারি চালনায় ছিল বজ্রের সামর্থ্য। কিন্তু মুখটি ছিল নির্মেঘ আকাশের মতো স্বচ্ছ। কারো দৃষ্টির সামনেই চোখ কখনো তাঁর নিস্তেজ হয়ে আসত না। ক্রোধোন্মত্ত হ'য়ে কখনো তিনি চিৎকার করতেন না, কিংবা হাত-পাও ছুঁড়তেন না। তিনি নিজে যেমন রাজার অনুগত প্রজা ছিলেন, তাঁর দাসরাও তাঁকে তেমনি ভক্তিশ্রদ্ধা করত। পাঁচ নদীর দেশে যারা বাস করতেন তাঁদের মধ্যে ন্যায়বিচারের জন্যে এঁর সুখ্যাতি ছিল সবচেয়ে বেশি। সাধুব্যক্তিরা যখন তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করতেন তখন তাঁরা শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যে মাথা নত করতেন। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা তাঁকে দেখতে পেলেই তাঁর প্রশান্ত চোখের দিকে চেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠত।

একদিন রাজার এক বিপদ ঘটল। অর্ধেকটা রাজত্বের শাসনকর্তা ছিলেন রানীর এক ভাই। পুরো রাজত্বের ওপর দখল স্থাপনের জন্যে লালায়িত হ'য়ে

উঠলেন তিনি। গোপনে ঘুষ দিয়ে রাজার সুযোগ্য যোদ্ধাদের হাত করলেন। হাজার হাজার বছর থেকে এক রকমের সারস-জাতীয় পাখি এই অঞ্চলের রাজপুরুষদের পদমর্যাদার প্রতীক ব'লে পরিগণিত হ'ত। সারসপাখিগুলিকে এঁরা পবিত্র ব'লে মনে করতেন। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পুরোহিতরা সেই সারসপাখি নিয়ে হাজির হ'ল তাঁর কাছে। নিয়ে আসতে তাদের প্ররোচিত করলেন তিনিই। এক মাঠের মধ্যে তাঁর হস্তি-বাহিনী জড়ো হ'ল। পাহাড় অঞ্চল থেকে ডেকে নিয়ে এলেন এমন সব লোক যারা আগে থেকেই রাজার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করত। রাজনৈতিক কারণে অসন্তুষ্ট ছিল তারা। সৈন্যবাহিনীতে এরাও এসে যোগ দিল। তারপর তিনি এগিয়ে চললেন রাজধানীর দিকে।

রাজার আদেশে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তামার তৈরি করতাল বাজতে লাগল এবং প্রজারা গজদন্তনির্মিত শিঙা ফুঁকতে লাগল। বড় বড় গম্বুজের মাথায় আগুন জ্বালানো হ'ল। নক্ষত্রখচিত আকাশের তলায় আগুনের শিখা উঠল উঁচু হ'য়ে। শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণেব জন্যে এটাই ছিল আহ্বান-সংকেত। রাজার আহ্বানে কেউ সাড়া দিল না। কারণ, পবিত্র সারসপাখিগুলির চুরি যাওয়ার খবরটা তখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেই খবর শুনে নেতৃবৃন্দ আতঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিলেন। প্রধান সেনাপতি এবং হস্তি-বাহিনীর প্রধান পরিচালক ছিলেন রাজার সবচেয়ে বিশ্বাসী যোদ্ধা। তাঁরা তখন শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। রাজা বুঝতে পারলেন তাঁকে পরিত্যাগ করেছে সবাই। বন্ধু কেউ নেই। প্রজাদের প্রতি তিনি কঠোর ব্যবহার করতেন, শাস্তি দিতে দ্বিধা করতেন না—খাজনা আদায়ের সময় দয়ামায়া দেখাতেন না তিনি। এইসব কথা ভেবে এখন তাঁর মনে অনুশোচনা এল। তিনি দেখলেন রাজপ্রাসাদে কতকগুলি দাস এবং মোসাহেব ছাড়া আর কেউ নেই।

এই নিঃসহায় অবস্থার মধ্যে প'ড়ে রাজা তখন বিরাটের কথা ভাবলেন। শিঙা বেজে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকার-সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রাজার কাছে। আবলুস কাঠে নির্মিত পালকিতে চেপে তিনি চললেন তাঁর নিজের বিশ্বাসী প্রজাবৃন্দের সম্মুখে। বিরাটের কাছে এসে যখন তিনি পালকি থেকে নামলেন তখন মাটিতে উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়লেন

বিরাট। সেনাবাহিনীর পরিচালনার ভার নেওয়ার জন্যে বিরাটকে তিনি অনুরোধ করলেন। বিরাট তাঁকে অভিবাদন ক'রে বলতে লাগলেন, "প্রভু, এই দায়িত্ব আমি সানন্দে গ্রহণ করলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত না বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আর আমার এই গৃহে প্রত্যাবর্তন করব না।"

তিনি তার পুত্রদের, আত্মীয়স্বজন ও দাসদের নিয়ে রাজবাহিনীর অবশিষ্টাংশের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলেন। তারপর এগিয়ে চললেন শত্রু বাহিনীর দিকে। একটা নদীর ধারে এসে থামলেন তিনি। ওপারে তখন অগণিত শত্রু সৈন্যের সমাবেশ হয়েছে। বিদ্রোহীরা গাছ কেটে নদীর ওপর সেতু তৈরি করছিল। ওরা নিঃসন্দেহ হয়েছিল পরের দিন নদীটা পার হ'য়ে আসবে এবং বীরভাগ ভূখণ্ডকে ডুবিয়ে দেবে রক্তের স্রোতে। যেখানে ওরা সেতু তৈরি করছিল সেখান থেকে খানিকটা দূরে একটা অগভীর জায়গা হেঁটে পার হওয়া যেত। বাঘ শিকারের সময় এই জায়গাটার সন্ধান পান বিরাট। মধ্যরাত্রিতে তিনি তার দলবল সহ নদীটা পার হয়ে এলেন। শত্রুপক্ষের ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে বসলেন তিনি। জ্বলন্ত মশাল ছিল এদের হাতে। শত্রুপক্ষের হাতি আর মোষের দলগুলি আতঙ্কিত হ'য়ে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ল। ফলে চতুর্দিকে অরাজকতার সৃষ্টি হল। ঘুমন্ত সৈনিকরা যেন দিশেহারা হ'য়ে গেল বিশ্বাসঘাতক সেনার ভ্রাতার শিবিরে প্রথম প্রবেশ করলেন বিরাট। ঘুম থেকে জেগে ওঠবার আগেই দুজনকে কেটে ফেললেন তিনি। তৃতীয়জন যখন তার নিজের অস্ত্র ধরতে যাচ্ছিল তখন তাকেও বধ করলেন তিনি। তারপর চতুর্থ এবং পঞ্চম ব্যক্তিটির সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে হাতাহাতি যুদ্ধ হ'তে লাগল। এক এক ক'রে প্রত্যেকেই তাঁর তরবারির আঘাতে নিহত হ'ল। এইবার তিনি অস্ত্র হাতে নিয়ে শিবিরের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে রইলেন। পাহারা দিতে লাগলেন কেউ যেন রাজকীয় প্রতীকস্বরূপ পবিত্র সারসপাখিগুলি নিয়ে আবার পালিয়ে যেতে না পারে। কিন্তু কেউ আর সাহস ক'রে এগিয়ে এল না। শত্রু-সৈনিকরা পলায়নরত। বিজয়ী রাজভক্তরা তখন আনন্দোল্লাসে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ছত্রভঙ্গ ক'রে দিল। তরবারি হাতে নিয়ে শিবিরের সামনে অপেক্ষা করতে লাগলেন বিরাট।

অনতিবিলম্বে ভোব হয়ে এল। অবণ্যেব পশ্চাৎদিকে আলোর রেখা ফুটে উঠল। প্রভাতেব সূর্যালোকে তালগাছেব মাথাগুলো সোনালী আব লালেব আভায চিকচিক কবছে। তারই অবিকল প্রতিরূপ ভেসে উঠেছে নদীব বুকে, যেন স্নিগ্ধ আলোব প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। বক্তপিণ্ডেব মতো লাল হ'যে উঠেছে সূব– যেন পুব আকাশেব দেহে মস্ত বড ক্ষতেব চিহ্ন ওটা। বিবার্ট উঠে পডলেন। পোশাক-পবিচ্ছদ খুলে বাখলেন সব। আকাশেব দিকে হাত তুলে তিনি এগিযে এলেন নদীব ধাব পযন্ত। ভগবানেব সুতীব্র অগ্নিচক্ষুব সামনে মাথা নিচু কবে প্রার্থনা করলেন তিনি। তাবপর আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করবাব উদ্দেশ্যে জলে গিযে নেমে পডলেন। হাতেব বক্ত ধুযে ফেললেন তিনি।

বৌদ্রের ব আর লাল কিংবা সোনালী নেই, স্বচ্ছ হ'যে এসেছে। একটি মাত্র বস্ত্রেব অংশ দিযে দেহটাকে ঢেকে বিবার্ট উঠে এলেন নদী থেকে। মনে আব বৈবীভাব নেই, মুখেব বেখায প্রশান্তিব ছাযা। শিবিবে ফিবে এসে গত বাত্রেব কাযাবলী সম্বন্ধে গভীবভাবে চিন্তা কবতে লাগলেন। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত মৃতব্যক্তিদেব মুখগুলি যেন এখনো ভযেব আন্দোলনে প্রবলভাবে কুঁচকে বযেছে। মনে হয, অপলক দৃষ্টিতে চেযে বযেছে এবা। অন্যাযভাবে যে লোকটি সিংহাসন দখল কবতে চোযছিল ছিন্নাংশব অবস্থায সামনে পডে আছে সে। বীবভাগেব যে প্রধান সেনাধ্যক্ষ ছিল সেই বিশ্বাসঘাতকও মৃত। বুকে তাব তববাবিব আঘাত। যাবা ঘুমন্ত অবস্থায নিহত হযেছিল তাদেব দেখবাব জন্যে বিবার্ট এগিযে যেতে লাগলেন। অর্ধেক দেহ তাদেব মাতুব দিযে আবৃত, চোখেব পাতা বন্ধ। এদেব মধ্যে দু'জনকে তিনি চিনতে পাবলেন না। তাবা যে বিশ্বাসঘাতকেব দাস ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। দক্ষিণ প্রদেশেব লোক এবা, মাথাব চুল পশমেব মতো, গাযেব বংও তাদেব কালো। শেষ মৃতদেহটাব দিকে নজব দিতে গিযে থমকে দাডিযে গেলেন তিনি, দৃষ্টি তাব ঝাপসা হ'যে গেল। মৃতদেহটা কাব? তাঁবই বড ভাই বেলাঙ্গুবেব। স চিল পার্বত্য অঞ্চলেব রাজকুমাব। বিরুদ্ধপক্ষের দলে যোগ দিতে এসেছিল। না জেনে বিবার্ট তাকে নিহত কবেছেন। দেহটা কাঁপছিল তাব। উবু হ'যে বসে পডলেন তিনি। বিপথগামী ভাইটি এখনো বেঁচে আছে কিনা পবীক্ষা কবলেন। দেখলেন, হৃদস্পন্দন তার

চিবদিনেব জন্য থেমে গিয়েছে। প্রাণহীন নিশ্চল চক্ষু দুটিব দিকে চেয়ে বিবাট যেন ভেঙে পডলেন। সাবা অন্তর জুড়ে কান্নাব ঢেউ উঠল তাঁব। নিশ্বাস নিতে পাবছিলেন না। শবদেহ-সমাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে ব'সে পডলেন তিনি। ওদেব মতো নিজেকেও মৃত মনে কবলেন। দেখলেন, মা যেন তাব প্রথম সন্তানকে নিহত কবাব জন্যে বিবাটকে অভিযুক্ত কবছেন। সেইদিক থেকে চোখ ফিবিয়ে নিলেন তিনি।

একটু পবেই চতুর্দিকে হল্লা-চিৎকাবেব আওযাজ উঠল। লুঠেব জিনিস পেযে বিবাটেব সৈনিকেবা সবাই আনন্দে আত্মহাবা হ'যে গিযেছিল।

তাবা ফিবে আসছিল শিবিবেব দিকেই। এখানে এসে যখন দেখতে পেল যে, বানীব ভাই নিহত হযেছে এব পবিত্র সাবসপাখিগুলিব বক্ষা পেযেছে তখন ওবা আনন্দে নেচে উঠল। অন্যমনস্ক বিবাটেব জামা চুম্বন কবল ওবা এবং তববাবি চালনায় সবচেযে সুদক্ষ ব্যক্তি বলে তাকে স্বীকাব ক'বে নিল।

ক্রমে ক্রমে বিজযী সৈনিকদেব ভিড বাডতে লাগল। তাবাও এসে লুঠেব মাল দিযে গাডি ভর্তি কবল। জিনিসেব ভাবে গাডিব চাকা মাটিতে ব'সে গেল। মোষগুলিকে ভীষণভাবে চাবুক না মাবলে গাডিব চাকা তুলতে পাবত না ওবা। নৌকোতেও মাল বোঝাই কবা হযেছিল। সেগুলোও ডুবে যাওযাব উপক্রম। সবাই যখন লুঠেব মাল নিযে ব্যস্ত এবং জযেব আনন্দে বিভোব তখন একজন বার্তাবহ নদী পাব হযে ছুটে গেল বাজাব কাছে সংবাদ পৌছবাব জন্যে।

এতক্ষণ পর্যন্ত বিবাট নিঃশব্দে বসে ছিলেন, যেন স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি। একবাব শুধু কথা বলেছিলেন যখন দেখলেন, তাব সৈনিকবা মৃতদেহগুলিব গা থেকেও জামাকাপড সব খুলে নিতে যাচ্ছে। তিনি তাদেব অন্ত্যেষ্টিক্রিযাব উপযোগী চিতা নির্মাণেব আদেশ দিলেন। দেহান্তবিত হওযাব আগে তাদেব আত্মা যেন আগুনে পুডে বিশুদ্ধ হযে উঠতে পাবে। চক্রান্তকাবীদেব প্রতি তাব এমন সদয ব্যবহাব দেখে এবা সবাই বিস্মিত বোধ কবল। প্রকৃতপক্ষে শবদেহগুলিকে তো টুকবো টুকবো ক'বে কেটে ফেলে শেযাল-কুকুবদেব দিকে ছুঁডে ফেলে দেওযা উচিত ছিল। যাহ হোক শেষ পর্যন্ত বিরাটের আদেশানুসাবে চিতাগুলো সাজিয়ে দিল ওবা। বিবাট নিজেই

তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন। আগুন জ্বলে ওঠবার পরে চিতার ওপর ছড়িয়ে দিলেন ধূপের গুঁড়ো আর চন্দনকাঠ। নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। অপেক্ষা করলেন, যতক্ষণ না শবদেহগুলি পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল।

এদিকে বিরুদ্ধপক্ষের সিংহাসন দখলকারীর ক্রীতদাসরা সেতুটা তৈরি ক'রে ফেলেছিল। সেই সেতু দিয়ে প্রথমে পার হ'য়ে গেল সেনাবাহিনী। তারপর গেল রাজার ক্রীতদাসরা। সবশেষে গেল ঘোড়ায় চেপে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা। বিরাট সকলের আগে সৈনিকদের পাঠিয়ে দিলেন। কারণ, তাদের বিজয়োল্লাস তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না—উপস্থিত মনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া অসম্ভব হ'ল। তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন সেতুর মাঝখানটায়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্রোতের ডান দিকে দৃষ্টি ফেলে রাখলেন। যারা এগিয়ে গিয়েছিল এবং যারা তার পেছনে পেছনে আসছিল তারা সবাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বিরাটের দিকে। তারা দেখল, তিনি তার হাতের তরবারিটা ওপর দিকে তুলে ধরলেন, যেন মহাকাশকে ভয় দেখাচ্ছেন বিরাট। তারপর যখন তিনি হাতটা নামিয়ে ফেললেন তখন তাঁর আঙুলগুলো গেল আলগা হ'য়ে—হাতের অস্ত্র খুলে পড়ল নদীর জলে। উলঙ্গ ছেলের দল তাই দেখে নদীর দু'ধার থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। ওরা ভেবেছিল যে, অস্ত্রটা বুঝি হাত ফসকে প'ড়ে গেল, এবং ডুব-সাঁতার দিয়ে খুঁজে আনবে ওটা। বিরাট নিষেধ করলেন ছেলেদের। তারপর তিনি বাড়ির দিকে ফিরে চললেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একটা কথাও আর বললেন না বিরাট। চতুর্দিকের দৃশ্য দেখে মন তার বিষাদে মগ্ন হ'য়ে গিয়েছিল।

বীরভাগে প্রবেশ করবার প্রস্তরনির্মিত সিংহদরজাগুলি এখনো অনেক দূরে। দুর্গগুলির অত্যুচ্চ চূড়া এখনো চোখে দেখা যাচ্ছে না। এমন সময় একটা বালির ঝড় ছুটে আসতে লাগল এইদিকে। দেখা গেল, একদল পদাতিক এবং অশ্বারোহীও দ্রুতবেগে এইদিকেই আসছে। ঝড়ের গতি হার মানল তাদের কাছে। সেনাবাহিনীকে দেখতে পেয়ে তারা থেমে গেল। তাড়াতাড়ি রাস্তার ওপর বিছিয়ে দিল গালিচা। রাজা নিজেই যে এদিকে এগিয়ে আসছেন এটা তারই সংকেত। জন্ম থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত রাজা কখনো মাটিতে পা ফেলেন না।

হাতির পিঠে চেপে রাজা এসে উপস্থিত হলেন। অঙ্কুশের তাড়না খেয়ে

হাতিটি হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়ল মাটিতে। গালিচাব ওপব নেমে এলেন বাজা। বিবাট ভেবেছিলেন, বাজাব সম্মানার্থে উপুড় হ'যে শুয়ে পডবেন তিনি। কিন্তু পাবলেন না। তাব আগেই বাজা তাকে আলিঙ্গন কবলেন। কোনো সাধাবণ মানুষেব পক্ষে এমন সম্মান লাভ কবা অসম্ভব। সাদাপাখিগুলি উদ্ধাব ক'বে এনেছেন বিবাট। এবাব ওবা বাজাব সামনে সাদা সাদা ডানাগুলি নাড়াতে লাগল। তাই দেখে জনতাব মধ্যে আনন্দেব হুল্লোড় প'ড়ে গেল। ঘোড়াগুলো পা ছুঁড়তে লাগল অতি কষ্টে মাহুতবা রুখে বাখল হাতিগুলিকে। জযোল্লাসের ব্যাপাব দেখে বাজা দ্বিতীযবাব বিবাটকে আলিঙ্গন কবলেন। একজন পবিচাবককে ইশাবা ক'বে ডাকলেন তিনি। তাব কাছে ছিল প্রাচীন কালেব এক বাজপুত বীবেব সম্মানসূচক একখানি তববাবি। গত সাত শো বছবেব মধ্যে সাতবাব এই তববাবিটি বাজভাণ্ডাবে ফিবে এসেছে। হাতলেব গাযে মণিমুক্তা বসানো। ফলাব ওপব সোনালী অক্ষবে লেখা বযেছে এক অলৌকিক বহস্যমূলক উক্তি। সৌভাগ্যেব সূচক ব'লে গণ্য কবা হয উক্তিটিকে। মহাজ্ঞানী এবং পুবোহিতবা ছাড়া এই প্রাচীন লেখাটিব মর্মার্থ কেউ উদ্ঘাটন কবতে পাবে না। কৃতজ্ঞতাব নিদর্শন হিসেবে বাজা এবাব এই সুবিখ্যাত তববাবি দিযে বিবাটকে সম্মানিত করতে চাইলেন। এব দ্বাবা প্রমাণিত হ'ল যে অতঃপব বাজবাহিনীব নেতৃত্ব দেওযা হবে বিবাটকেই।

গভীব সম্মান প্রদর্শন ক'বে বিবাট বললেন, "বাজন্ আপনাব তো দযাব কোনো সীমা নেই। আপনাব কাছে কি একটি ভিক্ষা চাইতে পাবি ?"

আবেদনকাবীব আনত মস্তকেব দিকে চেযে বাজা জবাব দিলেন, "আমাব কাছে কি চাইবে জানি না। না জেনেই তোমাব অনুবোধ আমি মঞ্জুব কবলুম। তুমি শুধু ইচ্ছা প্রকাশ কবলেই আমাব বাজত্বেব অর্ধেকটা তোমায দিতে পাবি।"

"তবে তাই হোক বাজন্—এই তববাবি আপনি ফিবিযে নিন। বাজভাণ্ডাবে তোলা থাক এটা। নিজেব মনে আমি ভগবানকে সাক্ষী বেখে শপথ গ্রহণ কবেছি যে, জীবনে আব কখনো অস্ত্র ধবব না। আমাবই অস্ত্রেব আঘাতে আমাব নিজেব ভাই নিহত হযেছে। একই মাযেব সন্তান আমবা। আমি ছাড়া তাঁর ঐ একটিমাত্রই পুত্র ছিল। তিনি আমাদেব একসঙ্গেই মানুষ ক'বছিলেন।"

বিরাটের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রাজা। তারপর বললেন, "বেশ, তরবারি ছাড়াই তোমায় আমি আমার সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করলাম। আমি জানব যে, শত্রুর আক্রমণ থেকে বীরভাগের রাজবংশ রক্ষা পাবে চিরদিন। দুরতিক্রম্য বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তুমি যেভাবে সৈন্য পরিচালনা করেছ তেমন আর অন্য কোনো যোদ্ধার পক্ষে সম্ভব হ'ত না। তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা সত্যিই প্রশংসনীয়। ক্ষমতার চিহ্ন হিসেবে আমার এই উত্তরীয় গ্রহণ করো তুমি। শুধু উত্তরীয় নয়, আমার অশ্বটিও তোমায় দিলুম। সবাই জানুক, আমার যোদ্ধাদের মধ্যে তুমিই হচ্ছ সর্বপ্রধান।"

রাজার পায়ের কাছে উপুড় হ'য়ে শুয়ে বিরাট পুনরায় বললেন, "সেই সর্বশক্তিমান অদৃশ্য শক্তির অভিপ্রেতের সংকেত আমি দেখতে পেয়েছি, রাজন্। সমস্ত হৃদয় দিয়ে তার অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি। নিজের ভাইকে হত্যা করেছি আমি। এই থেকে আমি শিখলুম যে, যারা মানুষ হত্যা করে তারা প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃহন্তার অপরাধে অপরাধী। আমি আর সেনাবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারব না। কারণ, তরবারিই হচ্ছে পশুশক্তির বাস্তব রূপ। আর পশুশক্তির কাছে ন্যায়পরায়ণতা আশা করা বাতুলতা মাত্র। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যার পরোক্ষ যোগ থাকবে সে নিজেও হত্যাকারী। নর-হত্যার পাপ তাকে স্পর্শ করবেই। রাজন্, এই পাপকর্মের ভীতি মানবসমাজের মধ্যে সৃষ্টি করার কাজ আমি আর করব না। ভিক্ষুকের মতো অর্ধাহারে থাকব, তবুও ভগবানের অভিপ্রায়কে অমান্য করব না। নিত্যপরিবর্তনশীল জগতে মানুষের জীবন কত ক্ষণস্থায়ী! যে ক'টা দিন বাঁচব আমি আর ভুলপথে পা বাড়াতে চাই না।"

কিছুক্ষণের জন্যে রাজা চুপ ক'রে রইলেন। চোখে তিনি অন্ধকার দেখলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত আবহাওয়া ছিল কোলাহলপূর্ণ, এখন সেখানে সৃষ্টি হ'ল ভীতির নৈঃশব্দ্য। বীরভাগের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাজানুগ্রহ পরিহার করছে স্ব-ইচ্ছায় এবং সে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেও আর লিপ্ত হ'তে চায় না, এমন কাণ্ড পূর্বপুরুষদের আমলে কখনো ঘটেনি। শেষ পর্যন্ত রাজা পবিত্র সারসপাখিগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। বিদ্রোহীদের দখল থেকে বিরাটই এই পাখিগুলিকে উদ্ধার ক'রে এনেছেন। এবার এই বিজয়ের চিহ্নগুলো চোখের ওপর ভেসে উঠতেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দৃষ্টি তার পরিষ্কার হ'য়ে

গেল। তিনি বলতে লাগলেন, "আমি তোমাকে বীবপুরুষ ব'লেই জানি। এবং সুবিবেচক মানুষ হিসেবেও এই বাজ্যে তোমাব জুডি মেলা ভাব। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাব সাহায্য না পেলেও হয়তো আমাব চলবে, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে তোমাব সাহায্য আমাব দবকাব। তুমি ন্যায়পবায়ণ, তোমাকে আমি প্রধান বিচাবক হিসেবে নিযুক্ত কবতে চাই। আমাবই বাজপ্রাসাদে বসে বিচাব কববে তুমি। এখানে অসত্য কখনো আব প্রশ্রয় পাবে না, সত্যনিষ্ঠাব নিশান উডবে সাবা দেশ জুডে।"

বিবাট আবাব উপুড হ'য়ে শুয়ে পডলেন মাটিতে। নিজেব ব্যবহৃত হস্তিপৃষ্ঠে উঠে বসবাব জন্যে তাকে আদেশ কবলেন বাজা। পাশাপাশি ব'সে একই সঙ্গে ষাট-সৌধবিশিষ্ট নগবে এসে প্রবেশ করলেন তাঁবা। জনতাব অভিনন্দন-ধ্বনি বিক্ষুব্ধ জলরাশিব মতো উত্তাল হ'য়ে উঠল।

অতঃপব বাজপ্রাসাদেব অভ্যন্তবে লালচে বঙেব মঞ্চেব ওপবে ব'সে বাজাব প্রতিনিধি হিসেবে বিবাট বিচাব কবতে লাগলেন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত। মীমাংসায় পৌঁছুতে তাব সময় লাগত অনেক। নিক্তিব কাঁটা যেমন সমতা বক্ষাব পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ডাইনে বাঁয়ে হেলেদুলে পডে তিনিও তেমনি 'বায' দেওয়াব পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বাদী-বিবাদী সম্বন্ধে গভীবভাবে চিন্তা কবতেন। নিশাচব প্রাণীবা যেমন অন্ধকাবেব বুকে গিয়ে আশ্রয় খোঁজে তিনিও তেমনি আসামীদেব অন্তব খুঁডে সত্যেব সন্ধান কবতেন। তিনি কঠিন শাস্তি দিতেন বটে কিন্তু শুনানীব দিন 'বায' দিতেন না। সিদ্ধান্ত গ্রহণেব পূর্বে বাত্রিব শান্ত পবিবেশে নিমগ্ন হ'য়ে থাকতেন। সূর্যোদয়েব আগে পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় ছাদেব ওপবে পায়চাবি কবতেন। মকদ্দমাব সত্যি মিথ্যা নিয়ে মনে মনে চুলচেবা বিচার কবতেন। কোনো বকম আবেগেব উত্তাপে যেন বিচলিত না হন, সেইজন্যে দণ্ডদানেব আগে ঠাণ্ডা জল দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ফেলতেন তিনি। এবং 'বায' দেওয়াব পবে আসামীকে জিজ্ঞেস করতেন এই বিচাবের বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ আছে কিনা। কদাচিৎ কেউ কখনো অভিযোগ করত। নিঃশব্দে আসামীবা গিয়ে বিচাব-মঞ্চেব সামনে দাঁডাত এবং নত মস্তকে শাস্তি গ্রহণ কবত ওবা। তাঁব বিচারদণ্ডকে এবা ভগবানেব হুকুম ব'লে ভাবত।

বিরাট কখনো মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিতেন না। অপরাধ যদি গুরুতর হয় তবুও না। বিরুদ্ধপক্ষের হাজার অনুরোধও উপেক্ষা করতেন তিনি। মানুষের রক্তে নিজের হাত কলঙ্কিত করতে ভয় পেতেন বিরাট। রাজপুতদের পুরনো নিয়মানুসারে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল আলাদা। একটা ঝরনার পাশে পাথরের ওপর আসামীরা তাদের মাথা দিত এগিয়ে, আর সেই সময় কোতোয়ালের অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু ঘটত ওদের। আসামীদের রক্তে পাথরগুলো সব কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিরাটের বিচারকালে বৃষ্টির জলে পাথরগুলি ধুয়ে-মুছে সাদা হ'য়ে গেল। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, মৃত্যুদণ্ডের নিয়ম উঠে গেল ব'লে মানুষের অপরাধপ্রবণতা বাড়ল না। অপরাধীদের তিনি প্রস্তরে নির্মিত বন্দীশালায় আবদ্ধ করে রাখলেন। তাদের দিয়ে নানা রকমের কাজ করিয়েও নিতেন। পাহাড়ে যেত ওরা। বাগানের চারদিকে প্রাচীর তৈরি করবার জন্যে খাত থেকে পাথর খুঁড়ে আনত। কখনো কখনো চালের কলে কাজ করতেও পাঠিয়ে দিতেন তিনি। কলের চাকা ঘোরাবার জন্যে হাতি ব্যবহার করা হ'ত। হাতির সঙ্গে সঙ্গে এরাও চাকা ঘোরাবার কাজ করত। মানুষের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তার। সেইজন্যে তাঁকেও সবাই শ্রদ্ধা করত। তার সিদ্ধান্ত কখনো ভুল ব'লে প্রমাণিত হয়নি। সত্যানুসন্ধানের জন্যে তিনি যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কথাবার্তায় কখনো রাগের ভাব প্রকাশ করতেন না। দেশের দূর দূর প্রান্ত থেকে কৃষকরা মোষের গাড়িতে চেপে তার কাছে আসত সালিশ মানবার জন্যে। পুরোহিতরা তার মৃদু ভর্ৎসনা কিংবা উপদেশ উপেক্ষা করতে পারত না। এমনকি স্বয়ং রাজা পর্যন্ত তার মন্ত্রণার প্রতি কর্ণপাত করতেন। চতুর্দিকে বিরাটের প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ল। একসময় তিনি যে তরবারি চালনায় সুচতুর ছিলেন তেমন কথাটাও ভুলে গেল সবাই। একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি হিসেবেই তিনি এখন সারা রাজপুতনায় স্বনামধন্য হ'য়ে রইলেন।

বিচারপতির আসন গ্রহণ করবার ষষ্ঠ বৎসরে একটা ঘটনা ঘটল। খাজার নামে এক বন্য জাতির একটি যুবককে বাদীপক্ষ ধ'রে নিয়ে এসে উপস্থিত করল বিরাটের কাছে। এরা পাহাড় অঞ্চলে বাস করত। নানা দেবতায় বিশ্বাসী ছিল এরা। যুবকটির পা থেকে রক্ত পড়ছিল। এই দীর্ঘ পথ তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এসেছে। তার বলিষ্ঠ বাহুদ্বয় দড়ি দিয়ে বাঁধা। হিংস্র প্রকৃতির

যুবকটি যেন কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেইজন্যেই তাকে বেঁধে আনতে হয়েছে।

বিচারমঞ্চের সামনে এসে কয়েদীকে নতজানু হ'য়ে বসে পড়তে বাধ্য করল ওরা। নিজেরা উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। ওপর দিকে হাত তুলে বুঝিয়ে দিল যে, এরাই হচ্ছে অভিযোগকারী—বাদীপক্ষ।

অপরিচিত লোকদের দিকে তাকিয়ে বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, বন্ধুগণ, দূরদেশ থেকে এসেছ, তোমরা কে? আর যাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে এনেছ তারই বা পরিচয় কি?"

দলের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি অভিবাদন ক'রে জবাব দিল, "ন্যায়াধীশ, এই দেশেরই পূর্ব প্রান্তে আমরা বাস করি। আমরা পশুপালক। শান্তিপূর্ণভাবেই জীবনযাপন করছিলুম আমরা। যাকে সঙ্গে ক'রে ধ'রে নিয়ে এসেছি সে অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ। শয়তানের বংশজাত শয়তান। এই জঘন্য ব্যক্তিটি খুনী। তার হাতে যতগুলি আঙুল আছে তার চেয়েও বেশি ওর খুনের সংখ্যা। আমাদেরই একজন গ্রামবাসীর মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল এই লোকটি। কিন্তু মেয়ের বাবা বিয়ে দিতে রাজী হয়নি। কারণ, এদের সম্প্রদায়ের লোকেরা কুকুর এবং গরুর মাংস খায়। সেইজন্যে মেয়েকে সে একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ফেলেছে। তার ফলে এই লোকটি ভীষণভাবে রেগে গেল প্রথমেই বলেছি পশুচারণ আমাদের বৃত্তি। এই যুবকটি আমাদের গরু এবং ভেড়াগুলিকে মারধোর ক'রে তাড়িয়ে দিতে লাগল। একদিন রাত্রে সেই মেয়েটির বাবাকে খুন ক'রে ফেলল ও। শুধু বাবাকে নয়, তার তিনটি ছেলেকেও মেরে ফেলল। তারপর ঐ পরিবারের যে-কেউ পশুচারণের জন্যে পাহাড় অঞ্চলে যায় তাকেই ও খুন করে। ক্রমে ক্রমে আমাদের গাঁয়ের এগারো জন এর হাতে প্রাণ হারাল। শেষ পর্যন্ত আমরা দল বেঁধে একে বন্য শিকারী পশুর মতো খুঁজে বেড়াতে লাগলুম। এখন ওকে বন্দী ক'রে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি, ন্যায়াধীশ। এই দুষ্ট প্রকৃতির লোকটির হাত থেকে আমাদের গ্রামটিকে রক্ষা করুন আপনি।"

বন্দীর দিকে দৃষ্টি তুলে বিরাট জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সম্বন্ধে এরা যা বলল তা কি সত্যি?"

"আপনি কে? আপনি কি এই দেশের রাজা?"

"আমি বিরাট, রাজার একজন ভৃত্য মাত্র। ন্যায়বিচার করাই আমার কাজ। সত্য মিথ্যা অতি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ করি আমি।"

মুহূর্ত কয়েক চুপ ক'রে রইল আসামী। তারপর বিরাটের দিকে গভীর একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল সে, 'এত দূরে ব'সে আপনি কি ক'রে সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করেন? তা ছাড়া আপনি তো বিচার করেন অপর লোকের কথা শুনে।"

'তোমার যা বক্তব্য বলো। দু' দিকের কথা শুনলে আমি বুঝতে পারব, কোন্‌টা সত্য আর কোনটা মিথ্যা।"

কয়েদীর মুখের ভঙ্গীতে উপেক্ষার ভাব। সে বলল, "আমি ওদের কথার বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না। রাগের সময় আমি নিজেই যখন জানি না আমি কি করছি, তখন এখান থেকে আপনিই বা তা জানবেন কি ক'রে? যে লোকটা টাকার লোভে তার মেয়েকে অন্য একজনের কাছে বেচে দিয়েছে তার প্রতি আমি উচিত বিচারই করেছি। তার সন্তান এবং চাকরবাকররাও আমার কাছে ন্যায্য বিচারই পেয়েছে। যত ইচ্ছে এরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনুক আমি এদের ঘৃণা করি। আপনার বিচার-মীমাংসাও আমি গ্রাহ্য করি না।"

এমন একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারপতিকে অবজ্ঞা করতে দেখে বাদীপক্ষ ক্রোধোন্মত্ত হ'য়ে উঠল। আঘাত করবার জন্যে তরোয়াল তুলল কোতোয়াল। ক্রোধ দমন করবার জন্যে এদের তখন ইশারা করলেন বিরাট। আবার তিনি প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। যতবারই বাদীপক্ষ তাকে অভিযুক্ত করতে লাগল ততবারই বিচারপতি আদেশ দিলেন আসামীকে জবাব দেওয়ার জন্যে। কিন্তু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে আসামী শুধু একবারই বলল, 'অন্য লোকের কথা শুনে আপনি কি ক'রে সত্য মিথ্যা যাচাই করবেন?"

জবানবন্দি যখন শেষ হ'ল তখন মধ্যাহ্নের সূর্য মাথার ওপর উঠে এসেছে। বিরাট বিচারাসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। তার যেমন রীতি সেই অনুসারে তিনি বললেন যে, পরের দিন রায় দেবেন তিনি। এখন তিনি বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। অভিযোগকারীরা প্রতিবাদ ক'রে ব'লে উঠল, "প্রভু, আপনার দর্শন লাভের জন্যে সাত দিন ধ'রে পথ হেঁটেছি আমরা। ফেরবার মুখেও বাড়ি পৌঁছতে সাত দিন লাগবে। আগামীকাল পর্যন্ত আমরা কি অপেক্ষা

করতে পারি ? আমাদের গরুবাছুরগুলো তৃষ্ণায় কষ্ট পাবে—জমিতেও লাঙল দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। আমরা অনুরোধ করছি, রায়' যা দেওয়ার এখুনি দিন।"

এই কথা শুনে বিরাট আবার ব'সে পড়লেন। গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে রইলেন খানিকক্ষণ। গুরুদায়িত্ব বহনকারীর মতো চোখের ভুরু গেল কুঁচকে। এমন মকদ্দমার 'রায়' তাকে আগে কখনো দিতে হয়নি। আসামী ক্ষমা প্রার্থনা করল না—উপরন্তু অবজ্ঞা সহকারে উদ্ধত মনোভাব নিয়ে মাথা উঁচু ক'রে রইল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধ্যানস্থ হ'য়ে রইলেন। দিনের আলো শেষ হ'য়ে আসছে। ধীরে ধীরে হেঁটে ঝরনার কাছে এসে উপস্থিত হলেন তিনি। ঝরনার জলে হাতমুখ ধুয়ে ফেললেন। মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা দরকার। আবার তিনি ফিরে এলেন বিচারালয়ে। এসে বললেন, "আমি যা এবার 'রায়' দেব তা যেন পক্ষপাতশূন্য হয়। এই আসামীটি অত্যন্ত গর্হিত পাপ কাজ করেছে। এগারো জন মানুষের জীবন নষ্ট করেছে সে। এগারোটি সুস্থ এবং সবল মানুষ দেহান্তরিত হ'ল এরই জন্যে। মাতৃগর্ভের অন্তরালে একটা জীবন গ'ড়ে উঠতে এক বছর সময় নেয়। অতএব যে ক'টা জীবন এই দোষী ব্যক্তিটি নষ্ট করেছে তার প্রত্যেকটার জন্যে একে এক-এক বছর ধ'রে অন্ধকারের অন্তরালে লুকিয়ে থাকতে হবে। যেহেতু তার পাপকার্যের ফলে এগারোটি দেহ থেকে রক্ত নিঃসৃত হয়েছে সেই কারণে প্রতি বছর এগারোবার তাকে এক শত বেত্রাঘাত করা হবে। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা আমি দিলাম না। কারণ, জীবন হচ্ছে ভগবানের দান। ভগবানের সৃষ্ট জীবন নষ্ট করবার অধিকার আমাদের নেই। আমি আশা করি, আমার 'রায়' ন্যায়সংগত হয়েছে। কোনো মানুষের আদেশক্রমে বিচার আমি করিনি। সমুচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আমি অবলম্বন করলুম।"

তাঁর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অভিযোগকারীরা সম্মান প্রদর্শনার্থে বিচারাসনের গায়ে চুম্বন করল। কিন্তু কয়েদীটির মধ্যে কোনো ভাব-বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পেল না। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সে।

বিরাট বলতে লাগলেন, "তোমার শাস্তি যাতে কঠিন না হয় তার কারণ দেখাবার জন্যে তোমায় আমি অনুরোধ করেছিলাম। বিরুদ্ধপক্ষের অভিযোগগুলি খণ্ডন করবার জন্যে আমায় তুমি সাহায্য করবে ব'লেও

ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমি তো একটা কথাও বললে না। আমার বিচার যদি ভুল হ'য়ে থাকে তাহ'লে ভগবানের কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে পারবে না তুমি। এইজন্যে দায়ী আমি নই, দায়ী তোমার নিস্তব্ধ মনোভাব। আমি নিজে তোমার প্রতি ক্ষমাশীল হওয়ার জন্যে আগাগোড়াই সচেষ্ট ছিলাম।"

আসামীটি এবার জবাব দিল, "আমি আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি না। আপনি আমার জীবন নষ্ট করছেন—অতএব আপনার ক্ষমার মূল্য আর কতটুকুই বা হ'তে পারত ?"

"না, তোমার জীবন আমি নষ্ট করিনি।"

"করেননি ? অবশ্যই করেছেন। বরং আমাদের পাহাড় অঞ্চলের মুরুব্বীদের চেয়েও আপনার বিচারদণ্ড বেশি নিষ্ঠুর। এদেরই তো আপনারা বর্বর ব'লে অভিহিত করেন। আমাকে মেরে ফেলছেন না কেন ? আমি তো প্রত্যেকটা লোককে খুন করেছি। আপনি খুনের আদেশ দিলেন না বটে, কিন্তু শবদেহের মতো আপনি আমায় মাটির নিচে পুঁতে ফেলবার হুকুম জারি করলেন। ধীরে ধীরে আমি সেখানে প'চে মরব। এমন ব্যবস্থা আপনি কেন করলেন ? তার কারণ, রক্তপাত করতে আপনি ভয় পাচ্ছেন। আপনি ভীরু। এই আইন আপনার খেয়ালখুশিমতো তৈরি হয়েছে। আপনার বিচারদণ্ডে আমি শহীদ হওয়ার গৌরব অনুভব করছি। আপনি আমায় হত্যা করুন। কারণ আমি নিজেও তো হত্যা করার অপরাধে অপরাধী।"

"আমি তোমায় ন্যায়ানুমোদিত দণ্ডই দিয়েছি।"

"ন্যায়ানুমোদিত ? আপনার ন্যায় যে সত্যিই ন্যায়ানুমোদিত আমি কি ক'রে তা বুঝব ? কি ক'রে আপনি তা পরিমাপ করেন, ন্যায়াধীশ ! আপনি নিজে যদি যন্ত্রণা ভোগ না ক'রে থাকেন তাহ'লে যন্ত্রণা যে কি তা আপনি কেমন ক'রে জানবেন ? আঙুলে গুনে বছরগুলো আপনি কত সহজেই না চিহ্নিত ক'রে দিলেন ! যেন দিনের আলোয় সময় কাটানো আর রাত্রির অন্ধকারে আবদ্ধ হ'য়ে থাকার মধ্যে কোনো তফাত নেই। আপনি নিজে কি কখনো বন্দীজীবন যাপন করেছেন ? আপনি কি ক'রে জানবেন বন্দীজীবনের লাঞ্ছনা ? আপনাকে অজ্ঞ বললেও অত্যুক্তি হয় না। ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তিও আপনি নন। কারণ, আঘাত না পেলে আঘাতের মর্ম

বোঝা যায় না। আপনি শুধু আঘাত দিতেই জানেন। যে লাঞ্ছিত তার পক্ষেই লাঞ্ছনার পরিমাপ করা সহজ। আপনার আত্মাভিমান এত বেশি যে, আপনি ভাবছেন, অপরাধীকে উপযুক্ত দণ্ড দিচ্ছেন আপনি। প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বড় অপরাধী আপনি নিজেই। আমি হত্যা করেছি ক্রোধোন্মত্ত হ'য়ে। ক্রোধের বশে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। আপনি হত্যা করছেন ঠাণ্ডা মেজাজে। এই নির্মম দণ্ডবিধান আপনি পরিমাপ করতে পারেননি। কারণ, দণ্ডভোগের অভিজ্ঞতা আপনার নেই। আপনার অধঃপতন পরিপূর্ণ হওয়ার আগে ঐ বিচারাসন থেকে নেমে আসুন আপনি! যার বিচারপদ্ধতিতে শৈথিল্য আছে তার মাথায় যেন অভিশাপ ভেঙে পড়ে। ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে যার এত বড় মিথ্যা ধারণা রয়েছে তার অমঙ্গল আমি কামনা করি। হে অজ্ঞ বিচারক, বিচারাসন ত্যাগ করুন আপনি। মানুষের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেওয়ার কাজ আর করবেন না!"

বিরাটের উদ্দেশে কটূক্তি করতে করতে ক্রোধের উত্তাপে কয়েদীর মুখ পাংশু হয়ে গেল। জনতার মধ্যেও উত্তেজনা বাড়ল। তারা আবার তাকে আক্রমণ করবার জন্যে উদ্যত হ'য়ে উঠল। বিরাট তাদের বাধা দিয়ে পুনরায় শান্ত স্বরে বলতে লাগলেন, "যে দণ্ডবিধান আমি করেছি তা বাতিল করবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার বিশ্বাস, 'রায়' যা দিয়েছি তা ন্যায়সংগত।"

বিচারালয় ত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছিলেন বিরাট। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তিনি আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। জনতা যখন কয়েদীকে ধরতে গেল তখন সে আবদ্ধ অবস্থায়ই তাদের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। বিরাট ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েদীর ক্রোধোন্মত্ত চোখের দিকে চেয়ে রইলেন। সহসা তাঁর দেহটা কেঁপে উঠল যেন। মনে হ'ল, কয়েদীর চোখ দুটির সঙ্গে তাঁর সেই মৃত ভাইটির চোখের কি অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে! নিজের হাতেই ভাইকে তিনি নিহত করেছিলেন। প্রধানতম চক্রান্তকারীর শিবিরে তার শবদেহটা চোখে পড়েছিল বিরাটের।

সেই রাত্রে বিরাট আর কারো সঙ্গে কথা বললেন না। কয়েদীর দৃষ্টি যেন তীরের মতো তাঁর হৃদয়ে গিয়ে প্রবেশ করেছিল। ছাদের ওপর সারা রাত তিনি পায়চারি ক'রে বেড়ালেন।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত হলেন তিনি। জলাশয়ের পবিত্র জল দিয়ে অভিষেক শেষ করলেন। পুব দিকে মুখ ক'রে

প্রার্থনা কবলেন। তাবপব বাড়ি ফিরে এসে পদমর্যাদাসূচক হলুদ রঙেব সিল্কেব পোশাক পরলেন তিনি। বাড়িব সবাইকে অভিনন্দন কবলেন। তাঁব এই অযাচিত বিনয়-অনুষ্ঠানেব জন্যে প্রত্যেকে বিস্ময বোধ কবল বটে, কিন্তু সাহস ক'বে কেউ তাঁকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কবতে পাবল না। তিনি চ'লে এলেন বাজপ্রাসাদে। এখানে প্রবেশ কবতে তাঁকে কখনো অনুমতি নিতে হ'ত না। বাত্রি এবং দিনেব মধ্যে যখনই হোক তিনি বাজপ্রাসাদে প্রবেশ কবতে পাবতেন। বাজাব সামনে এসে নতমস্তকে বাজপোশাক স্পর্শ কবলেন বিবাট। বাজা বুঝতে পাবলেন তাব কাছে বিবাট নিশ্চযই কোনো একটা আর্জি পেশ কবতে চান। তাই তিনি বিবাটেব দিকে চেযে সস্নেহে বললেন, "তোমাব অন্তর্বাসনা আমাব পোশাক স্পর্শ কবেছে। পেশ কববাব আগেই তোমাব আর্জি আমি মঞ্জুব কবলুম।" মাথা নিচু ক'বে বিবাট বলতে লাগলেন, 'বিচাবকদেব মধ্যে আমাকেই আপনি প্রধান বিচাবকেব পদমর্যাদা দিয়েছেন। গত ছ' বছব ধবে আপনাব প্রতিনিধি হিসেবে বিচাব কবেছি আমি। জানি না, বিচাব আমাব ন্যাযসংগত হযেছে কি না। আপনি আমাব এক মাসেব ছুটি মঞ্জুব করুন। এক মাসেব নিশ্চিন্ত বিশ্রামেব মধ্যে ব'সে সত্যেব পথ আমায খুঁজতে দিন, বাজন্। আমাব এই সত্যসন্ধানেব ফলাফল আপনাকে কিংবা অন্য কাউকে জানাতে চাই না। এমন কাজ আমি কবতে চাই যাব মধ্যে বিন্দুমাত্র অবিচাব নেই। বাজন্, নিষ্পাপ জীবনযাপন কবাই আমাব একমাত্র কাম্য।"

বিস্ময়াবেগে অধীব হ'যে উঠলেন বাজা। তিনি বললেন, "তোমাব এক মাসেব অনুপস্থিতিতে এই বাজ্য আমাব দবিদ্র হ'যে থাকবে। সে যাই হোক, তোমাব পথেব ঠিকানা আমি জানতে চাই না। আমি শুধু আশা কবব যে, তুমি যেন সেই পথ ধ'বে সত্যে পৌঁছতে পাবো।"

কৃতজ্ঞতাব স্বীকৃতি হিসেবে সিংহাসনেব পদপ্রান্তে চুম্বন কবলেন বিবাট। এবং শেষবাবেব মতো বাজাকে অভিবাদন ক'বে তিনি বাজপ্রাসাদ ত্যাগ ক'বে গেলেন।

বাড়ি ফিবে এসে স্ত্রী এবং সন্তানদেব ডেকে তিনি বললেন, "এক মাসেব জন্যে তোমবা কেউ আমায় দেখতে পাবে না। কোনো প্রশ্ন ক'বো না

আমায—তোমাদেব কাছ থেকে বিদায নিচ্ছি আমি। ঘবে গিযে তোমবা দবজা বন্ধ ক বে বাখো। আমি কোন দিকে যাচ্ছি তাও যেন তোমবা দেখতে না পাও। একটা মাস শেষ না হ লে তোমবা কোনো কিছু জানবাব চেষ্টাও ক'বো না।"

বিবাটেব আদেশ পালন কবলেন এঁবা। কালো বঙেব কাপড পবলেন তিনি। দেবমূর্তিব সামনে প্রার্থনা কববাব পব তালপাতাব ওপব চিঠি লিখলেন একটা। দীর্ঘ চিঠি। অন্য কোথাও পাঠাবাব জন্যে গোল ক বে চিঠিখানা পাকিযে বাখলেন। সন্ধেব পবে নিস্তব্ধ গৃহ ত্যাগ ক বে বিবাট চ লে এলেন পাহাড অঞ্চলে। এইখানেই বীবভাগেব বন্দীশালা। দবজায কবাঘাত কবলেন বাববাব। কাবাবক্ষকেব ঘুম ভেঙে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা কবলেন, 'কে?"

"আমি বিবাট, বীবভাগেব প্রধান বিচাবক। গতকাল যে কযেদীটিকে এখানে আনা হযেছে তাব সঙ্গে আমি দেখা কবতে চাই।'

'বন্দীশালাব সবচেযে নিচু এব অন্ধকাব ঘবে তাকে বাখা হযেছে সেখানে কি আপনাকে আমি নিযে যাব হুজুব?"

"সেই জাযগাটা আমি চিনি। আমাকে চাবিটা দিযে আপনি আবাব ঘুমতে যান। কাল সকালে আপনাব দবজাব সামনেই চাবিটা আপনি পাবেন। আজ বাত্রে আপনি যে আমাকে এখানে দেখলেন তা যেন অন্য কেউ আব জানতে না পাবে।"

কাবাবক্ষক চাবিটাই শুধু আনলেন না, সঙ্গে ক বে একটা আলোও নিযে এলেন। বিবাট ইশাবা কবতেই তিনি ওখান থেকে স বে গেলেন এবং বিছানায গিযে শুযে পডলেন আবাব।

ভগভস্থ বন্দীশালাব প্রবেশপথেব দবজাটা খুলে ফেললেন তিনি। সেই পথ ধ বে নিচে নামতে লাগলেন। এক শো বছব আগে থেকে এই পার্বত্য অঞ্চলেব ভূগভে কযেদীদেব আবদ্ধ ক বে বাখাব ব্যবস্থা ক'বে গিযেছিলেন বাজপুতনাব অধিপতিবা। দিনেব পব দিন কযেদীবা খাত কেটেছে। হিমশীতল পাথবেব বুক খুঁডে ভাবিষ্যতেব বন্দীদেব জন্যে তৈবি কবেছে ছোট ছোট ঘব।

ধনুকাকৃতি প্রবেশদ্বাবে দাঁডিযে বিবাট শেষবাবের মতো নক্ষত্রালোকিত

আকাশের দিকে একবাব দৃষ্টি ফেললেন। তাবপব ভেতব থেকে দরজা বন্ধ ক'বে দিলেন।. সুড়ঙ্গেব অভ্যন্তবে বোবা বধিব অন্ধকাব ক্রমশই ঘনতব হ'যে তাঁকে যেন গিলে ফেলতে লাগল। তিনি এগিযে যাচ্ছেন। হাতেব আলোটাও যেন অস্থিবভাবে শিকাবেব সন্ধানে এগিযে যেতে লাগল লাফিযে লাফিযে। পাতাব আওযাজ আব বাঁদবেব বক্‌বকানি তখনো তাঁব কানে আসছিল। সিঁড়ি দিযে প্রথম কযেক ধাপ নেমে আসবাব পবে মনে হ'ল, বাইবেব আওযাজ অনেকটা দবে স'বে গিযেছে। আবও নিচে নেমে গেলেন তিনি। সাগবগভেব মতো এখানকাব নিস্তব্ধতা ঘন, গভীব আব হিম-শীতল। যতই নিচে নামছেন তিনি নতুন মাটিব সন্ধান পাচ্ছেন না, পাথবেব বুক থেকে উঠে আসছে শুধু আদতা। সিঁড়ি দিযে নিচে নামছেন বিবাট, নৈঃশব্দ্যেব মধ্যে থেকে ভেসে উঠছে তাঁবই পদক্ষেপেব প্রতিধ্বনি। বন্দীব কক্ষটি পাঁচতলা নিচে—সবচেযে লম্বা তালগাছেব দৈর্ঘ্যেব চেযেও মাটিব তলাব গভীবতা বেশি। বিবাট এসে এইখানে উপস্থিত হ'লেন। কি যেন একটা সামনেই প'ড়ে বযেছে বুঝতে পাবলেন তিনি। হাতেব আলোটা তুলে ধবতেই শেকল থেকে ঝনঝন আওযাজ উঠল। বন্দীটি জুবুথুবু হ'যে মাটিতে শুযে ছিল। সেই দিকে ঝুঁকে দাড়িযে বিবাট জিজ্ঞাসা কবলেন, "আমাকে চিনতে পাবছো?"

"হ্যাঁ। আপনিই তো আমাব ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। যে দাযিত্ব আপনাকে দেওযা হযেছিল তা আপনি পা দিযে মাড়িযে দিলেন।"

"আমি ভাগ্যবিধাতা নই। বাজা এব ন্যাযধর্মেব আমি ভৃত্য মাত্র। সেই ন্যাযধর্ম পালনেব জন্যেই এখানে এসেছি।"

বিচাবকেব দিকে স্থিবদৃষ্টি ফেলে কযেদীটি জিজ্ঞাসা কবল, 'আমাব কাছে আব আপনি কি চান?"

অনেকক্ষণ পযন্ত চুপ ক'বে বইলেন বিবাট। তাবপর তিনি জবাব দিলেন, "আমাব বিচাবদণ্ড তোমাকে আঘাত দিযেছে জানি। কিন্তু তুমিও তোমার রূঢ় কথাব দ্বাবা আমায আঘাত করেছো অনেক। আমি জানি না আমার বিচার যথার্থ হযেছে কি না। আমাব মনে হয তোমাব কথাব মধ্যে সত্য আছে। কাবণ, বিচাবেব মাপকাঠির সঙ্গে যাঁদেব সাক্ষাৎপরিচয় নেই তাঁদেব পক্ষে সেই মাপকাঠিব উপর নির্ভর ক'বে ন্যায-অন্যায বিচার করা অনুচিত।

এই সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা অনস্বীকার্য। আমি সন্তুষ্টচিত্তে শিক্ষা গ্রহণ করতে চাই। শত শত মানুষকে আমি এই অন্ধকূপে পাঠিয়েছি। আমি কি করছি তা না জেনেই অনেকের প্রতি অবিচার করেছি। অজ্ঞতা আমার দূর হোক। ভবিষ্যতে আমার ন্যায়বিচারের মধ্যে যেন বিন্দুপরিমাণ খুঁত না থাকে। দেহান্তরের সময় যেন সব রকম পাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারি আমি।"

বন্দী কোনো কথা বলল না। নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইল। শেকলটা ন'ড়ে উঠল ব'লে শুধু একটু মৃদু আওয়াজ হ'ল। বিরাট আবার বলতে আরম্ভ করলেন, "তোমাকে যে আমি শাস্তি দিয়েছি তার স্বরূপ আমি জানতে চাই। তোমার লাঞ্ছনা আমার নিজের দেহ দিয়ে বহন করব। বন্দীজীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার সমস্ত মনপ্রাণের পরিচয় ঘটুক। এক মাসের জন্যে তোমার বদলে কয়েদীজীবন যাপন করব আমি। তোমাকে যে শাস্তি দিয়েছি তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারব। তারপর আবার আমি বিচারালয়ে ফিরে গিয়ে মকদ্দমার নতুন 'রায়' দেব। তখন আমি আমার বিচারের মাপকাঠি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল থাকব পুরোপুরিভাবে। এই সময়ের জন্যে তোমায় আমি মুক্ত ক'রে দিলুম। চাবি দিয়ে দিচ্ছি। বন্দীশালার দরজা খুলে তুমি বেরিয়ে যেতে পারবে শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাও যে, এক মাস পরে তুমি ফিরে আসবে।"

পাথরে খোদাই মূর্তির মতো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে। কয়েদীর শেকল থেকে পর্যন্ত আওয়াজ উঠল না। বিরাট তখন আকুলভাবে বলতে লাগলেন, "প্রতিহিংসার ভগবান নির্মম, কাউকে তিনি ক্ষমা করবেন না। তাঁর নামে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাও যে, এই একটা মাস তুমি নিঃশব্দে জীবনযাপন করবে। কেউ যেন কোনো কথা জানতে না পারে। চাবি দিয়ে দিচ্ছি। আমার পোশাক-পরিচ্ছদও তোমায় দিয়ে দেব। প্রহরীর ঘরের বাইরে চাবিটা রেখে যাবে। তারপর তুমি স্বাধীন। কিন্তু সর্ত রইল যে, এক মাস পরে এই চিঠিখানা তুমি রাজার কাছে পৌঁছে দেবে। তার অনুমতিক্রমে আমি মুক্তি পাব। ফিরে গিয়ে আবার আমি বিচার করতে বসব। ভগবানের নামে শপথ করো আমি যা বললাম তাই করবে?"

"শপথ করলুম।" কম্পিত স্বরে জবাব দিল সে।

কয়েদীর শেকল খুলে দিলেন বিরাট। তারপর নিজের জামাকাপড় খুলে

ফেলে তিনি বললেন, "এই নাও, এগুলো প'বে ফেলো। তোমারগুলো আমায় দাও। .মুখটা ঢেকে রাখো। জেলাব যেন তোমায় চিনতে না পাবেন। এবাব আমাব চুল আব দাড়ি সব ছেঁটে দাও—আমাকেও যেন কেউ বুঝতে না পাবে।"

বিবাট যা আদেশ দিলেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও কযেদীকে তাই কবতে হ'ল। তারপব অনেকক্ষণ পযন্ত আবাব সে নিঃশব্দে দাঁড়িযে বইল। শেষ পর্যন্ত মেঝেব ওপব ভেঙে পড়ল সে। আবেগমিশ্রিত স্বুবে বলতে লাগল, "প্রভু, আমাব লাঞ্ছনা আপনি গ্রহণ কবছেন—এ আমি সইতে পাবছি না। আমি খুনী। আমার হাতে বক্তেব দাগ। আপনাব শাস্তিবিধান ন্যাযসংগতই হযেছে।"

"বিচাবেব যৌক্তিকতা নির্দিষ্ট কবা তোমাব কিংবা আমাব পক্ষে এখন সম্ভব নয। কিন্তু অনতিবিলম্বে আমাব মনে জ্ঞানালোক প্রবেশ কববে। তোমাব প্রতিশ্রুতিমতো এবাব তুমি চ'লে যাও। এক মাস পবে বাজাব কাছে আমাব চিঠিখানা পৌঁছে দেবে। আমাব মুক্তিব আদেশ দেবেন তিনি। তাবপব থেকে, আমি আশা কবি, আমাব বিচাবেব মধ্যে বিন্দুপবিমাণ খুঁত থাকবে না। বন্দীজীবনেব অভিজ্ঞতা আমাব সহাযক হবে। এখানকাব কাজ সম্বন্ধে আমাব আব কিছু অজানা থাকবে না। এবাব তুমি এসো।"

কয়েদীটি উবু হ'যে ব'সে বন্দীশালাব মাটি চুম্বন কবল। তাবপব সে বেবিযে গেল ওখান থেকে। সূচীভেদ্য অন্ধকাবেব বুক চিবে ভেসে উঠল দবজা বন্ধ কবাব আওয়াজ। মশালের আলো গুহাভ্যন্তবে একবাব ঝিকমিক ক'বে উঠল—তাবপব বাত্রিব পক্ষপুটে তলিযে গেল কযেদখানাব পবিবেশ।

বিবাটকে কেউ চিনতে পাবল না। পবেব দিন সকালবেলা সর্বসমক্ষে বেত্রাঘাতেব আদেশ দেওযা হ'ল। তাঁব পিঠে কোনো কাপড়চোপড় ছিল না। চাবুকেব প্রথম আঘাত পিঠে লাগতেই তিনি চেঁচিযে উঠলেন। তাবপব তিনি দাঁতমুখ বন্ধ ক'বে নিঃশব্দে চাবুকেব আঘাত সহ্য কবতে লাগলেন। সত্তববাবেব পবে তাঁব আব জ্ঞান বইল না; মৃত পশুব মতো তখন তাঁকে আলগা ক'বে তুলে নেওযা হ'ল—সবিযে ফেলল ওখান থেকে।

জ্ঞান ফিবে আসবাব পবে তিনি দেখলেন যে, বন্দীশালাব ক্ষুদ্র কক্ষে শুয়ে আছেন। মনে হ'ল, পিঠের তলায জ্বলন্ত কাঠকয়লা। কিন্তু কপালটা তাঁর

ঠাণ্ডাই ছিল। বুনো ওষধির গন্ধ পেলেন তিনি। অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে বিরাট দেখতে পেলেন যে, কারারক্ষকের স্ত্রী তাঁর পাশে বসে কপালে জলপটি দিচ্ছেন। মহিলাটির দিকে ভালো করে চেয়ে দেখতে গিয়ে বুঝতে পারলেন, তাঁর চোখে করুণার অভিব্যক্তি। দৈহিক যাতনা সত্ত্বেও বিরাট উপলব্ধি করলেন যে, দয়ার মহত্ত্বের মধ্যেই মানবজীবনের লাঞ্ছনার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। মহিলাটির দিকে তাকিয়ে তিনি শুধু একটু হাসলেন। তারপর কষ্টের কথা মনে রইল না তাঁর।

পরের দিন অতি কষ্টে উঠে দাড়ালেন তিনি। বন্দী কক্ষের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে হেঁটে বেড়াতেও লাগলেন। প্রতি পদক্ষেপে এক একটা নতুন জগৎ যেন তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। তৃতীয় দিনে পিঠের ঘাগুলো শুকিয়ে এল খানিকটা। দেহে ও মনে শক্তিও ফিরে আসতে লাগল। বসে থাকেন নিঃশব্দে। পাহাড়ের গা থেকে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে—সেই দিকে চেয়ে চেয়ে সময় গোনেন তিনি। বন্দী-কক্ষের নিরেট নিস্তব্ধতা খণ্ডাকারে রূপান্তরিত হয়ে যায়—খণ্ডগুলিকে জোড়া দিলে তৈরি হয় রাত্রি ও দিন। হাজার হাজার দিনের সমন্বয়ে যেমন মানবজীবন গঠিত হয় এও ঠিক তেমনি।

একা থাকেন তিনি। নিঃসঙ্গতা নি ।ড। অন্তর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ঘনান্ধকার। তবুও কত রকমের অতীত স্মৃতি স্মরণ করেন। ছোট ছোট ঝরনার মতো স্মৃতিগুলি মনের বাঁকে গড়িয়ে ওঠে। নিজের জীবনটা যেন প্রতিবিম্বের মতো ভাসতে থাকে ঝরনার শান্ত জলে। অতীতের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতাগুলো এখন আর বিক্ষিপ্ত নয়, সব একাঙ্গীভূত হয়ে যায়। আগে কখনো এমন পরিষ্কারভাবে অন্তর্জগৎটাকে দেখতে পাননি তিনি। দিন যত পার হ'য়ে যাচ্ছে বিরাটের দৃষ্টি স্বচ্ছ হচ্ছে তত বেশি। বন্দীশালার ঘনান্ধকারে সত্যের রূপ ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠতে লাগল। প্রত্যক্ষ জগতের সব কিছুই যেন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করছে তার অন্তশ্চক্ষুর সামনে।

বিরাটের দৃষ্টি দিনে দিনে পরিষ্কার হয়ে আসে এর বস্তুগুলো আকার নিয়ে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতে থাকে তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে। ঠিক তেমনিভাবে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখেও বস্তুর আকার আর অস্পষ্ট থাকে না। কয়েদী যেমন কারাকক্ষের পাথরের দেয়ালে হাত বুলিয়ে তার এবড়ো-খেবড়ো

অসমান অংশটা অনুভব করেন, ধ্যানের শান্ত আনন্দও তেমনি পরিবর্তনশীল চিন্তাগুলোর ওপর লঘু স্পর্শ বুলিয়ে যায়। এতদিন তিনি নিজেকে নিজের আমিত্ব থেকে গুটিয়ে নিয়ে যে অন্ধকার নিঃসঙ্গতার মধ্যে বাস ক'রে এসেছেন সেখানে নিজের অন্তঃপ্রকৃতির অন্তরঙ্গতা সম্বন্ধে তাঁর কোনো চেতনা ছিল না, তাই দিনে দিনে তিনি সচেতন হ'য়ে উঠেছিলেন বহু বিচিত্র ঐশী সত্তার শক্তিমত্তা সম্বন্ধে। তখন তিনি জীবনের মধ্যে পেয়েছিলেন মৃত্যুর সন্ধান মৃত্যুর মধ্যে সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন জীবনের। কল্পনায় তিনি আপনার মধ্যে যে নিজস্ব জগৎ গ'ড়ে নিয়েছিলেন, নিজের বাসনার বন্ধন হ'তে মুক্ত হ'য়ে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে তার মধ্যে বিচরণ করা হয়েছিল তাঁর পক্ষে সম্ভব ও সহজসাধ্য। বর্তমান বর্তমানের যত কিছু উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সব নিঃশেষে নিমজ্জিত হ'য়ে যায় মুক্তির উদার আনন্দের মাঝখানে। তার মনে হয়, তিনি যেন ক্রমে ডুবে যাচ্ছেন গভীর হ'তে গভীরতর অন্ধকারের অতলে যেন তিনি নেমে চলেছেন পৃথিবীর তমসাচ্ছন্ন শিলাময় তলদেশে। অথচ তারই মধ্যে তিনি অনুভব করছেন সদ্যোজাত নতুন এক জীবনের প্রাণস্পন্দন। তিনি যেন সদ্যোজাত এক কীট—মাটির মধ্যে অন্ধকারে কেটে চলেছেন সুড়ঙ্গপথ, অথবা অঙ্কুর হ'তে উদ্গত তিনি যেন ছোট্ট একটি চারাগাছ—সবল কাণ্ডের ওপর ভর ক'রে ঊর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাচ্ছেন, কিংবা নিজের সত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অচেতন তিনি যেন ক্ষুদ্র শৈল মগ্ন হ'য়ে রয়েছেন আপন শান্ত ও স্নিগ্ধ আনন্দময় অস্তিত্বের মধ্যে।

ধ্যান-সমাধিস্থ বিরাট আঠারোটি রাত্রি ধ'রে অপার্থিব সে রহস্যের রসাস্বাদন করেছেন। সে অবস্থায় তার না ছিল ইচ্ছার কোনো দ্যোতনা, না ছিল জীবনের কোনো তাড়না। যে ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেছিলেন প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে, তাঁর জীবনে তা আবির্ভূত হয়েছে আশীর্বাদরূপে। তিনি এখন বুঝতে শুরু করেছেন যে, জ্ঞানের নিত্য-সচেতন সত্তার সম্মুখে পাপ এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বপ্নদৃষ্ট ছায়ামূর্তি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ঊনবিংশতিতম রাত্রিতে সহসা তিনি সমাধি হ'তে জেগে উঠলেন, তাঁর মনে হ'ল, পার্থিব কি যেন একটা চিন্তা তপ্ত লৌহশলাকার মতো তাকে বিদ্ধ করছে। ভয়ে তাঁর সারা দেহ শিউরে উঠল, তাঁর আঙুলগুলো থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল বায়ুবিকম্পিত বৃক্ষপত্রের মতো। তার আশঙ্কা, কয়েদী হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা করবে,

হয়তো ভুলে যাবে তার কথা, হয়তো বা তাঁকে কারারুদ্ধ অবস্থায় ফেলে রেখে চ'লে যাবে হাজার হাজার বছরের জন্য—যতদিন না তাঁর হাড় থেকে মাংস খ'সে খ'সে পড়ে, দীর্ঘ নীরবতার ফলে যতদিন না তাঁর নির্বাক রসনা সম্পূর্ণরূপে অসাড় হ'য়ে যায়। বাঁচবার জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষা তার অন্তরে জেগে উঠল ক্ষুধিত শার্দূলের মতো, যে বহিরাবরণে তিনি এতদিন নিজেকে ঢেকে রেখেছিলেন, ক্ষুধার্ত শার্দূল তাকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিল। কালপ্রবাহ আবার বইতে আরম্ভ করল তাঁর আত্মার মধ্যে, সেই প্রবাহমুখে ভেসে এল আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং পার্থিব জীবনের আর সব অশান্তি ও অভিশাপ। যে শাশ্বত ও সনাতন ঐশী সত্তা বহু বিচিত্র রূপে নিজের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল, এখন আর তার ধ্যানে মন নিবিষ্ট হ'তে চায় না। আত্মচিন্তা এখন তাঁকে পেয়ে বসল সম্পূর্ণরূপে। তাঁর দৃষ্টি দিনের আলোর জন্য আর্ত ও আতুর হ'য়ে উঠেছে, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এখন আর পাষাণের কঠিন স্পর্শ কামনা করে না, তারা চায় উদার বিস্তৃতি, তারা চায় ছুটে যেতে, লাফিয়ে পড়তে। স্ত্রী এবং পুত্রের, গৃহ এবং বিষয়ের চিন্তায় তাঁর মন বিভোর হ'য়ে উঠেছে, পার্থিব প্রলোভনের যত কিছু সামগ্রী সব তিনি সম্ভোগ করতে চান দেহ-মন ও বুদ্ধি দিয়ে। সম্ভোগের বাসনায় শোণিতের ধারা তার ধমনীতে উদ্দাম ও উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে।

কাল এতদিন তাঁর পায়ের তলায় প্রসারিত ছিল বদ্ধ জলাশয়ের নিথর ও নিস্তরঙ্গ বারিরাশির মতো, তার বুকে বিম্বিত হ'ত চলমান ঘটনার প্রতিচ্ছবিগুলি। এখন সে বদ্ধ জলা বিস্তীর্ণ জলরাশিরূপে তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে জেগে উঠেছে এবং তার জলে সঞ্চারিত হয়েছে খরস্রোতা তটিনীর গতিবেগ আর সেই স্রোতের সঙ্গে চলেছে তাঁর বিরামহীন সংগ্রাম। তিনি কায়মনোবাক্যে কামনা করেন, এই প্রবাহ তাঁকে প্লাবিত করুক, পরাভূত করুক, উন্মূলিত তরুর মতো তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যাক সেইখানে, মুক্তি যেখানে তাঁর প্রতীক্ষায় কোল পেতে ব'সে আছে। কিন্তু প্রবাহ তার প্রতিকূল এবং সেই প্রতিকূল স্রোতের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ করতে করতে তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন। ছাদ থেকে যে জল বিন্দু বিন্দু ক'রে চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে, তাঁর মনে হয়—প্রতি দুইটি বিন্দুপাতের অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদ যেন অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিলম্বিত হয়েছে। এই অবস্থায় বিবরের মধ্যে অসহায়ভাবে বদ্ধ থাকা তো সম্ভব নয়!

সেই পাহাড়ীয়া হয়তো তাঁর কথা ভুলে যাবে, তার ফলে হয়তো তাঁকে তিল তিল ক'বে প'চে মবতে হবে এই জীবন্ত সমাধিব মহামৌনতাব মধ্যে—এই দুশ্চিন্তা তাঁকে উদভ্রান্ত ক'বে তুলল এবং তিনি ইতস্তত পাযচাবি ক রে বেড়াতে লাগলেন পিঞ্জবাবদ্ধ পশুব মতো। নিঃসীম নীববতাব মাঝখানে শ্বাস যেন তাঁব রুদ্ধ হ'যে আসছে। তাবস্ববে তিনি অভিযোগ ও অভিশাপ বর্ষণ কবেন চাবিদিকেব প্রাচীব-পবিবেষ্টনীব বিরুদ্ধে, দেবতাদেব ও বাজাব বিরুদ্ধেও তিনি উচ্চাবণ কবেন অভিশাপ-বাণী। বক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত আঙল দিযে তিনি আঘাত কবেন অনমনীয পাষাণ-প্রাচীবেব গাযে, রুদ্ধ দ্বাবেব গাযে মাথা ঠুকতে ঠুকতে তিনি মূর্ছিত হ যে লুটিযে পড়েন মাটিতে। জ্ঞান ফিবে পাবাব সঙ্গে সঙ্গে আবাব তিনি সোজা হ'যে দাঁড়ান, আবাব শুরু হয তাব অন্তহীন পবিক্রমা।

তাঁব বন্দীজীবনেব অষ্টাদশ দিন থেকে শুরু ক বে পূর্ণিমাব বাত পর্যন্ত এই ক'টা দিন বিবাটেব কেটেছে বিভীষিকাময দুঃস্বপ্নেব ঘোবে। উদ্বেগে ও উৎকণ্ঠায পানে ও আহাবে তাব প্রবৃত্তি লোপ পেযেছে, লোপ পেযেছে তাঁব চিন্তা কববাব সামর্থ্য অবধি। নিববধি ও নিত্য-প্রবহমান কালসমুদ্রেব বুকে কখন যে একটি দিন শেষ হ'ল এবং কখনই বা শুরু হ ল আব একটি দিনেব সূত্রপাত সেই সীমান্তবেখাটি চিহ্নিত কববাব জন্য তাব ওষ্ঠ নিঃশব্দে গুনে চলেছে পতনশীল জলবিন্দুগুলিব স খ্যা। এবই মধ্যে কখন যে তাঁব স্পন্দিত কানপাটিব চুলগুলো পেকে সাদা হ যে গেছে তিনি তা টেবও পাননি।

ত্রযোদশ দিনে বাইবে কিসেব যেন একটা কোলাহল উঠল এবং তাব পবেই আবাব সব নিস্তব্ধ। একটু পবে সিঁড়িব ওপব শানা গেল কাব যেন পাযেব শব্দ। হঠাৎ দু-পাল্লা দবজা খুলে যাবাব সঙ্গে সঙ্গে ঘবেব মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল একঝলক আলো। অন্ধকাবে আবৃত হ যে বাজা এসে সম্মুখে দাঁড়ালেন এব নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িযে ধ বে তাকে স বধনা জানিযে বললেন, "তোমাব কীর্তিকথা আমি শুনেছি। আমাদেব পূবপুরুষদেব যত কিছু কীর্তিকাহিনী পুবাণে লেখা অ ছে, তোমাব কীর্তি সেসবেব চেযে মহত্তব। তোমার এ কীর্তি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কেব মতো জেগে থাকবে আমাদেব মর-জীবনেব আকাশ দিগন্তে। তুমি বেবিযে এসো এই অন্ধকাব কাবাগাব থেকে, ভগবানেব দিব্যদ্যুতিতে মণ্ডিত হ যে দাঁড়াও সকলের সম্মুখে। তোমাব মতো সাধুসজ্জনেব সন্দর্শনে জনসাধাবণ ধন্য হোক।"

অনভ্যস্ত আলোকপাতে বিরাটের চোখ ব্যথিত ও পীড়িত হ'য়ে উঠেছিল, দু'হাত দিয়ে চোখ ঢেকে কম্পিতপদে তিনি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন মাতালের মতো, তাঁর সাহায্যের জন্য ছুটে এল ভৃত্যেরা। দরজার দিকে যেতে যেতে তিনি বললেন, "রাজন্, আপনি আমাকে সাবধান করলেন। কেউ যখন কারও সম্বন্ধে রায় দেয়, তখন তার ওপর সে যে অত্যন্ত অবিচার করে সে কথা এতদিনে আমি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি। এই অন্ধকার পাতালপুরীতে আজও যারা প'চে মরছে তাদের দণ্ডদান করেছি আমি। তারা যে কি দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করছে সে কথা অনুভব করলাম এই সর্বপ্রথম। প্রতিশোধ-মূলক বিধি-বিধান মাত্রই যে অন্যায় ও অবিচার তা আমি আজ বুঝতে পারছি। বন্দীদের মুক্তিদান করুন এবং আপনার লোকজনকে বলুন এখান থেকে চ'লে যেতে। এদের জয়ধ্বনি শুনে সারা চিত্ত আমার দুঃসহ লজ্জায় সংকুচিত হচ্ছে।"

রাজা ইঙ্গিত করবামাত্র ভৃত্যেরা ভিড় ভেঙে দিল। কোলাহল ক্ষান্ত হবার পর রাজা বললেন, "এখন পর্যন্ত তোমার বিচারকের আসন ছিল আমার প্রাসাদে প্রবেশ করবার সোপানশ্রেণীর শীর্ষদেশে। কিন্তু আজ নিগ্রহ ও নিপীড়ন ভোগের ভেতর দিয়ে তুমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলে, এর আগে কোনো বিচারকের ভাগ্যে সে জ্ঞানলাভের সুযোগ ঘ'টে ওঠেনি। এখন থেকে তাই তুমি বসবে আমার সিংহাসনের পাশে—যাতে ক'রে তোমার কথা আমি সহজে শুনতে পাই, তোমার বিচার দেখে আমি জ্ঞানলাভ করতে পারি।"

রাজার জানু স্পর্শ ক'রে বিরাট আনুগত্য নিবেদন করলেন, বললেন, "আমাকে বিচারকের কাজ হ'তে অব্যাহতি দিন। আজ যখন আমি বুঝতে পারছি যে, অন্যের বিচার করবার অধিকার কারও নেই, তখন সুবিচার করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না। দণ্ডদানের দায়িত্ব ভগবানের, মানুষের নয়। তাই নিয়তির কাজে যে কেউ হস্তক্ষেপ করবে, সেই হবে অপরাধী। আমার বাকি জীবনটুকু আমি পাপের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত হ'য়ে কাটাতে চাই।"

রাজা বললেন, "তথাস্তু। তুমি আমার প্রধান বিচারক না হ'য়ে হবে আমার প্রধান পরামর্শদাতা এবং তোমার কাজ হবে সংগ্রাম ও শান্তির সমস্যা

সমাধান কবা। প্রজাদেব ওপব কবধার্যেব ব্যাপাবে আমাকে সৎ পবামর্শ দান কববে তুমি। তোমাব জ্ঞানবুদ্ধিব দ্বাবা আমাব প্রতিটি প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা পরিচালিত হোক।”

বিবাট পুনবায় নৃপতিব জানু চুম্বন কবলেন। বললেন, “রাজন্! দযা ক’বে কোনো ক্ষমতা আমাব হাতে অর্পণ কববেন না, কারণ ক্ষমতাই মানুষকে কর্মেব প্রতি আকৃষ্ট কবে। কোন্ কাজ ন্যায আব কোন্ কাজই বা অন্যায তা বিচাব কববে কে এবং বিধিলিপি খণ্ডন কববে এমন সাধ্যই বা কাব? যদি আপনাকে যুদ্ধোদ্যমেব পবামর্শ দিই, তাহ’লে নিজেব হাতে আমি মৃত্যুব বীজ বপন কবব। আমি যে-কোনো কথাই বলি না কেন, তা পবিণতি লাভ কববে কাজে এবং আমাব প্রতিটি কাজেব মধ্যে যে সম্ভাব্য পবিণতি নিহিত আছে তাব স্বরূপ প্রত্যক্ষ কববাব মতো ভবিষ্যৎদৃষ্টি আমাব নেই। সকল কাযেব যাব বিবতি ঘটেছে, সকল সংসর্গ হ’তে জীবন যাব বিচ্ছিন্ন, সৎ ও ন্যাযপবাযণ হ’তে পাবে কেবলমাত্র সেই। এই নির্জন কাবাবাসে নিজের সঙ্গে ছাড়া কথা কইবাব আব অন্য কোনো লোক ছিল না। এইখানে থেকে জ্ঞানেব যত কাছাকাছি আমি এগিযে গেছি, তেমন আব কখনো যাইনি, এইখানে বাস ক’বে যতটুকু নিষ্পাপ জীবন আমি যাপন কবেছি, এর আগে তেমন আব কক্ষনো কবিনি। আমাকে দযা ক’বে আমাব কুটিবে ব’সে শান্তিময জীবন যাপন কবতে দিন। দেবতাদেব কাছে নিষ্পাপ জীবন প্রার্থনা কবা ছাড়া সেখানে আমাব আব অন্য কোনো কাজ থাকবে না।”

বাজা বললেন, “তোমাব সেবা ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হ’তে আমি বেদনা বোধ কবি। কিন্তু ঋষিকল্প ব্যক্তিব সঙ্গে বিতর্কে নামবাব, কিংবা সাধুসজ্জন ব্যক্তিব ইচ্ছাকে প্রভাবিত কববাব মতো দুঃসাহস আমাব নেই, তোমাব যেমন অভিরুচি তেমনিভাবেই জীবনযাপন কবো। আমাব বাজ্য-সীমার মধ্যে অন্তত একজন নিষ্পাপ ব্যক্তি বাস কবেন এই হবে আমাব গর্বেব বস্তু।”

কাবাগাবেব ফটকেব কাছাকাছি এসে দু’জনে ছাড়াছাড়ি হ’ল। দিবালোক-দীপ্ত মুক্ত আকাশ সৌবভে মদিব হ’যে উঠেছে। বিবাট একলা বাড়ির পথে চলেছেন তাবই ঘ্রাণ নিতে নিতে। দাযিত্বেব ভারমুক্ত হ’যে তাঁর মনে হচ্ছে, তাঁর বুক থেকে যেন নেমে গেছে একটা দুর্বহ পাষাণভার। চিত্তের এমন

লঘুতা এর আগে তিনি আর কখনও অনুভব করেননি। পিছনে শোনা গেল পাদুকাহীন পায়ের মৃদু শব্দ। পিছন ফিরে চাইতেই তিনি দেখেন, যে-লোকটির দণ্ড তিনি নিজে ঘাড পেতে নিয়েছিলেন সে আসছে তার পিছু পিছু। পার্বত্য সেই লোকটা প্রাক্তন বিচারকের চরণচিহ্ন চুম্বন করল এবং তারপর সকৃতজ্ঞ অভিবাদন জানিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। বিরাটের ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে উঠল মৃদু হাসির রেখা, মৃত ভাইয়ের দৃষ্টিহীন চেয়ে-থাকা দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে সেই যে তাঁর মুখের হাসি মুখে মিলিয়ে যায়, তারপর তিনি হাসলেন এই সর্বপ্রথম। প্রসন্ন মন নিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন নিজের গৃহে।

বাড়ি ফিরে আসার পর কিছুদিন বিরাটের কাটল বেশ আনন্দেই। ঘুম ভাঙার পর চোখ খুলতেই যখন তিনি দেখেন কারাকক্ষের সেই অন্ধকার আর নেই, তার পরিবর্তে ভোরের আলোয় তার সারা ঘর ভ'রে উঠেছে, যখন তিনি দেখেন গগন-ভুবন জুড়ে চলেছে বিচিত্র রঙের খেলা, সমীরণ সৌরভে মন্থর হ'য়ে উঠেছে, ভোরের বাতাসে বেজে উঠেছে প্রভাতী সুর, সকৃতজ্ঞ অন্তরে তিনি তখন ধন্যবাদ জানান করুণাময় ভগবানের উদ্দেশে। স্বাধীনভাবে তিনি যথেচ্ছ বিচরণ করবেন, স্বচ্ছন্দভাবে গ্রহণ করবেন শ্বাসবায়ু—এই আনন্দে তার মন-প্রাণ বিভোর হ'য়ে ওঠে, তাই প্রতিটি প্রভাতকে তিনি অভিনন্দিত ক'রে নেন বিধাতার দুর্লভ আশীর্বাদরূপে। নিবিড় মমতার সঙ্গে তিনি নিজের গায়ে হাত বুলোন, গভীর অনুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করেন পত্নীর দেহের সুকোমল স্পর্শ, পুত্রদের বলিষ্ঠ দেহের কঠিন স্পর্শ তিনি অনুভব করেন এবং তাদের সকলের ভেতর তিনি প্রত্যক্ষ করেন বিধাতার বিচিত্র বিকাশ। নিজের জীবনের পরিধি পার হ'য়ে তিনি কখনও কোনো অপরিচিত ব্যক্তির নিয়তি নিয়ে খেলা করেননি, যাদের মধ্যে অদৃশ্য ত্রৈশী সত্তার বহু বিচিত্র বিকাশ, তাদের কারও প্রতি তিনি কোনো দিন শত্রুতাসাধন করেননি এই আত্ম-তৃপ্তিতে বিভোর হ'য়ে তাঁর আত্মা অ ন * * লঘুপক্ষ বিস্তার করে। জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ক'রে এবং নানাভাবে ভগবানের ভজনা ক'রে তাঁর সকাল থেকে সন্ধে অবধি কেটে যায়। ধ্যানমগ্ন মৌনতা, অন্তরের অন্তস্তল অবধি অবগাহন ক'রে আত্মানুসন্ধান, দীনদরিদ্রের সেবা এবং ভগবৎ-চরণে আত্ম-নিবেদন তাঁর প্রাণে এনে দেয় পরম শান্তি ও চরম সান্ত্বনা। দাসদাসীদের প্রতি তাঁর বচন ও আচরণ করুণায় দ্রব হ'য়ে আসে এবং পরিবার-পরিজনের

চিত্ত ভ'বে ওঠে তাঁব প্রতি অভূতপূর্ব অনুরক্তিতে। দীনের প্রতি দয়াপ্রদর্শন এবং দুঃখীজনকে সান্ত্বনাদান—এই তাব প্রতিদিনেব নিত্যকর্ম। জনসাধাবণেব কল্যাণ-কামনা তাঁব নিশীথ-শিয়বে নিত্য জাগরূক। লোকেব চোখে তিনি এখন উদ্যত দণ্ডধাবী নন, কল্যাণপ্রদ সৎ পবামর্শেব তিনি নিত্য-উন্মুক্ত উৎসস্থল। সেখানে এসে কেবলমাত্র প্রতিবেশীবাই যে অঞ্জলি পেতে পানীয় ভিক্ষা কবে তা নয়, তিনি এখন আব যদিও দেশেব প্রধান বিচাবক নন, তবু দেশ-দেশান্তব থেকে লোক ছুটে আসে তাব সন্ধানে, নিজেদেব বিবোধ-মীমাংসাব ভাব অর্পণ কবে তাঁর হাতে এবং বিনা দ্বিধায় মেনে নেয় তাঁব সিদ্ধান্ত। বিবাট বুঝতে পাবেন এবং পেবে পুলকিত হন যে, আদেশেব চেয়ে উপদেশ শ্রেয়, বিচাবকেব আসন অপেক্ষা শ্রেয় যোগীব ধ্যানাসন। কাবও ওপব কোনোরূপ প্রভুত্ব বিস্তার না ক'বেও যে তিনি বহুজনেব বিরোধ-বিখণ্ডিত জীবনেব মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কবতে পাবেন—এই চিন্তা তাব জীবনকে ক'রে তোলে কলুষহীন। মধ্যাহ্ন-সূর্যেব আনন্দ-আলোকে তাঁব জীবনেব আকাশ আভা ও প্রভাময়।

এইভাবে তিনটি বছব কেটে গেল এবং তাবপব চ'লে গেল আবও তিন বছব, তবু মনে হয়, এই কাল-পবিমাণ যেন একটিমাত্র আলোকোজ্জ্বল দিন অপেক্ষা দীর্ঘ নয়। বিবাটেব চিত্ত দিনে দিনে স্নিগ্ধতব হ'য়ে আসে প্রশান্তিতে ও প্রসন্নতায়। নিষ্পত্তিব জন্য কোনো নালিশ তাব সম্মুখে আনীত হ'লে অবাক হ'যে তিনি ভাবেন, রূপে-গন্ধে বিচিত্র জীবনেব বিপুল বিস্তাব যেখানে প্রসাবিত বযেছে, সেখানে তুচ্ছ মালিকানা-স্বত্ব নিয়ে এত ঈর্ষা-দ্বেষ, এত বিবাদ-বিবোধ ও সংঘাত-সংঘর্ষ কেন। কাবও সৌভাগ্যে তিনি ঈর্ষান্বিত নন, তাঁব সম্বন্ধে কেউ ঈর্ষা পোষণ কবে না। তাব গৃহ জীবন-সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপেব মতো দাঁড়িয়ে আছে, কামনা-বাসনার খবস্রোতা নদী তাঁব গাত্র স্পর্শ ক'বে প্রবাহিত হয় না, তাঁব পদতলে এসে প্রহত হয না ভাবাবেগেব উত্তাল তবঙ্গ।

তাঁব শান্তিময় জীবনেব ষষ্ঠ বর্ষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় বিরাট নিজের শয্যায় শুযে শুনতে পেলেন, বাইরে কাবা যেন কোলাহল কবছে—কে যেন কাকে প্রহার কবছে। বিছানা ছেড়ে বেবিয়ে এসে তিনি দেখেন, বাড়ির একজন চাকরের ওপব চলেছে তাঁর পুত্রদেব তর্জন-গর্জন। তারা বাধ্য করেছে

লোকটাকে হাঁটু গেড়ে বসতে এবং তাকে জর্জরিত ও রক্তাক্ত ক'রে তুলেছে চামড়ার চাবুকের অজস্র প্রহারে। প্রহার-পীড়িত লোকটা বিরাটের মুখের দিকে চাইল এবং তাঁর চোখে চোখ পড়বামাত্র বিরাটের মনে প'ড়ে গেল তাঁর সেই ভাইয়ের চোখের দৃষ্টিহীন চাউনির কথা—যাকে তিনি নিহত করেছিলেন নিজের হাতে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তিনি তাঁর ছেলের চাবুক উদ্যত হাতটা চেপে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপারটা কি?

বহু কণ্ঠের বিমিশ্র কোলাহল থেকে তিনি এইটুকুই মাত্র সার সংগ্রহ করতে পারলেন যে পাহাড়ী ঝরনা থেকে জল ব'য়ে আনা চাকরটার নিত্যকর্ম, কিন্তু রোদের প্রচণ্ড উত্তাপ এবং তার ফলে ক্লান্তির অজুহাত দেখিয়ে জল আনতে সে প্রায়ই দেরি করে। এই কুঁড়েমির জন্য প্রতিবারই তাকে সাজা দেওয়া হয়েছে এবং গতকাল তাকে অস্বাভাবিকরূপে কঠোর দণ্ড দেবার পর সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। টের পেয়ে বিরাটের ছেলেরা ঘোড়ায় চেপে তার পিছনে ধাওয়া করে এবং নদী যখন সে পার হ'য়ে গেছে তখন তাকে ধরতে সক্ষম হয়। একটা ঘোড়ার জিনের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ক'ষে তাকে বাঁধা হয় এবং সেই অবস্থায় ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয় কতকটা ছুটিয়ে, কিছুটা বা হিঁচড়ে। দোষী চাকরটার নিজের ও অন্যান্য চাকরদের কল্যাণের কথা ভেবে এখন তাকে আদর্শ দণ্ডদান করা হচ্ছে এবং বাড়ির আর সব ভৃত্যরা সে নির্মম শাসন ঠায় দাঁড়িয়ে দেখছে আর সভয়ে কাঁপছে। পিতা এসে পড়ার ফলে যে দৃশ্যের অভিনয় ব্যাহত হয় তার বিশদ ব্যাখ্যা এই। বিরাট দৃষ্টি নত ক'রে ক্রীতদাসের দিকে চাইলেন। ঘাতকের শেষ খড়্গাঘাত নেমে আসবার পূর্বমুহূর্তে বলির পশুর চোখে যে দৃষ্টি ফুটে ওঠে, ভৃত্যের চোখে জেগে উঠেছে সেই ভয়ার্ত দৃষ্টি। সে দৃষ্টি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল সেই বিভীষিকার কথা, যার ভেতরে একদা তাকে দিনযাপন করতে হয়েছে।

বিরাট বললেন, "বাঁধন খুলে দাও লোকটার, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে গেছে।"

ক্রীতদাস প্রভুর পদধূলি চুম্বন করল। পুত্ররা পিতার কাছ থেকে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বিদায় নিল এই প্রথম। বিরাট নিজের ঘরে ফিরে গেলেন এবং নিজের হাত ও কপাল জল দিয়ে ধুতে লাগলেন কতকটা

যন্ত্রচালিতের মতো। তাঁর চেতনা ফিরে এল ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ পেয়ে এবং শৈল-কারাগার ছেড়ে আসার পর তিনি এই সর্বপ্রথম বুঝতে পারলেন যে, বিচারক সেজে অন্যের ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করেছেন। তাঁর চোখ থেকে ঘুম উবে গেল এই ছ' বছরের মধ্যে সর্বপ্রথম। অন্ধকারে তিনি যখন জেগে বিছানায় শুয়ে থাকেন, তাঁর মনশ্চক্ষুর সামনে জেগে ওঠে ক্রীতদাসের সেই ভয়ার্ত দৃষ্টি, অথবা সে দৃষ্টি কি তাঁর নিহত ভাইয়ের? তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে পুত্রদের রোষ-রক্তিম দৃষ্টি। তিনি বারবার নিজেকে প্রশ্ন করেন: ছেলেরা চাকরটার ওপর কি অবিচার করেনি? তুচ্ছ ক্রটিবিচ্যুতির জন্য তাঁর অঙ্গনের ধুলো শোণিতসিক্ত হয়েছে, একটা জীবন্ত দেহ বেত্রাহত হয়েছে সামান্য ভুলভ্রান্তির জন্য। একদা যে বেত্রাঘাত বৃশ্চিকের মতো তাঁর নিজের পিঠে দংশন করেছে, ছেলেদের এই অন্যায় আচরণ তার চেয়েও গভীরতর ক্ষত তাঁর দেহে এঁকে দিল। এ কথা সত্য যে, সে আঘাত কোনো অভিজাত-বংশীয় ব্যক্তির গায়ে পড়েনি, পড়েছে এমন একজন লোকের গায়ে, রাজ্যের আইন অনুযায়ী যার দেহ জন্ম হ'তেই প্রভুর মালিকানা সম্পত্তি। কিন্তু ঐশী সত্তা বহু বৈচিত্র্য রূপে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত, তাঁর চোখে রাজ্যের বিধান কি বিধিসম্মত? যে আইনবলে একটা লোকের দেহ সম্পূর্ণরূপে অন্যের অধিকারে চ'লে যাবার যোগ্য ব'লে বিবেচিত, বিধাতার দৃষ্টিতে সে বিধান কি ন্যায় ও নীতিসংগত এবং তথাকথিত প্রভু যদি ক্রীতদাসকে আহত অথবা নিহত করে, ঈশ্বরের বিচারে সে কি নির্দোষ বিবেচিত হবে?

এরূপ ক্ষেত্রে শাস্ত্র কি বিধান দেয় তা দেখবার জন্য বিরাট বিছানায় উঠে ব'সে প্রদীপ জ্বাললেন। তিনি দেখলেন, বিভিন্ন শ্রেণী ও সংস্থার মধ্যে স্তর-বিন্যাস শাস্ত্রে স্বীকৃত রয়েছে সত্য, কিন্তু তাই ব'লে বিধাতা যে বিচিত্র রূপে আপনাকে বিশ্বের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন তারা কেউ কারও প্রেমের দাবি পূর্ণ করবে না এমন নির্দেশ ধর্মগ্রন্থে কোথাও লেখা নেই। সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা যত বেড়ে চলে, জানবার কৌতূহল তাঁর বৃদ্ধি পায় সেই অনুপাতে। এই সময়ে হঠাৎ প্রদীপের আলোটা একবার দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠেই আবার নিবে গেল।

তাঁর এবং দেয়ালের মাঝখানে অন্ধকারের কৃষ্ণ যবনিকা নেমে আসবার

সঙ্গে সঙ্গে বিরাটকে পেয়ে বসল এক বিচিত্র অনুভূতি : তাঁব মনে হ'ল, অন্ধকাবে যে বস্তুটিকে তাঁব দৃষ্টি খুঁজে বেড়াচ্ছে তা যেন তাঁর ঘবেব দেয়াল নয়, সেটা যেন তাঁব সেই কাবাকক্ষেব দেয়াল - যেখানে ব'সে তাঁব এই তত্ত্ব উপলব্ধি হয যে, স্বাধীনতা মানুষেব সবচেযে মূল্যবান সম্পদ এবং অপবকে কাবারুদ্ধ কববাব কোনো অধিকাব কাবও নেই—সে কাবাদণ্ড যাবজ্জীবনেব জন্যই হোক অথবা এক বৎসবেব জন্যই হোক। তবু বিবাট তাব নিজের ইচ্ছার অদৃশ্য দেযাল দিয়ে ঘেবা কাবাগাবেব মধ্যে ক্রীতদাসকে বন্দী করেছেন। নিজেব বিচাববুদ্ধিব বন্ধনশৃঙ্খলে ভৃত্যকে তিনি এমন অসহাযভাবে বেঁধে বেখেছেন যে, একটি পা বাড়াবাব স্বাধীনতাও তাব নেই। ব'সে ব'সে যতই তিনি চিন্তা কবেন, তাঁব মানসিক পবিমণ্ডল ততই পবিচ্ছন্ন হ'যে ওঠে এবং তাঁব চিন্তাব পরিধি প্রসাবিত হয ঠিক সেই অনুপাতে। পবিশেষে অদৃশ্য কোনো এক তুঙ্গ শৃঙ্গ হ'তে আলোকবশ্মি বিচ্ছুবিত হ'যে এসে তাঁব মনেব ওপব পড়ল। তিনি বুঝতে পাবলেন, এ ব্যাপাবে দোষেব দাযিত্ব তিনি এড়াতে পারেন না, কাবণ লোকজনকে তিনি জোব ক'বে নিজেব ইচ্ছাব অধীনে এনেছেন এবং ক্রীতদাসে পবিণত কবেছেন এমন এক আইনবলে যা মানুষের বচিত ক্ষণভঙ্গুব ব্যবস্থা মাত্র, বিধাতাব চিবন্তন বিধান নয। তিনি নতজানু হ'য়ে প্রার্থনায় নিযুক্ত হলেন

"প্রভু! বহু রূপে তোমাব প্রকাশ, তাই নব নব রূপে তোমাব দূতকে তুমি পাঠাও পাপ থেকে আমাকে টেনে এনে তোমাব ইচ্ছাব অদৃশ্য পথে স্থাপন করতে যাতে সে পথ অনুসরণ ক'বে আমি তোমাব আবও নিকটতব সান্নিধ্যে আসতে পাবি। সে অসীম করুণাব জন্য তোমায শতসহস্র ধন্যবাদ। যে ভাই আমাব ম'বেও মবেনি, সে সর্বত্র আমাব কাছে কাছে আছে. আমাব দৃষ্টি দিয়ে সে দেখে এবং তাব যন্ত্রণা আমি নিজেব দেহ দিয়ে অনুভব করি। আমার সেই মবণ-না-জানা মৃত ভ্রাতাব অভিযোগ-ভবা দৃষ্টি দিয়ে যাতে আমি তোমাব প্রেবিত দূতদেব চিনে নিতে পাবি, নিজেব জীবনকে পবিত্র ও নিষ্পাপ করতে পাবি তাব যোগ্যতা আমাকে দান কবো প্রভু!"

বিবাটেব মুখে আবার প্রসন্নতা ফিবে এল। মোহমুক্ত নির্মল দৃষ্টি নিয়ে তিনি ঘব থেকে বেবিয়ে গেলেন বাইরে—যেখানে তারকারা তাঁর উদ্দেশে শুভ্র আলোকের সংবর্ধনা পাঠাচ্ছে এবং প্রাক্-প্রভাতকালের স্নিগ্ধ সমীর তাঁর জন্য

বহন ক'বে আনছে বিশুদ্ধ শ্বাসবায়ু। উদ্যান পার হ'য়ে তিনি উপনীত হলেন নদীতীরে। পুব আকাশে সূর্য উদিত হ'লে তিনি নদীতে নামলেন এবং প্রাতঃ-স্নান সেবে তিনি আবাব এসে মিলিত হলেন বাড়িব লোকজনদেব সঙ্গে। প্রাতঃকালীন উপাসনাব জন্য তারা এখন একত্র সম্মিলিত হয়েছে।

প্রসন্ন মৃদুহাস্যে তিনি সংবর্ধনা জানালেন তাদেব উদ্দেশে। ইঙ্গিতে মেয়েদেব চ'লে যেতে ব'লে তিনি পুত্রদেব সম্বোধন ক'বে বলতে লাগলেন, "তোমবা জানো, বহু বৎসব ধ'বে একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষা আমি পোষণ ক'বে আসছি, আমি চেয়েছি সৎ ও নিষ্পাপ জীবন যাপন কবতে। গতকাল আমার গৃহ-পবিবেশেব মধ্যে জীবিত মানুষেব শোণিতপাত ঘটেছে। আমাব আবাসগৃহে যে পাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আমি পাপ হ'তে মুক্ত ও পবিশুদ্ধ হ'তে চাই। তুচ্ছ কাবণে যে ভৃত্যকে কাল দণ্ড দেওয়া হয়েছে, এই মুহূর্তে তাকে মুক্ত ক'বে দাও, তাকে দান কবো যথেচ্ছ বিচবণেব অবাধ স্বাধীনতা— যাতে শেষ বিচাবেব দিনে সে তোমাদেব ও আমাব বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে না পাবে।"

পুত্রবা নিরুত্তব। বিবাট বুঝলেন, নীববতাব অন্তবালে বিবোধিতা আত্ম-গোপন ক'রে আছে।

"কি, জবাব দিচ্ছো না যে? তোমাদেব বক্তব্য না শুনে তোমাদেব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে কোনো কাজ আমি কবতে চাইনে।"

জ্যেষ্ঠপুত্র জবাব দিল, "দোষীকে দণ্ডদান না ক'বে তাকে মুক্তি দেবাব জন্য আপনি আদেশ কবছেন। আমাদেব বাড়িতে চাকব অবশ্য অনেকগুলো আছে, কাজেই, একটা চ'লে গেলে বিশেষ কোনো অসুবিধে হবে না। কিন্তু যে কোনো কাজেব কাযকাবিতা তাব নিজস্ব পরিধিব মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কার্য-কারণ শৃঙ্খলেব মধ্যে সে একটি গ্রন্থি মাত্র। আপনি যদি এই লোকটিকে ছেড়ে দেন এবং অন্যান্য আব সকলেও যদি চ'লে যেতে চায় তাহ'লে তাদেব আপনি আটকে বাখবেন কোন্ যুক্তিতে?"

"তারা যদি আমার সংস্পর্শ থেকে মুক্ত হ'য়ে চ'লে যেতে চায়, আমি নিশ্চয় তাদের ছেড়ে দেব। অন্য কাবও নিয়তি আমি নিজের হাতে গড়তে চাই না। তা যে চায় সে অনাচাবী।"

মেজো ছেলে বলল, "আপনি আইনের বাঁধন আল্‌গা ক'বে দিচ্ছেন। জমি

যেমন আমাদের, ওই জমিতে যে গাছ জন্মে তা যেমন আমাদের, সে গাছে যে ফল ধরে তাও যেমন আমাদের, তেমনি এই ক্রীতদাসরাও আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যতটুকু ওরা আপনার সেবা করবে, ওদের সঙ্গে আপনার বাধ্যবাধকতা সেইটুকু মাত্র। কিন্তু আপনি যে জায়গাটায় হাত দিতে যাচ্ছেন, হাজার হাজার বছরের সে এমন এক পুরনো প্রথা যা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে। ক্রীতদাসের জীবনের মালিকানা স্বত্ব তার নিজস্ব নয়, সে তার প্রভুর সেবক মাত্র।"

"বিধাতার কাছ থেকে একটিমাত্র অধিকার আমরা পেয়েছি এবং তা হ'ল বেঁচে থাকবার অধিকার। সে অধিকারবোধ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে শ্বাসবায়ুর সঙ্গে। তোমরা আমাকে সতর্ক ক'রে দিয়ে ভালোই করেছো, কারণ, এখন পর্যন্ত আমার অন্ধবিশ্বাস ছিল যে, আমি পাপ মুছে ফেলবার চেষ্টায় আছি। কিন্তু কার্যত এই কয় বছর ধ'রে অন্যের প্রাণহরণ ছাড়া আর অন্য কিছু করিনি। এতদিনে আমি স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারলাম যে মানুষকে পশুতে পরিণত করা সাধু ব্যক্তির কাজ নয়। এদের ওপর আমি যে পাপের অনুষ্ঠান করেছি তা থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্য এদের সবাইকে আমি মুক্তিদান করব।"

ছেলেদের চোখে ভ্রূকুটি-কুটিল কটাক্ষ দেখা দিল, বোঝা গেল পিতার আদেশ পালন করতে তারা সম্মত নয়। বড় ছেলে রূঢ় ভাষায় জবাব দিল, "ধান যাতে ক্ষেতে শুকিয়ে না মরে তার জন্য মাঠে জল ছেঁচবে কে? কে-ই বা মাঠ থেকে গরুবাছুর তাড়াবে? কেবলমাত্র আপনার খেয়ালের জন্য আমাদের চাকর খাটতে হবে নাকি? সারা জীবনে আপনি নিজে তো কোনোদিন এতটুকু গতর খাটাননি, খাটাবার চেষ্টাও করেননি, শুধু পরের মেহনতের ওপর জীবনধারণ ক'রে এসেছেন। আপনি যে খড়ের বিছানায় শুয়ে আছেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার আঁটি বেঁধেছে অপরে। আপনি যখন আরামে ঘুমোন, তখন এই চাকররা আপনাকে পাখা করে। আর এখন সব চাকরবাকরদের আপনি হঠাৎ জবাব দিতে চান এবং মেহনতের সব দায়িত্ব চাপাতে চান তাদের ঘাড়ে—যারা আপনার আত্মজ। আপনি কি চান বলদগুলোকে লাঙল টানার মেহনত হ'তে মুক্তি দিয়ে জোয়াল আমরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিই? এইসব মূক মৌন জীবদের দেহেও জীবন

দিয়েছেন নিশ্চয়ই আপনার বিশ্বরূপী ভগবান! সৃষ্ট কোনো পদার্থই আপনি স্পর্শ করতে পারেন না, কারণ সবই সেই ভগবানের সৃষ্টি। মাটি স্বেচ্ছায় কাউকে ফসল দেয় না, জোর ক'রে সেসব তার কাছ থেকে আদায় ক'রে নিতে হয়। বলই এ বিশ্বের বিধান এবং আমবা চেষ্টা করলেও সে বিধানকে এড়িয়ে যেতে পাবি না।"

"কিন্তু আমি তাকে এড়িয়ে চলবই, কারণ শক্তিমত্তা কদাচ সততা নয়। আমি চাই সৎভাবে জীবনযাপন করতে।"

"সব অধিকারেব মূলেই আছে শক্তিব খেলা—সে মালিকানা মানুষের ওপর হোক, পশুর ওপব হোক, কিংবা মাটিব ওপর হোক। আপনি যেখানে প্রভু, সেখানে আপনাকে বিজেতা হ'তেই হবে। মালিক যে, মানুষের নিয়তিব সঙ্গে জড়িত না হ'য়ে তার উপায় নেই।"

"যা কিছু আমাকে পাপেব সঙ্গে জডাতে চায়, তা হ'তে আমি নিজেকে মুক্ত করবই। আমাব আদেশ ক্রীতদাসদেব তোমরা মুক্তি দাও এবং যা কিছু মেহনত প্রয়োজন, তা তোমবা নিজেরা কবো।"

অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি ফুটে উঠল ছেলেদের চোখে, ক্রোধ দমন কবা তাদেব পক্ষে অসাধ্য হ'য়ে উঠল। জবাব দিল জ্যেষ্ঠপুত্র: "আপনি এইমাত্র বললেন যে, কারও ইচ্ছার ওপব আপনি চাপ দিতে চান না, পাছে পাতক ঘটে সেই ভয়ে চাকরদের হুকুম কবতেও আপনি নাবাজ। অথচ আমাদের ওপব আপনি দিব্যি হুকুম চালাচ্ছেন, আমাদের জীবনযাত্রার ওপর চাপ দিচ্ছেন। ঈশ্বরেব চোখে, মানুষেব চোখে এই কি আপনার ন্যায় আচরণ?"

বিরাট কিছুক্ষণ নিরুত্তর রইলেন এবং তারপর চোখ তুলতেই দেখেন, তাদের চোখে লালসার অনলশিখা লকলক কবছে। মন তাব বেদনায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। ধীবে ধীবে তিনি বলতে থাকেন, "তোমরা আজ আমাকে শিক্ষা দিয়েছো। তোমাদের ওপর কোনোবকম চাপ আমি দিতে চাইনে। ঘরবাড়ি, বিষয়সম্পত্তি সব কিছু নিয়ে তোমরা নিজেদের মধ্যে যেমন ক'রে খুশি ভাগবাঁটোয়ারা ক'রে নাও। আজ থেকে এসবের ওপর আমার আর কোনো দাবিদাওয়া রইল না। এদের সঙ্গে যে পাপ জড়িত আছে, এই সঙ্গে তারও অংশ আমি ত্যাগ করলাম। তোমরা ঠিক কথাই বলেছো: প্রভুত্ব যে করে, অন্যকে তার স্বাধীনতা থেকে সে বঞ্চিত করে। তার চেয়েও গর্হিত কাজ

সে কবে এই যে, নিজেব আত্মাকে সে ক্রীতদাসে পবিণত কবে। নিষ্পাপ জীবন যে যাপন কবতে চায, গৃহেব অধিকাব, অপবেব ভাগ্যনিযন্ত্রণের অধিকার তাকে ত্যাগ করতেই হবে। অন্যেব শ্রমেব ওপব নির্ভব ক'বে জীবিকানির্বাহ কবা তাব চলবে না অন্যে ঘর্মাক্ত হ'যে তাব জন্য পিপাসাব জল যোগাবে এ ব্যবস্থা তাব বেলায অচল। স্ত্রী-সম্ভোগেব মধ্যে এবং প্রযোজনেব অতিবিক্ত পাবাব মধ্যে যে অলস পবিতৃপ্তি আছে তা থেকে তাকে দূবে থাকতে হবে। নিঃসঙ্গ যে ভগবানেব কাছাকাছি থেকে সেই খেটে খায ভগবানেব অস্তিত্ব অনুভব কবে সেই। দৈন্য এবং দুঃখেব মধ্য দিযেই তাঁকে জানা যায পবিপূর্ণরূপে। আমি নিষ্কলুষ জীবন যাপন কবতে চাই এবং তা চাই ব'লেই বিষযসম্পত্তিব চেযে অদৃশ্য ঐশী সত্তাব সান্নিধ্যই আমি বেশি কামনা কবি। ঘববাডি তোমবা নাও এবং নিজেদেব মধ্যে বণ্টন ক'বে নিযে সুখে-শান্তিতে বাস কবো।"

বিবাট তাদেব দিক থেকে মুখ ফিবিযে স্থান ত্যাগ কবলেন। পুত্রবা ঠায দাঁডিযে বইল স্তম্ভিতেব মতো। লালসা পবিতৃপ্ত হওযায তাদেব দেহ তৃপ্তি পেল বটে, কিন্তু মনে মনে লজ্জিত না হ'যে পাবল না।

রাত্রি নেমে আসাব সঙ্গে সঙ্গে বিবাট যাত্রাব জন্য প্রস্তুত হলেন। একটা লাঠি, খেটে খাবাব জন্য একটা কুঠাব, কিছু শুকনো ফলমূল এবং তালপাতায় লেখা পুঁথিপত্র—এই মাত্র সম্বল ক'বে তিনি পথে বেবিযে পডলেন। পবিধেয বস্ত্রখানি হাঁটু অবধি তুলে তিনি নিঃশব্দে বেরিযে পডলেন বাডি থেকে, যাবাব সময স্ত্রী-পুত্র-পবিবাব বা বাডিব অন্য কাবও কাছে বিদায পর্যন্ত নিলেন না। সাবা বাত্রি পথ চলাব পব তিনি এসে দাঁডালেন সেই নদীব ধাবে—যাব জলে একদা এক ভযার্ত মুহূর্তে তিনি ছুঁডে ফেলে দিযেছিলেন তাঁর তলোয়াব। জল ভেঙে তিনি উজিযে চললেন নদীব ধাব ধ'বে এব থামলেন গিযে সেইখানে যেখানেব মাটিতে তখন পর্যন্ত লাঙল নামেনি, বসতি গ'ডে ওঠেনি তখন অবধি। একটা পুবনো আমগাছ যেখানে বাজ প'ডে পুডে গেছে এবং তারই আগুনে ঝোপঝাডগুলো জ্ব'লে-পুডে গিযে জাযগাটা কিছুটা পবিষ্কার হয়েছে, ভোরবেলায় তিনি গিযে দাঁডালেন সেই স্থানটিতে। নদী সেইখানটায় বাঁক ঘুরে খরপ্রবাহে ছুটে চলেছে, নানা বকমেব পাখি নেমে সেখানে জল পান করছে নির্ভয়ে। জাযগাটার সামনেব দিকটা সম্পূর্ণরূপে খোলা, আব পিছন

দিকটা তরুশ্রেণী ছায়াচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। বজ্রাহত গাছের টুকরোগুলো মাটিতে ইতস্তত ছড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে। চারিদিকে জঙ্গল-ঘেরা এই পরিষ্কার জায়গাটুকু বিরাটের পছন্দ হ'ল, তিনি স্থির করলেন এইখানে কুটীর নির্মাণ করবেন এবং পাপ ও পরিজন হ'তে দূরে থেকে এইখানে ব'সে তিনি ধ্যান-ধারণায় জীবনযাপন করবেন।

হাতে-হাতিয়ারে কাজ করার অভ্যাস ছিল না ব'লে কুটীর তৈরি করতে তাঁর লেগে গেল পাঁচ দিন। কুটীর তৈরি হ'য়ে যাবার পরেও তাঁর শ্রমের বিরাম নেই। খাদ্যের জন্য তাঁকে ফলের খোঁজে বেরোতে হয়, যে জঙ্গল তাঁকে চেপে ধরবার জন্য এগিয়ে আসছে তার আক্রমণ তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে হয়। তা ছাড়া ক্ষুধিত বাঘ শিকারের খোঁজে রাত্রিকালে ঘোরাফেরা করে, তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য বেড়া বাঁধতে হয়। সান্ত্বনা এই যে, মানুষের কোলাহল তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ ক'রে সেখানকার শান্তি আহত ও আলোড়িত ক'রে তোলে না। অফুরন্ত উৎস হ'তে জলের যোগান পেয়ে নদী যেমন নিস্তরঙ্গ স্রোতে ব'য়ে চলেছে, তাঁর জীবনের দিনগুলিও তেমনি ব'য়ে চলেছে অনাহত শান্তির মধ্য দিয়ে।

পাখিরা দেখল, নবাগত এই জীবটির শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যে ভয় পাবার মতো কিছু নেই, কাজেই দিন কয়েক যেতে না যেতেই তাঁর ঘরের চালের ওপর তারা নির্ভয়ে বাসা বেঁধে বসল। পাখিদের খাবার জন্য তিনি প্রতিদিন ছিটিয়ে দেন ফলের বীজ ও ফলের টুকরো। দিনে দিনে পাখিদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে এবং তখন তিনি ডাকলেই তালগাছ থেকে তারা নিঃসংকোচে নেমে আসে তার কাছে। তাদের সঙ্গে তিনি খেলা করেন এবং পাখিরা নির্ভয়ে গা পেতে দেয় তাঁকে হাত বুলোবার জন্য। একদিন দেখেন, বনের মধ্যে একটা বাঁদর-বাচ্চা ভাঙা পা নিয়ে মাটিতে প'ড়ে ছোট ছেলের মতো যন্ত্রণায় কাঁদছে। বাচ্চাটাকে কুড়িয়ে তিনি তাঁর কুটীরে নিয়ে এলেন এবং সস্নেহ সেবাযত্নে তাকে অচিরে সারিয়ে তুললেন। বাঁদরটা এমন পোষ মেনে গেল যে, তাঁর হাবভাব সে অনুকরণ করতে লাগল এবং কিছু কিছু কাজকর্মও সে ক'রে দিতে লাগল। চারিদিকে বনের প্রাণীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে তাঁর দিন কাটে সত্য, কিন্তু তবু এক মুহূর্তের জন্যও তিনি এ কথা বিস্মৃত হন না যে, মানুষের মতো ইতর প্রাণীদের মধ্যেও শক্তির মত্ততা

এবং পাপের মোহ ঘুমিয়ে রয়েছে। তিনি দেখেন, কুমিররা ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি ও খাওয়াখাওয়ি করছে, পাখি ছোঁ মেরে নদীর জলে মাছ মেরে খাচ্ছে, সাপ ছোবল মেরে জাপটে ধরছে পাখিদের। সমগ্র বিশ্ব বিনাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মরণপাশে আবদ্ধ। বিধাতার এ অমোঘ বিধান এবং এ বিধানের সত্যতা অনস্বীকার্য। তবু এ সংগ্রামের দ্রষ্টা মাত্র হ'য়ে থাকাই বাঞ্ছনীয়, সৃষ্টি ও সংহার যে নিত্যবর্ধমান বৃত্তের আকারে লীলায়িত হ'য়ে চলেছে, তার সংস্পর্শ এড়িয়ে নির্দোষ জীবনযাপন করাই কর্তব্য।

প্রায় এক বছরের ওপর তিনি কোনো মানুষের মুখ দেখেননি। একদিন এক শিকারী হাতির পায়ের দাগ অনুসরণ ক'রে সেখানে এসে হাজির হ'ল। হাতিটা নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছে, এমন সময় তার চোখে পড়ল এক অপূর্ব দৃশ্য। গোধূলির ধূসর আলোকে সে দেখে একটি ছোট্ট কুটীরের সামনে ব'সে আছেন পাকা দাড়িওয়ালা এক বুড়ো। তার মাথার ওপর এসে বসেছে এক ঝাঁক পাখি আর পায়ের তলায় ব'সে পাথর দিয়ে বাদাম ভেঙে ভেঙে তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছে একটা বাঁদর। লোকটার দৃষ্টি কিন্তু আছে গাছের মাথার ওপর। সেখানে বহু বিচিত্র বর্ণের যে তোতাপাখির ঝাঁক ব'সে ছিল লোকটা ইশারা করবামাত্র একখণ্ড সোনালী মেঘের মতো নেমে এসে তারা বসল লোকটার হাতের ওপর।, শিকারী এমন এক ঋষির কথা পড়েছিল যার সম্বন্ধে শাস্ত্রে লেখা আছে "পশুরা তার সঙ্গে মানুষের ভাষায় কথা বলে, যেখানে যেখানে তিনি পা ফেলেন সেখানে সেখানে ফুল ফুটে ওঠে, তিনি ঠোট দিয়ে আকাশ থেকে তারা পেড়ে আনতে পারেন চাঁদের আলো নিবিয়ে দিতে পারেন এক ফুৎকারে।" শিকারীর মনে হ'ল, সে যেন আজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে শাস্ত্রবর্ণিত সেই ঋষিকে। শিকারের কথা ভুলে গিয়ে হাতি-শিকারী শহরে ছুটে গেল তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে।

তাজ্জব ব্যাপার দেখবার জন্য কৌতূহলী দর্শকের দল তার পরদিন নদীর ওপারে এসে হাজির হ'ল। লোকের ভিড় দিনে দিনে বেড়েই চলে। শেষে এমন একজন লোক সেখানে এল, বিরাটকে যে চেনে। দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে খবরটা অবশেষে একদিন রাজার কানে গিয়ে পৌঁছল। রাজা তাঁর অনুগত পারিষদকে হারিয়ে মনের দুঃখেই ছিলেন। তিনি হুকুম দিলেন

আঠাশ দাঁড়েব এক নৌকো তৈরি করতে। দ্রুত হাতে দাঁড় টেনে তাবা উজানে এগিয়ে চলল এবং অচিবে গিয়ে পৌছল বিরাটেব কুটীবেব কাছে। বাজাব নামবাব জন্য একখানা গালিচা পেতে দেওয়া হ'ল এবং বাজা তাবই ওপব দিয়ে হেঁটে গিয়ে হাজিব হলেন ঋষিব কুটীবেব কাছে। প্রায় আঠাবো মাস হ'ল বিবাট মানুষেব কথা কানে শোনেননি। বাজাকে তিনি সংবর্ধনা জানালেন ভীত ও সংকুচিতভাবে। প্রজা হিসাবে বাজাব প্রতি যে অভিবাদন জানাবাব প্রথা আছে, বিবাট তা জানাতে ভুলে গিয়ে শুধু বললেন, "আপনি এসেছেন—এ আপনাব অসীম অনুগ্রহ, মহাবাজ।"

বাজা তাকে সাদবে আলিঙ্গন ক'বে বললেন, "বছবেব পব বছব ধ'বে সিদ্ধিব অভিমুখে তোমাব জযযাত্রা আমি গভীব মনোযোগেব সঙ্গে লক্ষ্য ক'বে আসছি। বিস্ময়কব যে দুর্লভ সিদ্ধি তুমি অর্জন কবেছ তাই দেখবাব জন্য এবং দেখে ধর্মাচবণ শিক্ষা কববাব জন্য আজ আমাব এখানে আসা।"

সসম্ভ্রমে শিব নত ক'বে বিবাট বললেন, "বাজন, মানুষেব সংসর্গ বর্জন ক'বে কেমন ক'বে নিষ্পাপ জীবনযাপন কবতে হয আমি তাই শিখেছি। আমাব সাধনা বলুন, শিক্ষা বলুন তা শুধু এইটুকু মাত্র। যে নিঃসঙ্গ, তাব নিজেকে ছাডা শিক্ষা দেবাব আব অন্য কেউ নেই। আমি যা করছি, জানি না সে কাজ বিজ্ঞজনোচিত কিনা, আমি যা অনুভব কবছি তাই সত্যিকাব সুখ কিনা তাও আমি জানি না। আপনাকে উপদেশ দেবাব বা শিক্ষা দেবাব মতো কোনো জ্ঞান, কোনো বিদ্যা আমাব নেই। যে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন কবে তাব জ্ঞান আব সংসাবী জীবেব সাধাবণ জ্ঞান এক বস্তু নয। ধ্যানযোগ এবং কর্মযোগেব নীতি ও পদ্ধতি স্বতন্ত্র।"

বাজা বললেন, "কিন্তু ধার্মিক লোক কিভাবে জীবনযাপন কবেন তা দেখাই তো একটা মস্ত বড শিক্ষা। তোমাব মুখেব দিকে চেয়ে যে বিমল আনন্দ লাভ কবেছি তাই আমাব যথেষ্ট, তাব বেশি আব অন্য কিছু আমি কামনা কবি না। তোমাব এমন কোন্ ইচ্ছে আছে যা বাজধানীতে গিয়ে আমি পূর্ণ কবতে পাবি এমন কোন্ সংবাদ আছে যা তোমাব স্বজনদের কাছে পৌছে দিতে পাবি?"

"এ সংসাবে আমাব বলতে আব কিছু নেই মহাবাজ, কিংবা পৃথিবীতে যা কিছু দেখছেন সবই আমায়। বহু ঘরবাডিব মধ্যে আমার যে কোনো-

দিন নিজস্ব একটা বাড়ি ছিল, বহু সন্তান-সন্ততিব মধ্যে আমাব যে কখনও আপন সন্তান বলতে কেউ ছিল সে কথা আমি ভুলেই গেছি। যে গৃহহারা, সাবা বিশ্বভুবনই তার গৃহ, জীবনেব মোহবন্ধন ছিন্ন ক'বে যে চ'লে এসেছে, বিশ্ব-জীবনই তাব নিজস্ব জীবন, যে নির্দোষ ও নিষ্পাপ নিত্য শান্তিব অধিকাবী একমাত্র সেই। নিষ্পাপ জীবনযাপন করা ছাডা আব কোনো কামনা আমি পোষণ কবি না।"

"তাহ'লে আমি আসি। ধ্যানস্থ অবস্থায় আমাব কথা যেন কচিৎ কখনও তোমাব মনে জাগে।"

"আমি চিন্তা কবি ভগবানেব, আপনি এবং পৃথিবীব আব সকলে তাঁবই অংশ, তাবই মহাজীবন হ'তে আপনাবা জীবন লাভ কবেছেন, তাই আপনাদেব কথাও আমাব চিন্তা থেকে বাদ পডে না।"

বাজাব নৌকো ভাটিতে ভেসে চলল। আশ্রমবাসী ঋষিব কানে মানুষেব কণ্ঠস্বব আবাব পৌঁছবে কতদিনে কে জানে।

বিবাটের খ্যাতি শ্বেত পাবাবতেব মতো বাজ্যেব আকাশে আবাব পাখা মেলল। স্বজন ও স্বগৃহ ত্যাগ ক'বে যে ঋষিকল্প ব্যক্তি পবিত্র অধ্যাত্ম জীবন যাপন কবছেন তাব কীর্তিকথা গিয়ে পৌঁছল বাজ্যেব দূবতম প্রান্তে অবস্থিত গ্রামে সমুদ্রতীবর্তী পর্ণকুটীবে। লোকে তাকে অভিহিত কবল 'নিজনতাব নক্ষত্র' আখ্যায়। মন্দিবে পূজাবীবা তাঁর ত্যাগের জয়গান গাইতে লাগলেন, বাজা তাবই কাহিনী শোনাতে লাগলেন নিজেব ভৃত্যদেব ডেকে এবং বিচাবক বায়দানেব পূর্বে বলতে লাগলেন, 'যে বিবাট এখন ভাগবত জীবন যাপন করছেন এবং বিশ্বের বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার এখন যাঁব অধিকাবে, বিচাবকার্যে আমি যেন তাব মতো ন্যায় ও নীতিনিষ্ঠ হ'তে পারি।"

এব পর ব্যাপাব দাঁড়াল এই যে, যে কেউ বুঝতে পাবে যে, যে পথ সে অনুসবণ ক'বে চলেছে তা ঠিক নয়, যে কেউ উপলব্ধি করে তাব জীবনেব অসাবতা, সেই ঘরবাড়ি ছেড়ে যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দেয় এবং বনে গিয়ে বিবাটের মতো কুটীর নির্মাণ ক'বে ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন হয়। যত দিন যায়, এই ধরনের ঘটনার সংখ্যা ততই বেড়ে চলে। পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্ত বাঁধন হ'ল দৃষ্টান্তেব বন্ধন। সততার প্রতিটি দৃষ্টান্ত অপবের মধ্যে সৎ হবার

সংকল্প জাগিয়ে তোলে। দৃষ্টান্তের আঘাতে সুপ্ত দৃষ্টান্ত সহসা স্বপ্নঘোর হ'তে জেগে ওঠে এবং নিজেকে কার্যে প্রবৃত্ত করবার জন্য তৎপর হয়। এইভাবে যারা জেগে ওঠে, জীবনের অসারতা তাদের কাছে আর অস্পষ্ট থাকে না। তারা দেখতে পায় যে, তাদের হাত রক্তে কলঙ্কিত, তাদের আত্মা পাপের তাড়নায় কশাহত। তারা জেগে ওঠে এবং বেরিয়ে পড়ে নির্জনতার সন্ধানে। দেহধারণের জন্য যতটুকু মাত্র প্রয়োজন, তাতেই পরিতৃপ্ত হ'য়ে তারা অখণ্ড ভগবৎচিন্তায় নিমগ্ন হয়। খাদ্যের জন্য ফলের খোঁজে বেরিয়ে যদি কখনও একের সঙ্গে অপরের দেখা হয়, পাছে আবার নতুন কোনো বন্ধনের গ্রন্থি রচিত হয় এই আশঙ্কায় তারা কেউ কারও সঙ্গে কথাটি পর্যন্ত কয় না, মৃদুহাস্যে তারা পরস্পরের প্রতি শান্তির সংবর্ধনা জানায়। জনসাধারণ এই বনের নামকরণ করল 'ধর্মনিকেতন'। পাছে হত্যা-কলুষে আশ্রমের পবিত্রতা কলঙ্কিত হয় এই আশঙ্কায় কোনো শিকারী কোনোদিন সে পথ মাড়াত না।

একদিন সকালে বিরাট অরণ্যে পদচারণা করছেন, এমন সময়ে দেখেন, এক সাধু নিশ্চল অবস্থায় মাটির ওপর শুয়ে আছেন। ঝুঁকে প'ড়ে লোকটিকে তুলতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে, দেহ তাঁর প্রাণহীন। বিরাট মৃতের চোখ দুটি বন্ধ ক'রে দিয়ে ভগবানের নাম গান করলেন, মৃতের আত্মার যাতে সদ্গতি হয় সেই উদ্দেশ্যে শবদেহের সৎকার সাধনের জন্য বনের বাইরে একটা চিতা সাজালেন এবং মৃতদেহটা ব'য়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন চিতার ওপর। কিন্তু ফল মাত্র আহার ক'রে জীবনধারণ করার ফলে দেহ তাঁর দুর্বল হ'য়ে পড়েছে, কাজেই সে বোঝা বহন করা তাঁর শক্তির বাইরে। সাহায্যের সন্ধানে নদী পার হ'য়ে তিনি এগিয়ে চললেন নিকটবর্তী গ্রামের দিকে।

গ্রামবাসীরা যাঁর নাম দিয়েছিল 'নির্জনতার নক্ষত্র', তাঁকে সশরীরে সম্মুখে এসে দাঁড়াতে দেখে সসম্ভ্রমে ও সবিনয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে এল এবং তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জানতে পেরে, তা সাধন করবার জন্য তৎক্ষণাৎ তৎপর হ'ল। বিরাট যে পথ দিয়েই যান, নারীরা সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে প'ড়ে তাঁকে প্রণাম জানায়। ছেলেমেয়েরা নির্বাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকে। পুরুষরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে মহামান্য অতিথির পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে

আশীর্বাদ ভিক্ষা কববাব জন্য। জনতাব ঈষৎ আন্দোলিত সাবি ভেদ ক'রে বিবাট এগিযে চলেন, জনসাধাবণের প্রতি নিজের সর্বপ্রকাব বন্ধনহীন নিঃস্বার্থ ভালবাসার কথা স্মরণ ক'রে তাঁব মুখে ফুটে ওঠে পবিতৃপ্তিব মৃদু হাসিরেখা।

প্রত্যেকেব প্রণামেব জবাবে আন্তবিক প্রত্যভিবাদন জানাতে জানাতে বিরাট এগিযে চলেন। অবশেষে তিনি এসে উপস্থিত হলেন গ্রামেব শেষ প্রান্তে অবস্থিত সর্বশেষ কুটীবেব কাছে। সে কুটীবেব মধ্যে ব'সে আছে এক নাবী. বিবাটকে লক্ষ্য ক বে তাব চোখে ফুটে উঠেছে ভ্রূকুটিকুটিল বোষ কটাক্ষ। সভযে বিবাট পিছু হটলেন। নাবীব চোখেব দিকে চেযে তাব মনে প'ড়ে গেল বিস্মৃত সেই চাউনিব কথা, নিহত ভ্রাতাব চোখে একদা যে অভিযোগ-ভবা দৃষ্টি তিনি দেখেছিলেন। এই কয বছব নিজনবাসেব ফলে 'শত্রুতা' শব্দেব অর্থই তিনি ভুলে গেছেন, কাজেই তিনি নিজেকে এই কথা বোঝাতে চেষ্টা কবলেন যে, নাবীব দষ্টিব অর্থ বুঝতে হযতো তাব ভুল হযেছে। অর্থ বোঝবাব জন্য তিনি আবাব চোখ ফেবালেন নাবীব দিকে, কিন্তু তখনও সে চোখে সেই ক্রুদ্ধ দষ্টি জেগে বযেছে। কোনোরূপে আত্ম-সংবরণ কবে তিনি এগিযে গেলেন কুটীবেব দিকে এবং যাওযামাত্র মেযেটি প্রবেশপথেব দিকে স'বে গেল। বনেব বাঘেব চোখে হিংসার যে জলন্ত দৃষ্টি ফুটে ওঠে, অন্ধকাবে দাঁড়িযে অবিকল সেই দৃষ্টি সে হানছে বিবাটেব ওপব।

কিছুটা সাহস সঞ্চয ক'বে বিবাট স্বগত কণ্ঠে বলতে শুরু কবলেন, "যাকে আমি জীবনে কোনোদিন দেখিনি, কেমন ক'বে আমি তাব ক্ষতি কবতে পাবি? আমাব ওপব তাব এই আক্রোশেব কাবণ কি? নিশ্চয কোথাও কোনো ভুল ঘটেছে। ব্যাপাবটা খোজ নিযে দেখা যাক।'

এগিযে গিযে দবজায কড়া নাড়লেন, কিন্তু ভেতব থেকে কোনো জবাব এল না। অথচ তিনি বেশ বুঝতে পাবছেন যে, ক্রোধান্ধ বমণী কাছেই কোথাও আছে। দবজায আব একবাব কবাঘাত ক'বে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কববাব পব করুণাপ্রার্থীব মতো আবাব তিনি কবাঘাত করলেন। অবশেষে মেযেটি দবজায় এসে দাঁড়াল দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপে। তার চোখে তখন পযন্ত বৈরিতার সেই বিরূপ দৃষ্টি।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, "কি চাও এখানে?" বাগে সে এমন থরথর ক'রে কাঁপছে যে দরজা চেপে ধ'রে কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিল।

তার মুখের দিকে চেয়ে বিরাটের মন কিছুটা হালকা হ'য়ে গেল। তিনি নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলেন যে, এর আগে মেয়েটিকে তিনি কখনও দেখেননি। মেয়েটি যুবতী এবং বিরাট নিজে জীবনের পথে বহু দূর এগিয়ে এসেছেন, কাজেই পরস্পরের মধ্যে পথে কোথাও দেখাসাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব নয়, আর তা যখন নয়, তখন তাঁর কোনো ক্ষতি করারও সম্ভাবনা নেই।

বিরাট বললেন, "অপরিচিতা নারী, আমার শান্তির সংবর্ধনা গ্রহণ করো। একটা কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি: আমার ওপর তুমি এত বিরূপ কেন? আমি কি তোমার শত্রু? কি ক্ষতি করেছি আমি তোমার?"

হিংস্র হাসিতে তার মুখ বীভৎস হ'য়ে উঠল, সে বলল, "কি ক্ষতি করেছ তুমি আমার? অতি তুচ্ছ ক্ষতি। আমার ধনে-জনে পূর্ণ ঘর তুমি শূন্য ক'রে দিয়েছ—এই শুধু, আর কিছু নয়। আমার প্রিয়তমকে তুমি কেড়ে নিয়েছ, আমাকে পরিণত করেছ জীবন্মৃত অবস্থায়। তুমি স'রে যাও আমার দৃষ্টির আড়ালে, নইলে আমি হয়তো নিজেকে সামলাতে পারব না।"

বিরাট আবার ফিরে চাইলেন তার দিকে। তার দৃষ্টি এমন উদ্‌ভ্রান্ত যে, বিরাটের মনে হ'ল, মেয়েটা পাগল হ'য়ে গেছে। তিনি চ'লে যাবার জন্য মুখ ফেরালেন এবং যাবার আগে বললেন, "তুমি আমাকে যে লোক ব'লে ভাবছ আমি সে লোক নই। আমি লোকালয় থেকে বহু দূরে থাকি, কাজেই কারও সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। লোক চিনতে তুমি নিশ্চয় ভুল করেছ।"

মেয়েটা তাঁর পিছনে ধাওয়া করল চিৎকার করতে করতে। কণ্ঠে তার নিদারুণ বিদ্বেষ! বলল, "আমি তোমাকে খুব চিনি, আর সকলে যেমন চেনে ঠিক তেমনি ক'রেই চিনি। তুমি তো সেই বিরাট—লোকে যাকে বলে 'নির্জনতার নক্ষত্র', যার নামে লোকে ধর্মের ঢাক বাজায়? তোমার জয়গান কিন্তু আমার মুখ দিয়ে বেরোবে না। আমার নালিশ যতক্ষণ না ভগবানের বিচারাসনের কাছে গিয়ে পৌঁছয়, ততক্ষণ আমি তোমাকে অভিশাপ দিয়ে যাব। জানতে চাও, তুমি আমার কি ক্ষতি করেছ? এসো, নিজের চোখে দেখবে এসো, কি ক্ষতি করেছ আমার।"

জামার হাতা চেপে ধ'রে বিস্ময়বিমূঢ় বিরাটকে সে টানতে টানতে নিয়ে

গেল বাড়ির মধ্যে এবং দরজা খুলে সে তাঁকে নিয়ে হাজির করল অত্যন্ত নীচু ও অন্ধকার একটা ঘরের ভেতর। সেই ঘরের এক কোণে যেখানে মাদুরের ওপর প'ড়ে ছিল নিশ্চল একটা মানবদেহ, তাঁকে সে টানতে টানতে নিয়ে গেল সেইখানে। দেহটার দিকে ঝুঁকেই বিরাট সভয়ে পিছু হটলেন। সেখানে প'ড়ে আছে একটা মরা ছেলে। তার চোখের দিকে চাইতেই বিরাটের মনশ্চক্ষুর সামনে জেগে উঠল তাঁর নিহত ভাইয়ের দৃষ্টিহীন ও অভিযোগ-ভরা চোখ দুটো। মেয়েটি পাশে দাঁড়িয়ে ব্যথা-বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, "এ আমারই গর্ভজাত তৃতীয় সন্তান। তুমি একে খুন করেছ—তুমি—তুমি—লোকে যাকে ঋষি বলে—বলে ভক্তচূড়ামণি।"

বিরাট প্রতিবাদ জানাবার জন্য মুখ খুলতে যাবেন এমন সময় সে আবার বলতে লাগল, "এই দেখ তাত, এই দেখ সেই খালি টুলখানা—আমার স্বামী পরাতিকা যার ওপর ব'সে দিনের পর দিন ওই তাঁতে কাপড় বুনত। তার মতো দক্ষ বয়নশিল্পী তখন আর এ তল্লাটে কেউ ছিল না। কত দেশ-দেশান্তর থেকে তার কাছে কাপড়ের বরাত আসত। তার কাছেই ছিল আমাদের জীবিকা। স্বামী আমার যেমন সহৃদয় তেমনি পরিশ্রমী। তাই তাকে নিয়ে দিন আমাদের সুখেই কাটত। কুসংসর্গ কাকে বলে সে জানত না এবং লোকদের সঙ্গে মেলামেশা ছিল তার স্বভাববিরুদ্ধ। তার ঔরসে আমার তিন ছেলে। আমাদের আশা ছিল তারা তাদের বাপের মতোই সৎ ও সহৃদয় হবে। তারপর একদিন এক শিকারী এল আমাদের গ্রামে। পরাতিকা তার কাছ থেকে শুনল, কে একজন লোক নাকি ঘরসংসার যথাসর্বস্ব ছেড়ে ভগবৎচিন্তা সার করেছে। শিকারী আরও বলল যে, লোকটা বাসের জন্য নিজের হাতে একটা কুটীর তৈরি করেছে। এই কথা শোনার পর থেকে পরাতিকা দিনে দিনে গম্ভীর হ'য়ে উঠল। সন্ধে হ'লেই তার মন ভাবনায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে, তখন কথা বলে খুবই কম। একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠে দেখি সে আমার পাশে নেই। তুমি যেখানে সাধন ভজন কর এবং লোকে যাকে বলে 'পুণ্যনিকেতন', সেই বনে সে চ'লে গেছে। সে শুধু নিজের কথাই ভাবল আর আমরা যে তার মেহনতের ওপর নির্ভর ক'রে বেঁচে আছি—সে কথা সে ভুলে গেল একেবারে। সংসারে অভাব দেখা দিল, ছেলেরা খেতে পায় না, ফলে পর পর দুটো ছেলে গেল ম'রে।

তৃতীয এবং সব শেষের ছেলেটিও মাবা গেল আজ, সে মৃত্যুব জন্য দাযী তুমি। পবাত্রিকাকে ভুল পথে টেনে নিযে গেছ তুমি। তুমি যাতে ভগবানের কাছাকাছি যেতে পাব তাব জন্যে আমাব তিন-তিনটি ছেলেব হাড ধুলোয মিশে গেছে। তুমি যখন সব দুঃখকষ্ট হ'তে দূবে থেকে নিশ্চিন্ত মনে পাখিদেব আহাব যোগাচ্ছিলে, বাছাবা আমাব তখন খিদেব জ্বালায এখানে কি যন্ত্রণাই না ভোগ কবেছে। এই নালিশ নিযে যেদিন আমি তাঁব দববাবে গিযে দাঁডাব, কি জবাব দেবে তুমি তাব? যাব বোজগাব খেযে তার নিবীহ শিশুবা বেঁচে ছিল, সেই সৎ ও সবল লোকটিকে তুমি ছলনায ভুলিযে কাজ থেকে অন্য জাযগায টেনে নিযে গেছ, তাব কানে কানে এই পাগলেব প্রলাপ শুনিযেছ যে, যে নিজেব ঘবকন্না ও আত্মীযস্বজন ছেডে, সংসাবেব চিন্তা ও কাজকর্ম ছেডে বনে-জঙ্গলে গিযে একা একা বাস কবে, ভগবানেব কাছাকাছি যেতে পাবে সে-ই।"

বিবাট ভযে বিবর্ণ হ'যে গেলেন। তাঁব জিব কাঁপতে লাগল থবথব ক'বে। কম্পিত জিহ্বায কোনোক্রমে জডিত কণ্ঠে তিনি বললেন, "আমার দৃষ্টান্ত যে অন্য কাউকে অনুপ্রাণিত কববে এ ধাবণা আমাব ছিল না। আমি যে পথ বেছে নিযেছি, সে পথে আমি একাই চলব এই ছিল আমাব ইচ্ছা।"

"ঋষিমশাই, এই কি তোমাব জ্ঞানেব দৌড? যে কথাটা সকলে জানে, তুমি তা জানো না যে, কাজ মাত্রই ভগবানেব, তিনিই সব কাজেব কর্তা? তুমি কি এ কথাটাও জানো না যে ইচ্ছে কবলেই কর্মফেবকে ফাঁকি দেওযা যায না, কাজেব দাযিত্ব এডানো যায না? তুমি এই অহংকাবে ফেঁপে উঠেছিলে যে, তোমাব কাজেব কর্তা হবে তুমি নিজে এবং তোমাব কাজ হবে লোককে শিক্ষা দেওযা। তোমাব কাছে যা অমৃত, আমাব ভাগ্যে তা হযেছে গবল। এই শিশুব মৃত্যু তোমাবই কৃতকর্মেব ফল।"

বিবাট কিছুক্ষণ ভাবলেন এবং তাবপব নতমস্তকে মেনে নিলেন অভিযোগের সত্যতা।

"তুমি ঠিক কথাই বলছ। এখন আমি বুঝতে পাবছি যে, ব্যথাব একটিমাত্র দংশনে সত্যেব যে পবিমাণ উপলব্ধি লুকনো বযেছে, ঋষিব জীবন-ব্যাপী নিঃসঙ্গতাব মধ্যে তা নেই। যা কিছু শিক্ষা আমি লাভ করেছি তা সবই হতভাগ্যদের কাছ থেকে পাওয়া, জীবনে যা কিছু আমি দেখেছি, তা

ফুটে উঠেছে তাদের চোখে যারা নির্যাতিত—ম'রেও যারা মরণ জানে না। আমি মনে মনে ভেবে নিয়েছিলাম যে, বিনয়ে আমার মাথা ভগবৎচরণে লুটিয়ে পড়েছে, কিন্তু কার্যত মাথা আমার ছিল আপন অহংকারে উদ্ধত। তা না হ'লে যে দুঃখ এখন আমি বোধ করছি, তা ভুগতে হ'ত না। এ কথাও প্রশ্নাতীতরূপে সত্য যে, কর্মত্যাগ করাও একটা কাজ এবং সে কাজের ফলাফলের দায়িত্ব কর্ম যে ত্যাগ করে তারই। যে নিঃসঙ্গ, সেও তার ভাইদের সঙ্গে অদৃশ্য সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত। আমি আবার তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আমি বন থেকে লোকালয়ে আবার ফিরে আসব এই আশা নিয়ে যে, আমার দেখাদেখি পরাতিকাও ফিরে আসবে এবং আবার তুমি গর্ভে সন্তান ধারণ করবে।"

বিরাট আভূমি নত হ'য়ে তার পরিচ্ছদের প্রান্তভাগ চুম্বন করলেন। ক্রোধের লেশ পর্যন্ত নারীর মন থেকে নিঃশেষে ধুয়ে মুছে গেল এবং বিহ্বলের মতো সে নির্নিমেষে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিরাটের অপস্রিয়মাণ মূর্তির দিকে।

বিরাটের আর এক রাত্রি কাটল নির্জন কুটীরে। আবার তিনি চেয়ে থাকেন তারায় ভরা আকাশের দিকে। প্রভাত হলে আকাশের গভীর অন্তস্তল হ'তে তারা শুভ্র কিরণ বিকিরণ করে এবং ভোরের আলোকে তারা মিলিয়ে যায় ম্লান হ'য়ে। আবার তিনি ভোজসভায় পাখিদের নিমন্ত্রণ জানান এবং তারা নেমে এলে সস্নেহে হাত বুলোন তাদের গায়ে। তারপর যে লাঠি ও বাটি তিনি সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন কয়েক বছর আগে, তাই নিয়ে তিনি ফিরে চললেন শহরের দিকে।

ঋষিকল্প সেই সাধু ব্যক্তি তার নির্জন আশ্রম-কুটীর ছেড়ে চ'লে আসছেন এবং এসে প্রায় পৌঁছেছেন নগরের তোরণদ্বারে—এই সংবাদ যে মুহূর্তে রটল, লোক দলে দলে ছুটে এল সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখবার জন্য। কারও কারও মনে এমন গোপন আশঙ্কাও যে না জাগল তা নয় যে, তাঁর মতো পুণ্যাত্মা লোক যদি ভগবানের সান্নিধ্য হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে লোকালয়ে আবার ফিরে আসেন, তাহ'লে কোনো বিপর্যয় ঘ'টে যাওয়াও অসম্ভব হবে না। শ্রদ্ধাবনত জনতা পথের দুই ধারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে আর বিরাট এগিয়ে চলেছেন দুটি জীবন্ত প্রাচীরের মাঝখান দিয়ে। তাঁর ইচ্ছে হল, তার স্বভাবসিদ্ধ

প্রসন্ন হাস্যে দর্শকদের উদ্দেশে সংবর্ধনা জানান, কিন্তু জীবনে এই প্রথমবার মুখে তিনি হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারলেন না। তাঁর মুখ গম্ভীর, ঠোঁট দুটি দৃঢ়সংবদ্ধ।

অবশেষে তিনি প্রাসাদে এসে পৌছলেন। সভার কাজ তখন শেষ হ'য়ে গেছে এবং রাজা ব'সে আছেন একাকী। বিরাট দরবার-গৃহে প্রবেশ করতেই রাজা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন এবং বাহু বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন তাঁকে আলিঙ্গন করবার জন্য। কিন্তু বিরাট সটান মাটিতে শুয়ে পড়লেন এবং রাজ-পরিচ্ছদের প্রান্তভাগ চুম্বন ক'রে আবেদন জানাবার অনুমতি ভিক্ষা করলেন।

রাজা বললেন, "তুমি বলবার আগেই তোমার আবেদন মঞ্জুর হ'য়ে গেছে। একজন সাধুসজ্জন ঋষিকল্প ব্যক্তির ইচ্ছা পূর্ণ করবার অধিকার লাভ করেছি এ আমার পরম সৌভাগ্য।"

"আমায় ঋষি বলবেন না, মহারাজ! কারণ, যে পথ আমি বেছে নিয়েছিলাম, তা ঠিক পথ নয়। আমি এতদিন গোলকধাঁধায় ঘুরে মরেছি এবং আজ আপনার সিংহাসনের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি আবেদনপত্র হাতে নিয়ে। পাপ হ'তে মুক্তি পাবার জন্য আমি কর্ম ত্যাগ করেছিলাম, কিন্তু দেবতারা মর্ত্যমানবের জন্য যে জাল পেতে রাখেন, আমি তাতে জড়িয়ে পড়েছি।"

রাজা বললেন, "সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। মানুষের সঙ্গে কোনো সংস্রবই যাঁর নেই, তিনি মানুষের ক্ষতি করেন কেমন ক'রে? যাঁর জীবন ভগবানের সেবায় নিবেদিত, পাপের সাধ্য কি তাঁকে স্পর্শ করে!"

"পাপ থেকে আমি দূরে ছিলাম, কাজেই জেনে-শুনে পাপ আমি করতে পারি না সত্য, কিন্তু আমাদের পা শেকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে মাটির সঙ্গে এবং আমাদের কাজ শাশ্বত ও সনাতন নীতির দ্বারা অনুশাসিত। নিষ্ক্রিয়তা নিজেই একটা কাজ। আমার মরণহীন মৃত ভাইয়ের দৃষ্টিকে আমি ফাঁকি দিতে পারিনি। আমরা ভালো কাজই করি, অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে মন্দ কাজই করি, সে নীতির অনুশাসন থেকে আমাদের অব্যাহতি নেই। আমার অপরাধের সীমা নেই, কারণ জীবনধর্ম পালন করার দায়িত্ব থেকে পলায়ন ক'রে আমি ভগবানের কাছ থেকেই দূরে স'রে গেছি। আমি সংসারের কোনো কাজে লাগিনি, কেবল নিজের খেয়ালের খোরাক যোগানো

ছাড়া কারও কোনো উপকার করিনি। আমি আবার জনসেবায় আত্ম-নিয়োগ করতে চাই।"

"তুমি অদ্ভুত কথা বলছ, বিরাট। তোমার কথার মানেই আমি বুঝতে পারছি না। যা বলবে স্পষ্ট ক'রে বল।—যাতে তোমার ইচ্ছা আমি পূর্ণ করতে পারি।"

"ইচ্ছার স্বাধীনতা আমি আর চাই না। স্বাধীন ইচ্ছার মালিক হ'লেই স্বাধীনতা সম্ভোগ করা যায় না। নিষ্ক্রিয়তা ও নিষ্পাপ জীবন এক কথা নয়। যে কাজ করে—কোনো প্রশ্ন না তুলে যে কাজ করে, নিজের ইচ্ছাকে যে অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'তে দেয়, নিজের শক্তিকে যে নিয়োজিত করে পরের সেবায়, সেই প্রকৃত স্বাধীন। কাজের মাঝখানটা শুধু আমাদের, তার গোড়া এবং শেষ, তার কারণ এবং কর্মফল—সব ভগবানের হাতে। আমার ইচ্ছার বন্ধন থেকে আমাকে মুক্তি দিন কারণ, ইচ্ছা মাত্রই বিশৃঙ্খল এবং সেবা মাত্রই সচেতনতা।"

"বুঝলাম না তুমি কি বলতে চাও। তুমি একদিকে চাচ্ছ মুক্তি আর তার সঙ্গে একই নিশ্বাসে চাচ্ছ চাকরি। তাহ'লে তুমি এই কথাই বলতে চাও যে, পরের ইচ্ছা পালন করার নাম স্বাধীনতা এবং নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ পরাধীনতা? তোমার এ যুক্তি আমার বুদ্ধির অগম্য।"

"ভাগ্যে এ কথার অর্থ অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারেননি, মহারাজ, তাই রক্ষে। পারলে রাজসিংহাসনে বসে হুকুম জারি করা আপনার পক্ষে কদাচ সম্ভব হ'ত না।"

রাজার মুখ রোষে রক্তিম হ'য়ে উঠল। তিনি বললেন, 'তুমি কি বলতে চাও রাজা চাকরের চেয়েও হীন?"

"ভগবানের চক্ষে কেউ ছোট কেউ বড় নয়, মহারাজ। যে নিজের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ ক'রে দিয়ে কোনো প্রশ্ন না তুলে কাজ ক'রে যায়, সে-ই কর্মের দায়িত্ব ভগবানে অর্পণ ক'রে দায়িত্বের বন্ধন হ'তে নিজে অব্যাহতি পায়। কিন্তু নিজের ইচ্ছা যার সক্রিয়, যে মনে করে বুদ্ধি দিয়ে সব বিরোধিতা সে অতিক্রম করতে পারে, সে-ই প্রলোভনে পতিত হয় এবং প্রলোভন তাকে টেনে নিয়ে যায় পাপের দিকে।"

রাজার চোখে-মুখে রোষের চিহ্ন তখন পর্যন্ত সুপরিস্ফুট। তিনি বললেন, "তাহ'লে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, সব কাজই সমান এবং কি ভগবানের চোখে, কি মানুষেব চোখে কাজের কোনো ইতরবিশেষ বা তারতম্য নেই?"

"মানুষের চোখে কোনো একটা কাজ হয়তো অন্য আর একটা কাজের চেয়ে বড় ব'লে মনে হ'তে পারে, কিন্তু ভগবানেব চোখে সব কাজই সমান।"

রাজা অনেকক্ষণ ধ'বে বিরাটের দিকে গম্ভীরভাবে চেয়ে রইলেন। অহমিকা তখন তাঁর অন্তঃকরণে তুফান তুলেছে। রাজা আব একবার বিরাটের শীর্ণ মুখ, কুঞ্চিত ললাট ও শুভ্র কেশের দিকে ভালো ক'রে দৃষ্টিপাত করলেন। তাঁর মনে হ'ল, বৃদ্ধ এইবারে স্থবিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। ব্যাপারটা ভালোভাবে পরখ ক'বে নেবার জন্যে পরিহাসছলে বললেন, "আমার কুকুরগুলোর ভার নিতে তুমি রাজী আছ কি?"

বিরাট সকৃতজ্ঞচিত্তে অভিবাদন জানিয়ে সিংহাসনেব সোপান চুম্বন করলেন।

জনসাধারণেব কাছে যে লোকটি এই সেদিনও পরম ধার্মিক ব্যক্তিরূপে পরিচিত ছিলেন, আজ থেকে তাঁর কাজ হ'ল কুকুরের তত্ত্বাবধান করা এবং চাকররা যেখানে থাকে সেখানে হ'ল তাঁর বাসা। কুকুরগুলো থাকে প্রাসাদ-সংলগ্ন একটা ঘরে। পিতাব কাণ্ড দেখে ছেলেরা লজ্জায় মুখ দেখাতে পারে না। বাবা যেখানে থাকেন সে জায়গাটা এড়াবার জন্য ছেলেরা অনেক দূব পথ ঘুরে যায়—পাছে বাবার সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে যায় এই ভয়ে। কেবল তাই নয়, লোকটাব সঙ্গে যে তাদের কোনোরকম সম্পর্ক আছে সে কথার আভাস পর্যন্ত তারা অন্য কাউকে টের পেতে দেয় না। ধর্মযাজকরা ঘৃণায় তাঁর দিক থেকে মুখ ফেরায়। এই সেদিনও যিনি ছিলেন রাজ্যের প্রথম ও প্রধান নাগরিক, তিনি যখন চাকব হ'য়ে চাবুক হাতে কুকুরের পাল তাড়িয়ে নিয়ে যান, জনসাধারণ অবাক হ'য়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। লোকেরা তাঁব ওপর থেকে মন তুলে নিয়ে যে যার আপন কাজে চ'লে যায়।

বিরাট সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর চাকরি ক'রে

চলেন। তিনি কুকুরদের বকলস ধুয়ে দেন, কোট সাফ করেন, বিছানা ঝাড়েন ও ঘর ঝাঁট দেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রাজবাড়ির আর সকলের চেয়ে তিনি কুকুরদের বেশি প্রিয় হ'য়ে উঠলেন। কুকুরদের আনন্দ দেখে তার শীর্ণ কুঞ্চিত মুখে হাসি আর ধরে না। এমনিভাবেই বছরের পর বছর ধ'রে তার জীবনের ঘটনাবিরল দিনগুলি তিনি পরমানন্দে যাপন ক'রে চলেন। রাজা মারা গেলেন এবং তাঁর জায়গায় যিনি নতুন রাজা হলেন বিরাটকে তিনি চেনেন না, কাজেই তিনি কাছ দিয়ে চলে যাবার সময় একটা কুকুর তাঁকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে—এই অপরাধে বিরাটকে একদিন বেত্রাঘাত করেন। তার আত্মীয়স্বজনের মন থেকে তাঁর স্মৃতি অবশেষে একদিন সম্পূর্ণরূপে মুছে গেল।

বিরাটের জীবন-আখ্যায়িকার ছেদ পড়ল তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। ভৃত্যদের মৃতদেহ যেখানে কবর দেওয়া হয়, বিরাটের শবদেহ সমাধিস্থ করা হ'ল সেইখানে। ধার্মিক ও পূতচরিত্র লোক হিসাবে সমস্ত রাজ্যময় একদা যিনি পরিচিত ছিলেন, তার কথা কারও মনে রইল না। ছেলেরা এসে দাড়াল না পিতার মৃতদেহের পাশে, পুরোহিতরা তার আত্মার কল্যাণ কামনা ক'রে স্বস্তিবচন উচ্চারণ করলেন না। দু দিন-দু'রাত ধ'রে কুকুরগুলো আর্তনাদ করল, কিন্তু শেষে তারাও ভুলে গেল বিরাটকে। তাই বিজয়ী বীরদের জীবনকাহিনীতে বিরাটের নামের কোনো উল্লেখ নেই, ঋষিদের শাস্ত্রগ্রন্থে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়নি।

রূপা অ্যাণ্ড কোং-র পরবর্তী বই

শেষ গ্রীষ্ম (দি লাস্ট সামার—বরিস পাস্টেরনাক)

অনুবাদ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ডক্টর জিভাগো (বরিস পাস্টেরনাক)

সম্পাদনা—বুদ্ধদেব বসু

সুখের সন্ধানে (কংকোয়েস্ট অব হ্যাপিনেস—বার্টাণ্ড রাসেল)

অনুবাদ—পরিমল গোস্বামী

স্তেফান জোয়াইগের গল্প-সংগ্রহ (দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)

অনুবাদ—দীপক চৌধুরী

তুমি কি শুধুই ছবি (মোনা লিসা—[illegible] হলেনিয়া)

অনুবাদ—বাণী রায়